শরৎচন্দ্র

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালক বালিকা।

নদী তীর,—নির্জন, একদিকে প্রান্তর ধু ধু করিতেছে, অপরদিকে কল কল স্বরে চিরপ্রবাহিনী চলিয়া যাইতেছে। তরঙ্গ আস্তে আস্তে, জলের উপরে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া সৈকতময় প্রান্তরে শেষ হইতেছে। কত তরঙ্গ,—দেখিতে দেখিতে ছুটিতেছে। প্রান্তরের অপর পার্শ্বে গ্রাম, গ্রামের কোলাহল প্রান্তরে আসিতে আসিতেই শেষ হইতেছে, নদী তীর পর্য্যন্ত আসিতেছে না। তীর—নির্জন—কোলাহল শূন্য। কোন কোন সময়ে হঠাৎ দুই একটী পাখী উড়িয়া তীর সন্নিধানে আসিয়াই ফিরিতেছিল।

গোধূলির অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী ষোড়শবর্ষীয় বালক একাকী প্রান্তরের মধ্য দিয়া আসিয়া নদী তীরে উপস্থিত হইল। মুখ মলিন, পরিধেয় বস্ত্র পিতৃ মাতৃহীন বালকের ন্যায়; গলদেশে উত্তরীয় বস্ত্র ঝুলিতেছিল। বালকের মন কখনও চঞ্চল, কখনও স্থির ভাব ধারণ করিতেছিল; কখনও চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু জল ঝরিতেছিল, কখনও চতুর্দ্দিকের শোভা সন্দর্শনে চিত্ত পুলকিত হইতেছিল। অল্পকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে আসিয়া একটী চিতা সম্মুখীন হইয়া উপবিষ্ট হইল। ক্ষণকাল পরে একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা আসিয়া ব্যস্ততা সহকারে বলিল—"দাদা! আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে না দেখ্‌তে পেয়ে বড়ই ব্যস্ত হয়েছিলাম—তুমি আমাকে ফেলে এখানে আসিলে কেন?

বালকটী বলিল—নীর! আমি এখানে এসেছি তা তুমি কেমন করে টের পেলে?

বালিকা,—তুমি আমাকে নিয়ে রোজ রোজ যে বাগানে বেড়া'তে যাও, আমি প্রথম ত এক চোটে সেইখানে গেলেম; কিন্তু তোমাকে না দেখতে পেয়ে মনটা যেন ধড় ফড় করে উঠলো। সেইখানে ভাগ্যিস সৈরির দাদা ছিল, তাই আমাকে সে চট্ করে তোমার কথা বলে দিলে। আমি ছুটে ছুটে,—দেখ আমার গা দিয়ে ঘাম পড়ছে।

বালক।—নীর! আচ্ছা বলত, আমরা প্রত্যহ যে বাগানে বেড়াতে যাই, সেই জায়গাই ভাল, না এই স্থান ভাল?

বালিকা।—না দাদা এ যেন কেমন কেমন [চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিয়া] ওমা একি!—দাদা, এটাকি?

বালক।—নীর, ভয় কি বোন! আমি যে তোমাব কাছে রয়েছি।

বালিকা।—আচ্ছা দাদা, সে দিন বাবাকে ত এই দিক পানেই নিয়ে এলো, তাবপর আব তাঁকে দেখ্তে পাইনা; এব কাবণ কি দাদা?

বালক।—নীব! এটা কি বলত?

বালিকা।—বাবাব সঙ্গে আমি একদিন পুকুবেব ধাবে বেড়াতে গিয়াছিলাম, সেই দিনকাব কথা মনে হলে মনটা যেন কেমন কবে উঠে। এই কদিন বাবাকে না দেখে একটু ২ কষ্ট হয সত্য, তা যেন কিছুই নয়। কিন্তু দাদা! তোমাকে এক টুকু না দেখ্তে পেলেই চক্ষেব জল বেবিয়ে পড়ে!

বালক।—তুমি অবোধ কিছুই বোঝনা। মা—বাপ কি, তাত বোঝনা, তাই তোমাব কষ্ট হযনা। আমাদেব মত দুঃখী আব কে? আমাদেব মাও নাই, বাপও নাই! (বোদন)

বালিকা।—দাদা! তুমি কাঁদ কেন, তোমাব চক্ষে জল দেখ্লে আমার চখেও জল যেন আপনা আপনি বেবিবে পড়ে। দাদা! আব কেঁদনা।

বালক।—মা, বাপ কি, তা তুমি কেমন কবে জান্বে? মাকে ত তোমার স্মরণও নাই; এত দিন বাবা ছিলেন, তাই কোন কষ্ট পাও নাই।

বালিকা।—বাবাকে সে দিন যখন কাপড় দিয়ে ঢেকে নিয়ে গেল, তখন একবার ভাবলেম্ বাবাকে দেখ্বো, কিন্তু তোমাকে দেখে সব ভুলে গেলাম।

বালকটী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—শৈশব সময় বড় সুখের কাল, কিছুই জানেনা, সদাই আনন্দ। আমাদিগের এত দুঃখ, ভাবতে বস্লে হৃদয় অব স্ন হয়, তা নীরদা কিছুই বোঝেনা। আমাব মন জ্বলে যায়! উঃ কি

কষ্ট! পিতা মাতা নাই, তাঁরা স্বর্গে দূর হউক, কাল আবার যে কথা শুন্‌লেম; হৃদয়, মন অস্থির হয়। আবার এমনি কর্ম্মের ভোগ, বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিতে পারিনা। আজ এইস্থানে আসিলাম, ভেবেছিলাম মনের সাধ ভরে আজ একবার কাঁদব, হৃদয়ের দুঃখ বাহিরে প্রকাশ করে দেখবো, তাতে পোড়া হৃদয়ের দুঃখ অগ্নি নিবে যায় কিনা। তা এক দণ্ড যেতে না যেতেই আবার নীর এসে উপস্থিত হলো। আর সয়না। নীরদার মন সরল, কোমল, অবোধ, কিছুই জানেনা; কিন্তু এর মুখের দিক চাইলে আমার প্রাণ ফেটে যায়, কথা আর সরেনা।

বালিকা।—দাদা, তুমি এত ভাব্‌ছ কি? আমার সঙ্গে কথা বলনা কেন? চুপ করে রইলে যে?

বালক।—কৈ নীর—কিছুই ত ভাবছিনা। মনে মনে ভাবিলেন,—কি করি! আর সয়না। দেশাচার কি কদর্য্য। বৈধব্য দশা কি ভয়ানক! নীরদার ভাগ্যেও কি এই ছিল। নীরদা ত এসব কিছুই বোঝেনা। এই অজ্ঞাত বিষে নীরদার শরীরকে জর্জ্জরিত করিবে। কি কষ্ট! নীরদার বয়েসই বা কত—বুঝেই বা কি? এত অল্প বয়েস—এর মধ্যে বিয়েই বা কেন দিলে? এ কষ্ট কি করে সহ্য কর্‌বে? নীরদার দুঃখ অপরিসীম! নীরদার কষ্ট যখন নীরদা বুঝিবে, তখন কে সমদুঃখী হয়ে নীরদাকে বোঝাবে। দেশাচার কি কদর্য্য—ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ———

বালিকা।—সন্ধ্যা হয়ে এল, দাদা বাড়ী যাবে না?

বালক।—চল যাই, আর এখানে থেকে কি কর্‌ব। (স্বগত) চিতা প্রজ্বলিত থাকৃত, তা হলে ঝাঁপ দিতাম, পিতার সঙ্গের সঙ্গী হতেম! নীর গর্ভ—কি রমণীয় স্থান, ইচ্ছা করে এই মুহূর্ত্তে আত্ম বিসর্জ্জন দি। তা হলেইবা নীরদার উপায় কি হলো! নীরদার মলিন মুখের প্রতি কে তাকাবে? আমি মরিলে নীরদা কি বাঁচ্‌বে? যে আমাকে একমুহূর্ত্ত না দেখে থাকতে পারে না, সে কেমন করে আমার অবর্ত্তমানে প্রাণ ধরিয়া থাকিবে?

সন্ধ্যা অতীত হইল। দুইটী ভাই ভগ্নী হাত ধরা ধরি করিয়া প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। বালকটীর মন সময়ে সময়ে চমকিয়া উঠিতে লাগিল। বালিকাটী নিঃসন্দেহ চিত্তে চলিতে লাগিল। প্রান্তরের মধ্যস্থান, জন প্রাণী রহিত, দুইটীই অল্প বয়স্ক, আকাশে ক্ষীণ—চন্দ্র,

চতুর্দ্দিক বায়ু সোঁ সোঁ করিতেছে; ভীষণ অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন। বালকটী ভীত মনে গাইয়া উঠিলেন,—

'সংসারে সকলি অসার ভাবিয়া দেখরে মন'

বালিকাটীও স্বর মিলাইয়া গাইল—'সংসারে—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই সমাধিস্থল।

চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অমাবস্যার রাত্রি, বৈশাখ মাস, রজনী ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল। পথ, ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। দুইটী ভাই ভগ্নী ক্রমশঃ সাহসের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে বালকটী দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন—আবার সেই প্রান্তরের শেষ সীমা। মনে নানা প্রকার ভাবনা উঠিতে লাগিল। ভয় ও বিষাদ পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া মনে স্থান নিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার বিভীষিকা আসিয়া কল্পনায় দেখা দিতে লাগিল, আর হাটিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না; বিশ্রামের জন্য তথায় বসিলেন।

বালিকাটী ভাব গতিক কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল—দাদা! আমরা আর কতক্ষণে বাড়ীতে যাব। আমি তখন ত এর চেয়ে খুব শীঘ্যির এসেছিলাম।

বালকটী কিছুই উত্তর করিলেন না। কি কর্ত্তব্য ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল।

ক্ষণকাল পরে গ্রাম হইতে কতকগুলি লোক একটী মৃত দেহ বহন করিয়া আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। বালকটীর মনে একটু সাহস হইল। একাগ্রমনে সেই লোকদিগের কার্য্যাদি অবলোকন করিতে লাগিলেন; ছোট ভগ্নিটী অজ্ঞাতসারে বালকটীর হাঁটুর উপর মস্তক রাখিয়া নিদ্রায় অভিভূতা হইল।

মৃতদেহ বাহকেরা এপর্য্যন্ত বালক বালিকাকে দেখিতে পায় নাই। এপর্য্যন্ত তাহারা কার্য্যেই তৎপর ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে একজন লোক

জল আনয়ন করিবার জন্য নদীর দিকে যাইতেছিল; হঠাৎ বালক বালিকাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল—কে?—তোরা এতরাত্রে এখানে এয়েছিস্ কেন?

বালকটী সকল বিবরণ খুলিয়া বলিলেন। সেই লোকটী সেই সময়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল—আর দেখিস্ কি, নীরদা বিধবা হইয়াছে, নীরদার স্বামীর মৃত দেহ লইয়া আমরা আসিয়াছি।

বালকটীর কথা সরিল না, চক্ষু হইতে জলও বাহির হইলনা, মুখ বন্ধ হইয়া আসিল, ভাবনার তরঙ্গ উত্থিত হইল। কত ভাবনা—মনুষ্যের মন ভাবনার আকর; ভাবনার সময়, কত ভাবনাই আসিয়া সঞ্চয় হইতে থাকে। বালকটী প্রথমে ভাবিলেন, পিতা—তারপর মাতা—আত্মীয় পরিজন—আকাশের তারা—গাছের পাতা—ভীষণ অন্ধকার—চিতা—সমাধিস্থল—জন্ম—মৃত্যু—ভালবাসা—প্রণয়—আরো কত কি। আবার ভাবিলেন, নীরদা—তার স্নেহ, বালিকাত্ব, সরলস্বভাব, ভক্তি, প্রেম, প্রীতি, নীতি,—আরো কত কি? ভাবিতে ভাবিতে শরীর নিস্তেজ হইল, অঙ্গের বাঁধনি ছিড়িয়া পড়িল, দুরস্থ স্নায়ু সকল উত্তেজনী শক্তি প্রাপ্ত হইল, চক্ষু হইতে অজ্ঞাতসারে জল পড়িতে লাগিল।

নীরদার সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দাদার চক্ষের জল ধারাবাহী হইয়া নীরদার গায়ে পড়িতে লাগিল, নীরদা কাঁদিয়া বলিল, দাদা! তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?

বালকটী একটু থামিয়া বলিলেন—না নীর! কৈ, কাঁদিব কেন? মনে মনে ভাবিলেন, নীরদা এখনও কিছুই বোঝেনা। অজ্ঞাত বিষে নীরদার শরীর ক্ষত বিক্ষত হবে! যাহা হউক, এখন আর বুঝায়ে কাজ নাই। কোন রকমে নীরকে বাড়ী লয়ে যেতে পার্‌লে হয়। তারপর যা কপালে ঘটেছে, তা ত চিরকালের সম্বল! হৃদয় বিদীর্ণ হয় না কেন? আমাকে যে এত ভালবাসে, তার ভাবী এই প্রকার শোকাবহ ঘটনার অপরিহার্য্য বিষের দংশনের কথা মনে হলে এ মন দগ্ধে যায়না কেন? ইচ্ছা হয় দেশান্তরিত হই, তাহা হইলেই বা নীরদার কি হইবে? কি শোকাবহ ঘটনা! কি ভয়ানক অত্যাচার! অবোধ বালিকা, সংসার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কি জানে, কি বুঝে? পতিবিহনে নারীর কি প্রকার দুর্দ্দশা ঘটে, কেমনে বুঝিবে? নীরদার কমনীয় সুন্দর মূর্ত্তি, মনে হলে পাষাণও বিগলিত হয়; কি কষ্ট, অপরিহার্য্য দৃশ্য!

এদিকে চিতা সজ্জিত হইল। নৈশ সমীরণ বেগে বহিতে লাগিল। জগৎ আঁধার—আঁধার হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। নয়ন সন্নিধানে ভয়ানক দৃশ্য—অপরিহার্য্য দৃশ্য! কে দেখিবে? শেষ দৃশ্য, এসংসারে আর যাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইবে না, সেই মূর্ত্তি, আর যাহার অপরূপ নয়ন মনকে হরণ করিবেনা, সেই মূর্ত্তি,—কে দেখিবে? নীরদা কি বুঝে? শেষ মূর্ত্তি কাহার না দেখিতে ইচ্ছা হয়? দেখিতে দেখিতে সব ডুবিবে, এসংসার তিলেকের মধ্যে নয়ন সমীপে আঁধার বোধ হইবে, এ সকল ভাবিতে বসিলে আর জীবনে সুখ পাওয়া যায়না, এসকল ভাবিয়া কে মনের সুখ হইতে বঞ্চিত হইবে? আজ দেখিলাম, আর দেখিব না, এ নয়ন আর জুড়াইবেনা,—কি ভীষণ দৃশ্য!!!

চিতা জ্বলিয়া উঠিল। নীরদার জীবন সুখ ক্রমে ক্রমে আঁধার আঁধার হইয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল। সমীরণ বেগে বহিতে লাগিল,—চিতা সজোরে জ্বলিয়া উঠিল। অনুতাপ—ভাবনা—সুখ—দুঃখ—ভালবাসা—প্রেম—প্রণয—আশা—ভরসা—নীরদার সব একে একে আঁধার—আঁধার হইয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল। নীরদা কি বুঝিবে? নীরদার জীবন সুখ ভস্মীভূত হইল, নীরদা বুঝিল না,—বুঝিল না এসংসার বিষ তাহাকে অসময়ে দংশন করিল।

রজনী প্রভাত হইল। বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জ্জনের ন্যায় নীরদার জীবন সুখ বিসর্জ্জিত হইল। পবন মৃদু মৃদু বহিল, শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, সংসার পরিবর্ত্তন হইল—চিতা নিবিল। আকাশে নক্ষত্র ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল, সংসার পরিবর্ত্তন হইল।

সেই বালকটী নীরদার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আস্তে আস্তে গ্রামাভিমুখে ফিরিয়া আসিলেন। মনুষ্যের হৃদয় পাষাণময়, একেবারে দ্রব হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সধবা ও বিধবা।

সেই দিন বৈকালেই নীরদার বেশ পরিবর্ত্তিত হইল! পাড়ার একটী পাষাণ-হৃদয়া স্ত্রীলোক আসিয়া নীরদার অঙ্গের আভরণ কাড়িয়া লইল। শোভার মধ্যে কেবল মাত্র একখানি লাল বস্ত্র পরিতে দিল। নীরদা বুঝিয়াও তাহা বুঝিতে পারে নাই, অথবা বুদ্ধির তীক্ষ্নতায় আর উত্তর আসিলনা; নীরদার কোন তাতেই আপত্তি ছিলনা।

নীরদার আর একটী সঙ্গিনী—সেও বালিকা। নীরদার সপ্তম বর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া তিনমাস হইয়াছে, ইঁহাকে ভাষায় আট বৎসর কহে। সঙ্গিনীর এই ১৪বৎসর অতীত হইয়াছে। সঙ্গিনীর নাম বিন্ধ্যবাসিনী, সকলে বিন্দু বিন্দু বলিয়া ডাকিত! বিন্ধ্যবাসিনী নীরদাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

লাল বস্ত্র খানি পরিয়া, নীরদা ছুটিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর নিকটে যাইয়া বলিল, বিন্দি! দ্যাখ্‌ত আমার কেমন কাপড়!

বিন্ধ্যবাসিনীর হাসি আসিল না, চক্ষু হইতে একবিন্দু জল পতিত হইল, বলিলেন, নীর! কাল তুই কোথায় গিয়েছিলি?

নীরদা।—আমি দাদার কাছে বলে দেব, তুমি আমাকে 'তুই' বলেছ। আমি লাল কাপড় খানা পরে এলেম, তাতে তুমি একটুও ভালটাল বল্লে না! আমি যাই, তোমার কাছে আর আস্‌ব না, দাদার কাছে বলেদি গিয়ে।

বিন্ধ্যবাসিনী।—(নীরদার চিবুক ধরে) ওলো আমার আহ্লাদ খানিরে! তুমি যাবে যাওনা কেন? দাদার কাছে বলেদিলে ত আমার সব যাবে! তোমার দাদা আমার কি কর্‌বে?

নীরদা;—কি করবে, তা যেন আর তুমি জাননা! আমি যাই, বলে দেই গিয়া।

বিন্ধ্যবাসিনী—আচ্ছা থাক যেওনা। না তোমার কাপড় খানি বেশ, তুমি কাল কোথায় গেছেলে, বল্লেনা?

নীরদা।—তবে বলি শুন। কাল সন্ধ্যার আগে দাদাকে না দেখ্‌তে পেয়ে মন্‌টা যেন কেমন কারে উঠলো। প্রথমতঃ আমরা রোজ যে

বাগানে যাই, সেই খানে গেলেম, কিন্তু কোথায় দাদা? সে বাগানে দাদাকে না দেখে মনটা বড়ই অস্থির হলো। সেই খানে সৈরীর দাদা ছিল, সে আমার কান্না দেখে দাদার কথা বলে দিলে; আমি সেই নদীর ধারে গিয়া দাদাকে দেখ্‌তে পেলেম; কিন্তু ভাই, দাদার মুখে সে হাঁসি নাই; আমাকে দেখ্‌লে তিনি কত সন্তুষ্ট হতেন, তা কাল যেন আরো দুঃখিত হলেন! তারপর ত সেই খানেই রাত হয়ে গেল! অনেক রাত্রে আমরা দুজনে মাঠের ভিতর দিয়া আস্‌ছি, আস্‌তে আস্‌তে, কতক্ষণ পরে দেখি আমরা আবার সেই খানেই এসেছি; দাদার মন বিরক্ত হলো! তিনি সেইখানে বস্‌লেন, আমি তাহার হাটুর উপর মাথা রেখে শুলেম। অনেকক্ষণ পরে একটু গোলমাল কানে গেল, উঠে দেখি দাদা কাঁদ্‌তেছেন। আমি দাদাকে কারণ জিজ্ঞাসলেম্; দাদা সব কান্নাটান্না রেখে আমাকে বল্লেন, 'না কাঁদব কেন?' আমি অবাক হয়ে বসে রলেম। তারপর কি বল্‌ব, সেই যে গোলমালের কথা বল্‌তেছিলাম, সেই খানে আরো দশ বারো জন লোক আগুন জ্বেলে কি যেন কর্‌তে লাগ্‌লো! আমার মনটা কি জানি কেন, যেন ধড় ফড় করে উঠ্‌লো। আমার একবার ইচ্ছা হলো দাদাকে জিজ্ঞাসি, কিন্তু কথা বার হলো না। দাদাও মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন! অনেকক্ষণ পরে রাত পোহালো, দাদা আমার হাত ধরে বাটীর দিকে চলে এলেন! তারপর আমি ঘরে গেলে দিনীর মা এসে আমার সকল গয়েনা টয়না খুলে নিলে! আমি আর কিছুই বল্লেম না। তারপর এই লাল কাপড় খানি আমাকে পর্‌তে বল্লে, আমি পরেই দাদার কাছে যাব ভাবছিলাম, কিন্তু পথের মধ্যে তোকে দেখ্‌তে পেলেম, শুন্‌লি বৌ, আমিত এর কিছুই বুঝতে পারিনা।

বিন্ধ্যবাসিনীর মন চঞ্চল হইল; দুঃখ উচ্ছ্বাস সজোরে বহিতে লাগিল। মনের ভাব গোপন করে বলিলেন, নীর, আমাদের ঘাটের ধারে কত কি ফুল ফুটেছে তা তুমি দেখ নাই, চল যাই আমরা সেই সকল ফুল নিয়ে আসিগে।

নীরদা—না ভাই! দাদাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখি নাই, একবার দাদার কাছ থেকে আসি, তার পর যাবওকন।

বিন্ধ্য।—তাঁকে এখন দেখ্‌তে পাবে না, তিনি যেন কোথায় গেছেন। চল আমরা ফুল তুলে নিয়ে আসিগে।

নীরদাদের বাটীর পিছন দিকে খিড়কীর পুকুর, তাহার চতুপার্শ্বেই ফুলের বাগান। সেখানে অনেক ফুলের গাছ ছিল; স্থানে স্থানে বসিবার জন্য আসনও ছিল। বাগানের চারিদিক পাচিলে আটা। বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া এই স্থানে বসিয়া গল্প কবিত। আমরা পূর্ব্বে যে বালকটীর কথা বলিয়াছি, তাহার প্রযত্নেই এই বাগানটী প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই বালকটীর নাম শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া পড়িতেন। শরৎচন্দ্রের পিতা নিতান্ত সামান্য লোক ছিলেন না, বিষয় সম্পত্তি অনেকছিল। শরৎচন্দ্র কলিকাতা হইতে বাটী আসিবার সময় এই সকল গাছ নিয়ে এসে এই বাগানটী সাজাইতেন। এ অনেক দিনের কথা।

নীরদাকে লইয়া বিন্ধ্যবাসিনী খিড়কীর বাগানে গেলেন। বিন্ধ্যবাসিনীর যখন কোন দুঃখ ভাব মনে উপস্থিত হইত, তখনই তিনি এই খানে আসিতেন। বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন দ্যাখ, নীর! এসকল গাছ কে এনেছে, জানিস?

নীরদা।—আমাদের বাগান আমি আর জানিনে! এ সকল আমার দাদা এনেছে? দাদা, যখন কল্‌কাতা থেকে বাড়ী আসে, তখনই কত প্রকার গাছ নিয়ে এসে, এই বাগানে পোতে, তা আর আমি জানিনে!

বিন্ধ্য।—তোর দাদা আবার কে?

নীরদা।—আমার দাদাকে যেন আর তুই জানিস্‌নে! অনেকক্ষণ দাদাকে না দেখে মনটা কেমন কর্‌তেছে, তুই জানিস ত বল্‌না ভাই, দাদা কোথায় গেছেন?

বিন্ধ্য।—কি জানি; তোর দাদার কথা আর শুন্‌ব না। তোর দাদাকে আমারও দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, তা তোর দাদা একবারও দেখা দেয় না।

নীর।—দাদা, যাহাই বলনা কেন, আমাকে খুব ভালবাসে। তোকে ভালবাস্‌বে কেন? তুই তার কে?

বিন্ধ্যবাসিনীর চক্ষের জল ছল ছল করিল, বলিলেন তা থাক্, তোকে সেদিন যে গান্‌টা শিখিয়ে ছিলাম, সেটা তোর মনে আছে?

নীর।—কোন্‌টা? সেই বিধবারটা?

বিন্ধ্য।—হাঁ সেইটা, একবার গা ত।

নীরদা সুর মিলাইয়া গাইল, "আর প্রাণে কত সয়" আবার একটু পরেই বলিল, আচ্ছা দ্যাখ বৌ, বিধবারা ত বেশ, তাহাদের কষ্ট কি?

বিন্ধ্য।—তোমার পোড়া কপাল আর কি ? (স্বগত) তা বেশ না কেমন, বিধাতা (দীর্ঘনিঃশ্বাস) তোমাকে বেশ বোঝাবেন। এখন একদিন না দেখ্‌তে পেলেই আমার মন অস্থির হয় ; নীরদা চিরকাল, চিরদিনের তরে স্বামী সুখেশ্বঞ্চিত ! বিধাত ! তোমারই ইচ্ছা।

নীর।—না ভাই, আমি এখন যাই, দাদা বোধ হয় এতক্ষণ এসেছেন।

বিন্ধ্য।—আচ্ছা তবে যাও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাল্য প্রেম।

নীরদা চলিয়া গেলে, বিন্ধ্যবাসিনী একাকিনী সেই স্থানে কতক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে কতকগুলি পুষ্প সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা মালা গাঁথিয়া একস্থানে রাশিকৃত করিতে কবিতে লাগিলেন।

এই সময় হঠাৎ সেই স্থানে শরৎচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরৎচন্দ্রকে দেখিয়া বিন্ধ্যবাসিনী ব্যস্ততা সহকারে পুষ্পগুলি রাখিয়া বসিলেন।

শরৎচন্দ্র বলিলেন, বিন্দু ! তুমি এখন আমাকে দেখে লজ্জা কর কেন ? ছেলে বেলায় যখন আমি তোমাদের দেশে যাইতাম, তখন ত তোমার এভাব ছিল না। তখন তুমি তোমার মনের কথা আমাকে খুলে বল্‌তে একদিনও কুণ্ঠিতা হতে না। সে ত অনেক দিনের কথা নয়। দেখ, তুমি যখন পুতুলের বিয়ে দিতে, আমি তখন তোমাকে বলিতাম "এই প্রকার বিয়ে দেওয়ার চেয়ে, অন্য প্রকার দেওয়া ভাল" তুমিও তখন আমার কথায় সায় দিতে। তুমি ত তখনও আমাকে বিয়ে কর্‌তে চাইতে, কিন্তু তখন ত তোমার লজ্জা ছিল না, তখন ত তুমি সরলা ছিলে। আর এইক্ষণ দিন দিনই মনের ভাব লুকাইতে চেষ্টা কর। মানুষ কোথায় না, বড় হলে ভাল হয়, তা তুমি আরো দিন দিন মন্দ হচ্চো। তুমি ফুলের মালা সাজাচ্ছেলে, তা আমাকে দেখে থাম্‌লে কেন ? এ সব কথা আমি অনেক দিন তোমাকে বল্‌ব বল্‌ব মনে ভেবেছিলাম, কিন্তু সময় পাই নাই।

বিন্ধ্যবাসিনী।—আপনি এতক্ষণ কোথায় গিয়াছিলেন। নীরদা যে আপনাকে না দেখ্‌তে পেয়ে অস্থির হয়েছে?

শরৎচন্দ্র।—নীরদাকে আজ আর দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না, তাই এদিক ওদিক বেড়াতে গিয়াছিলাম। তা যাই হউক, কপালের লিখন কে খণ্ডন করিবে? তুমি আমার এতগুলি কথায় যে কিছুই বল্লে না।

বিন্ধ্যবাসিনী।—আর বল্‌ব কি? আগে আপনাকে দেখ্‌লে লজ্জা হতো না, কিন্তু কি জানি, এখন যেন দেখ্‌লেই লজ্জা আপনা আপনি এসে পড়ে। যা হউক, আমি আর লজ্জা করব না।

শরৎচন্দ্র।—লজ্জা কর্‌বে না? তবে এস ত দেখি সেই ছেলে বেলার মত আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে বেড়াই।

বিন্দু।—তা হবে না, মানুষে দেখলে কি বল্‌বে? তা কখনই হবে না, আমি যাই—

শরৎচন্দ্র।—তবে তুমি কেন বল্লে আর লজ্জা কর্‌বে না?

বিন্ধ্য।—অনেক দিন পূর্ব্বে, (এ সেই ছোট বেলার কথা) আমি আপনাকে 'শরৎ' বলে ডাকিতাম, একটুও লজ্জা বোধ হ'ত না, কিন্তু আজ আপনাকে "শরৎ" বলে ডাক্‌তে ইচ্ছাও করে, আবার লজ্জাও করে।

শরৎ।—আচ্ছা বিন্দু! তুমি কি আমাকে আগেকার চেয়ে অধিক ভালবাস্।

বিন্দু।—বুঝি না। বাল্যকালে আপনাকে যেমন দেখ্‌তে ইচ্ছা কর্‌ত, আবার তেমনি দেখ্‌তে পেতাম। তখন যেন একটু ভাল ভাব ছিল। কিন্তু এখন একটু আত্মীয়ত্ব বোধ হয় সত্য, কিন্তু আর আপনাকে প্রায়ই দেখ্‌তে পাই না। দেখ্‌তে পাই না, তাও নয় দূর হউক! আগে আপনাতে আমাতে সমস্ত দিন বসে থাক্‌লেও কেহ কোন কথা বল্‌ত না। এখন এই যে বসে রয়েছি, এ দেখ্‌লেও কতজনে কত কথা বল্‌বে। তাই বলি আমি বুঝি না—মনে একটু কেমন কেমন ভাব হয়।

শরৎ।—তা মিথ্যা না। বিন্দু! মনের কথা বল্‌তে কি, ছেলেবেলা আমাদের মনে যে পবিত্র ভাব ছিল, এইক্ষণ তাহা নাই। বোধ হয় সে ভাব আমাদের বিবাহেতেই দূর হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের মনে যে ভালবাসা ছিল, এইক্ষণ তাহার হ্রাস হইয়াছে, বলিতেছি না। তবে সে প্রকার মনের সরলতা নাই।

বিন্ধ্য।—আপনাকে দেখ্‌তে বড়ই ইচ্ছা করে, কিন্তু—আপনি আমাকে দেখা দেন না কেন? বলিতে বলিতে বিন্ধ্যবাসিনীর বাল্য সখার কথা মনে উথলিয়া উঠিল; বর্ত্তমান অবস্থা সহসা মন হইতে অপসৃত হইল; বিন্ধ্য-বাসিনীর মস্তক অজ্ঞাতসারে শরৎচন্দ্রের হাটুর উপর ন্যস্ত হইল! বাল্যসুখ! শরৎচন্দ্র আহ্লাদে বিগলিত হইলেন। এই প্রকারে শরৎচন্দ্র এবং বিন্ধ্যবাসিনীর বাল্যপ্রেম বিকশিত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাল্য সখা।

আর একটী বালক, তার নাম অবিনাশ। অবিনাশ শরৎচন্দ্রের জেঠার এক মাত্র পুত্র সন্তান। অবিনাশ শরতের বাল্য সহচর। অবিনাশ কেবল পিতৃহীন; শরতের মা, বাপ কেহই নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে শরতের মাতার মৃত্যু হইয়াছিল, এবার তাহার পিতারও মৃত্যু হইল। অবিনাশের একটী ভগ্নী আছে, আর আপন ভাই নাই। শরতের চারিটী সহোদর এবং তিনটী সহোদরা, সহোদরের মধ্যে তুইটীর বিবাহ হইয়াছিল। নীরদা শরতের কনিষ্ঠ ভগ্নী, নীরদা এবার বিধবা হইল। নীরদার স্বামী তাঁহার মাতুলালয় মধু-পুরেই থাকিতেন। শরতের চারিটী সহোদরের মধ্যে তুইটী জ্যেষ্ঠ, এবং তুইটী কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ সহদরদ্বয়ের তুইটী স্ত্রীছিল, তাহারা শরৎকে পূর্ব্বে বড় মন্দ চক্ষে দেখিতেন না। শরতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় কৃতবিদ্য, সুতরাং পিতার বর্ত্তমানে তাঁহাদিগের ভ্রাতৃস্নেহের লাঘব হয় নাই।

অবিনাশ, শরতের কনিষ্ঠ। ছোটকাল হইতেই তুইটী ভাই গলাগলি ধরিয়া রাস্তায় রাস্তায় খেলা করিত। এখনও সেই ভাব, সেই ভাব ক্রমে ক্রমে আরও ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। অবিনাশ যখন শিশু, তখন শরতের ক্রীড়ার সহচর; আর অবিনাশ এখন বালক, শরতের বাল্য সখা। তুইজনের এমনি মিল, একজন অপরকে রাখিয়া কখনই কিছু খাইত না। তুইজনের মনের কথা তুইজনেই জানিত। অবিনাশের মাতা শরৎকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। শরতের মাতা নাই, কিন্তু অবিনাশের মাতাই শরতের

ভ্রাতার ন্যায়। মাতৃ বিয়োগের কষ্ট শরৎচন্দ্র এপর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। পিতা ছিল বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীদ্বয় তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

পিতার মৃত্যুর পর এ পর্য্যন্ত শরতের মুখে কেহই হাসি দেখিতে পায় নাই, প্রায়ই নির্জনে থাকিতে ভাল বাসিতেন। অবিনাশের সহিত দেখা হইলেও তত্টা মন খুলিয়া কোন কথাই বলিতেন না। একদিন অপরাহ্নে শরৎ অবিনাশকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে নিকটস্থ ময়দানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অবিনাশের বয়স এই সময়ে পনের বৎসর মাত্র।

অবিনাশচন্দ্র বলিলেন,—দাদা! তোমার মুখ আজ কাল এত মলিন কেন? সকল সময়েই চিন্তা কর। এত ভাব কি? কলিকাতায় যাবে, তাই ভাব কি?

শরৎ।—ভাই! মনটা বড়ই অস্থির হয়েছে। বাবা মরেছেন, তিনি ত সুখেই গেলেন, কিন্তু আমাদেব অবস্থা বড় শোচনীয়। এতদিন ঘরের সকলের একভাব ছিল; এখন দেখি আর এক ভাব। এতদিন কলিকাতা থেকে বাড়ী এলে আর ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছা হ'ত না, এখন এক দণ্ডও ঘরে থাক্‌তে ইচ্ছা করে না। বাবা মরেছেন, তাতে তত দুঃখ নাই, নীরদাও চিরকাল তরে সকল সুখ হতে বঞ্চিত হলো! আমি আর নীরদার উপায় দেখি না। নীবদাব কথা যখন ভাবি, তখন হৃদয় অপ্রচ্ছন্ন আগুনে পুড়ে ছারখার হয়! মনের কথা আর কে জানে? সমদুঃখীই বা কে আছে? কলিকাতা যাবার জন্য মনটা চঞ্চল হয়েছে সত্য, কিন্তু কলিকাতা যাইয়া এবার সুস্থ চিত্তে থাক্‌তে পার্‌ব না। নীরদার জন্য মন সদাই অস্থির। দেখ ভাই! বাবা মরেছেন আজ এক মাসও হলো না, এরি মধ্যে বৌ ঠাকুরুণদের ভাবান্তর দেখ্‌ছি? মনোদুঃখ কোথায় রাখিব?

অবিনাশ।—আজকাল তোমার যে প্রকার ভাব দেখ্‌ছি, বোধ হয় এ প্রকার অবস্থা থাকলে তোমার কোন ব্যামো হবে। বৌদের ব্যবহার যে ওরকম হবে, তা কি তুমি এতদিন ভাব নাই।

শরৎ।—ভাব্‌ব না কেন? কিন্তু তাই আজ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করি নাই। যাহাদিগের সহিত আর কখন কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাঁহাদের প্রতি আশা করা বৃথা, তা জানি, কিন্তু তবু এতদিনভাল বোধ হতো। তা যাক আমার আর কি? কেবল ভাবি নীরদার কি হবে? নীরদার এপথ, ওপথ দুই পথেই কণ্টক পড়িল!!

অবিনাশ।—সে দিন মা বলিতেছিলেন যে, ওপুরী আঁধার হলো। 'দুই দিন যেতে না যেতেই যে যাঁর পরিবার সঙ্গে করে লয়ে চল্লো' আমিত একথার কিছুই ভাব বুঝিলাম না। দাদা—তোমাদের সকলেই কি বাড়ী ছেড়ে যাবে?

শরৎ।—শুনেছিলাম, একদিন বড় দাদা বলেছিলেন যে, দেশের যে প্রকার অবস্থা, এতে শূন্য বাড়ীতে সকলকে রেখে যাওয়া উচিত নহে; তার-পর আর কি কথা ঠিক হইয়েছে, তা ভাই আমি জানি না। তাতে আমার কাজ কি? নীরদা এখন বালিকা, যেখানেই থাকুক, শারীরিক কষ্ট হলেও মনোকষ্ট পাবেনা। কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে, এই ভাবনাতেই আমার মন অস্থির হয়েছে। ভাই অবিনাশ!—যথার্থ কথা বল্‌তে কি—আর দেশে ফিরে আস্‌তে ইচ্ছা করে না; নীরদা মনের আগুনে দগ্ধে মর্‌বে, আর আমরা আমোদে থাক্‌ব!

অবিনাশ!—যা হবার তা হয়েছে। তুমি দেশে আস্‌বেনা তা হলেই বা নীরদার কি হবে? নীরদার মনোকষ্ট ত চিরসম্বল; তবে আমরা দুজন বেঁচে থাক্‌লে, আর কোন কষ্ট হবে না।

শরৎ।—তাইবা ভাই কে জানে?

অবিনাশচন্দ্র অন্যমনস্ক হইয়া বলিলেন—এই যা. দাদা—মা যে তোমাকে আমাদের ঘরে নিয়ে যেতে বলেছেন! তোমাকে ক দিন না দেখে তিনি বড়ই অস্থির হয়েছেন, চল, আমাদের ঘরে উভয়ে যাই।

শরৎ আর অবিনাশ দুইটীই বালক; শরৎ ধীর প্রকৃতি, শান্ত, চিন্তা-শীল। অবিনাশ একটু চঞ্চল এবং অন্যমনস্ক। শরৎ বলবান, অবিনাশ রুগ্ন। শরৎ কোমল স্বভাব সম্পন্ন, অবিনাশের রাগ অধিক। শরৎ স্বভা-বের গুণে যাহা করিতে পারিতেন, অবিনাশ ক্রোধের ভয় দেখাইয়াও তাহা পারিতেন না।

কাহার মনে কি আছে, তাহা কেহই জানেনা। শরৎচন্দ্র ভাবিতে জানেন, তাই দিন রাত্রি বসিয়া ভাবেন, কিন্তু কি ভাবেন, তাহা কে জানে? ষোড়শবর্ষীয় বালকের মনে এত ভাবনা কেন, তাহা কে বলিতে পারে? শরৎচন্দ্র সকল সময়েই ভাবিতেন, কিন্তু কি ভাবিতেন, তাহা প্রায়ই কাহারও নিকট খুলিয়া বলিতেন না।

অবিনাশচন্দ্র, শরৎচন্দ্রকে লইয়া তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হইলে,

তিনি বলিলেন—শরৎ! বাছা, তুমি আর আমাদের ঘরে পা, ফ্যালো না কেন? অবিনাশকে যখন কোন দ্রব্য খেতে দিই, তখনই তোমার কথা মনে উঠে, আর মন দগ্ধে যায়। শরৎ! নীরর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে যে এই কতক্ষণ তোমাকে খুঁজ্‌তেছিল!

শরৎচন্দ্র।—না জেঠাই মা, নীরদার সঙ্গে আমার প্রায় ৫ ঘণ্টা দেখা নাই, সে কি আপনার কাছে এসেছিল?

মাতা।—সে কি একবার? আর না হলে দশ বারো বার এসেছিল। আমি তাকে দুই তিনবার কত বল্লেম যে, আর দুদিন পরে তোর দাদা যখন কলিকাতায় যাবে, তখন তুই থাক্‌বি কেমন করে? তাতে সে বলে উঠ্‌লো 'আমিও দাদার সঙ্গে যাব,—'শরৎ! নীরদাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে গেলে আমাদেরও ভাল বোধ হয়; না হলে যে বারো দেশে যায়, সে টা যেন কেমন কেমন লাগে।

শরৎচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জেঠাই মা!—আমার কি সাধ্য! আমার কি ইচ্ছা করেনা যে নীরদাকে আমার সঙ্গে রাখি। (স্বগত) ঈশ্বর করেন ত মনের সাধ মিটাব, নচেৎ দেশান্তরিত হয়ে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব।

অবিনাশ।—আচ্ছা মা! নীরদা ত কিছুই বোঝেনা; এত অল্প বয়সে বিধবা হলো, আর একবার বিয়ে দিলে দোষ কি মা?

মাতা।—সাধ কি হয় না? তবে কিনা লোকে মন্দ বলিবে সেই ভয় করি। কপালে সুখ না থাক্‌লে বাছা কিছুতেই সুখ হয় না, কপালে সুখ না থাক্‌লে রাজরাণীও ভিকারিণী হয়।

সন্ধ্যার সময় এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে নীরদা আসিয়া বলিল—দাদা! তুমি নাকি কাল কলিকাতায় যাবে? তোমাকে বড় দাদা ডেকেছেন, চল, তিনি ব্যস্ত হয়েছেন।

শরৎ।—জেঠাই মা! তবে শুনে আসিগে।

মাতা।—একটু শিগ্গির করে এস বাছা।

শরৎচন্দ্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন, অবিনাশচন্দ্র ও "দাদা আমিও আসি" বলে পিছানে পিছানে যাইতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উপায়হীন।

শরৎচন্দ্র আগে আগে, (অবিনাশচন্দ্র পাছে পাছে) যাইয়া বড় বধূঠাকুরাণীর নিকট বলিলেন—বৌঠাকুরণ! বড় দাদা আমাকে ডেকেছেন কেন, তা আপনি কিছু জানেন ?

বৌ-ঠা।—এই যে, ঠাকুরপো! এতক্ষণ আপনি কোথায় গিয়েছিলেন। আসুন, আজ আর আপনি বৈকালে কিছুই খান্‌নাই, জলখাবার খান এসে।

শরৎচন্দ্র একটু বিস্মিত হইলেন; মনে মনে ভাবিলেন, কেবল আজ কেন, বাবার মৃত্যুর পর ত একদিনও বৌ ঠাকুরণ এত আদর করেন নাই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবিনাশের প্রতি কটাক্ষ করিলে, অবিনাশচন্দ্র কাণে কাণে বলিলেন, আজ বৈকালে বড় দাদা সকলকে বড রাগ করেছেন, তাই এত আদর। চল যাই খাই গিয়া।

জলখাওয়া হইলে পর শরৎচন্দ্র এবং অবিনাশ এক সঙ্গে মিলিত, হইয়া বড় দাদার নিকটে গেলে পর তিনি বলিলেন, শরৎ! তোমাদের স্কুল খুলেছে, আর বাড়ী থেকে কাজ নাই, আগামী কল্য তোমরা কলিকাতায় রওনা হও়। আগামী পরশ্বঃ রোজ আমি সকলকে লইয়া কার্য্য স্থানে যাইব।

শরৎচন্দ্র কিছুই বলিলেন না; একবার ভাবিলেন, নীরদার কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সাহস হইলনা। বড়দাদা পুনরপি বলিলেন, তোমার স্ত্রীকে তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া যাইব।

শরৎচন্দ্র এবার বলিলেন—আর নীরদা ?

বড় দাদা।—নীরদাকে এবার আমার সহিতই লয়ে যাব, তার পর যা হয় হবে।

শরৎচন্দ্র, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, যে বড় বধূ ঠাকুরাণীর কাছে নীরদা এক মুহূর্ত্তও থাকেনা, তিনিই নীরদার অবলম্বন হবেন। বৌ ঠাকুরণ নীরদাকে দেখ্‌তে পারেন না কেন, তা বুঝিনা; তা যাই হউক এবার নীরদার দুঃখের সীমা রহিলনা। দেশে থাকিলে তবু যা হউক অবিনাশ ছিল, জেঠাই মা ছিলেন; দুঃখের সময় তাঁহারা একটু

আদর করতেন ; এখন কষ্ট দিলেও উনি দেবেন, সুখে রাখুলেও উনি রাখবেন। তা আমি আর কি করিব, কোন উপায় দেখিনা।

একদিন গেল ; তারপরদিন কলিকাতায় নৌকা প্রেরিত হইবে, মহা ধুম! জিনিস পত্র নৌকায় উঠিতে লাগিল। নীরদা মনে মনে জানিত, সেও শরতের সঙ্গে কলিকাতায় যাইবে। তাহার যেখানে যা ছিল সকল একত্র করিয়া মাজীদের নিকট দিল ; মাজীরা জানিতনা, যা যা পাইল সকলই নৌকায় তুলিল।

শরতের সঙ্গে ভাগ্যক্রমে সহসা নীরদার দেখা হইল। শরৎচন্দ্র নীরদার প্রফুল্ল চিত্ত দেখিয়া বলিলেন—নীর, আমরা আজ কলিকাতায় যাইব, তাতে তোমার এত আহ্লাদ কেন ?

নীরদা বলিল, আমিও যে যাব, তা তুমি কি জাননা ?

শরৎচন্দ্র বুঝিলেন, নীরদার এই আশাই এত হর্ষের কারণ ; কিন্তু সকলই বৃথা ! হঠাৎ নীরদাকে বলিলে পাছে নীরদা কষ্ট পায়, তাই তাহাকে ওকথা আর কিছু না বলে, বলিলেন—নীর !—আমার চেয়ে বড় দাদা যে তোমাকে অধিক ভালবাসেন, তা কি তুমি জান না ?

নীরদা।—না দাদা, আমি তা জানিনা। আর কোন দাদার জন্যই আমার মন তত অস্থির হয় না।

শরৎ।—দেখ, বড় দাদা তোমাকে একদিনও ফেলে খান না। যেখানে যা পান, সকলি তোমার জন্য নিয়ে আসেন। বড় দাদা তোমাকে সকলের চেয়ে ভালবাসেন।

নীরদা।—ভালবাসেন, তাতে কি দাদা ?

শরৎ।—তা কিছু নয়! তবে কি না তুমি আমার সঙ্গে গেলে ত আর বড় দাদাকে দেখ্‌তে পাবে না।

নীরদা।—কেন দাদা, বড় দাদা যাবেন না ?

শরৎ।—তিনি কলিকাতায় যাবেন না ; তিনি তাঁহার কার্য্য স্থানে যাবেন।

নীরদা।—সে আবার কোথায় ?

শরৎ।—তুমি তাঁর সঙ্গে যাবে ?

নীরদা।—না দাদা, তা যাব না ; আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

শরৎ।—আর আমি যদি তোমাকে না নিয়ে যাই ?

নীরদা।—না নিয়ে যাও, কাঁদ্‌ব। তুমি আমার কান্না দেখ্‌লে কখনই রেখে যেতে পার্‌বে না। শরৎচন্দ্রের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, মনের ভাব গোপন করে বলিলেন, নীরদা! তুমি বড় দাদার সঙ্গেই এবার যাও, তার পর আবার যখন বাড়ী আস্‌ব, তখন তোমাকে লয়ে যাব।

নীরদা।—না দাদা তা হবে না। আমি যাবই যাব। আর, যদি তুমি আমাকে না নিয়ে যাও, তবে আমি জলে ঝাপ দেব।

এবার শরৎচন্দ্র ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না; বলিলেন, নীরদা, তোমার কপাল মন্দ, নাহলে আজ তুমি আমার সঙ্গেই বা যাবে কেন? নীর আর অমন কথা ব'ল না। তোমার মুখে অমন কথা শুনলে আমার মন অস্থির হয়। দেখ নীর! আমি যেখানে থাকি সেখানে তুমি থাক্‌বে কেমন করে? সে অতি ভয়ানক স্থান। মনে মনে ভাবিলেন, নীরদার কথা শুনলে মন অস্থির হয়। ইচ্ছা করে নীরদাকে সঙ্গে করে লয়ে যাই। কোথায় খাব সেই একটা ভাবনা। তা আমারও যা হবে, নীরদারও তাই। আমি যদি খেতে পাই, তবে নীরদাও পাবে, নয় আমার অংশই নীরদাকে ভাগ করে দেব। না—সে কষ্ট নীরদার সহ্য হবে না, নীরদা বালিকা। আমার সহিত থাক্‌লে নীরদার মনটা একটু ভাল থাক্‌বে বটে, কিন্তু অন্য নানা প্রকার কষ্ট হবে। তবে আর নীরদাকে নিয়ে যেয়ে কাজ নাই, কিন্তু তা ত বলিলে শুনে না, তবে অবশেষে গোপনেই যেতে হলো। আমরা আজ রাত্রে যাবো, কালি সকালে নীরদা উঠে যখন আমাকে দেখ্‌তে পাবে না, তখন নীরদার মন কেমন কর্‌বে? নীরদা ভাবিবে, 'দাদার মত নিষ্ঠুর আর নাই। তাতেই কি নীরদার মনে ক্ষোভ মিটিবে? কাল সমস্ত দিন আর নীরদা খাবে না; সমস্ত দিন কাঁদ্‌বে।

নীরদা—দাদা, তুমি কি সত্য সত্যই আমাকে সঙ্গে করে নিবে না?

শরৎচন্দ্র দেখিলেন, নীরদার চক্ষু হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতেছে। পিতৃ, মাতৃহীন অনাথা নীরদার চক্ষের জল দেখিয়া শরৎচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে কত প্রকার দুঃখের কথা উঠিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র বলিলেন, সে কথায় আজ কাজ কি নীর? আমরা ত আজ যাবো না, যখন যাব সে তখনকার কথা।

নীরদার চক্ষের জল নিবারণ করিবার জন্য শরৎচন্দ্র প্রবঞ্চনা করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। যে নীরদার চক্ষের সামান্য জল পড়া দেখিতে শরৎচন্দ্র

আজ অনিচ্ছুক হইলেন, সেই নীরদার চক্ষের জল কত দিন পড়িবে, কত কাল পড়িবে! শরৎচন্দ্র ভাবিলেন, নীরদার এ জল চিরকাল পড়িবে, তবুও আজ প্রবঞ্চনা দ্বারা সে জল নিবারণ করা উচিত। শরৎচন্দ্র সকলই ভাবিলেন, কিন্তু ভাবিলেন না, অদ্যকার প্রবঞ্চনায় কল্য নীরদার দুঃখ আরো বৃদ্ধি হইবে। অথবা ভাবিলেও সে জল, সে দুঃখ শরৎচন্দ্র দেখিতে পাইবেন না।

রজনীযোগে উপায়হীন শরৎচন্দ্র অনাথা নীরদাকে রাখিয়া নৌকা খুলিয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন।

পরদিন শরৎচন্দ্রের বাটীর অন্যান্য সকলকে লইয়া শরতের বড় দাদা কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন। বাটীর দরজায় চাবি পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনেক ঘটনা।

তারপরের বৎসব অবিনাশ চন্দ্রও পড়িতে কলিকাতায় গমন করিলেন। শরৎচন্দ্র এবং অবিনাশ বৎসর অন্তর একবার কি দুইবার করিয়া বাটীতে আসিতেন। বিন্ধ্যবাসিনী একয়েক বৎসর পিত্রালয়েই রহিলেন। নীরদা প্রভৃতি সমস্ত বৎসরের কথা বিন্ধ্যবাসিনীকে বলিত, বিন্ধ্যবাসিনীর নিকট হইতে নীরদার সুখ ও দু খের কাহিনী শরৎচন্দ্র বৎসরেব শেষে একবার শুনিতে পাইতেন।

এই রকম কবিয়া ৭।৮ বৎসর চলিয়া গেল। প্রথম দুই তিন বৎসর নীরদার মনের দুঃখের কথা শরৎচন্দ্রের কাণে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু চতুর্থ বৎসর হইতেই একটু একটু করিয়া মনের কথা বাহির হইতে আরম্ভ হইল। এতদিন নীরদা কেবল বৌঠাকুরুণদিগের কঠোর ব্যবহারেই অস্থির হইয়া ভাবিত, 'আমার চেয়ে কষ্ট আর কাহারও নাই'; কিন্তু ক্রমে যেমন দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসব, এই রকম করিয়া তিন চারি বৎসর যাইতে লাগিল, তখন নীরদা বুঝিতে পারিল, এত দিন ভালই ছিলাম, এখন আর সহ্য হয় না। সহ্য হয় না, এই কথা নীবদা যখন বুঝিতে পারিল, তখন হইতে আর নীরদার কিছুই ভাল বোধ হইত না।

সহ্য হয়না কখনী? শৈশব সময়ের মত সুখের সময় আর নাই। বালক বালিকাগণ সংসারের ভাল মেওয়ায় মন্দ জানে না, খাওয়া দাওয়া ব্যতীত তাহারা আর সংসারের ধার ধারে না। বৃদ্ধ,—তাঁহাদেরও সহিতে সহিতে সহিয়া আইসে, অর্থাৎ রিপুর আধিপত্য তখন নিস্তেজ হয়, কাজেই সকল সহ্য হয়! সহ্য হয় না কখন? সহ্য হয়না—যখন রিপুর আধিপত্য প্রখর সূর্য্যের ন্যায় তীক্ষ্ণতর। মধ্যাহ্নে সূর্য্যের তেজ প্রখর, কাহারও সহ্য হয় না; যৌবনে মানবের রিপু প্রখর,—অসহনীয়। যৌবনে রিপুর দৌরাত্ম্য,—দৈত্য সকল মানবকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করিয়া দেয়, তাই সহ্য হয় না। যে সময় লোকের মুখে শুনা যায়—আর সহ্য হয় না, সেই তাহার যৌবন; এমন সর্ব্বনেশে সময় আর জীবনের কোন অংশই নহে! শৈশবে নীরদাকে যে আশীবিষে দংশন করিয়াছিল, এতদিন পরে সেই বিষের জ্বালা আরম্ভ হইল। জ্বালা আরম্ভ হইল, কিন্তু এজ্বালার যন্ত্রণা জীবনে থামিবে না, তাহা আজও নীরদা বুঝিতে পারে নাই,—তাহা বুঝিতে আরো সময় বাকী রহিল।

কয়েক বৎসর পর সে সময়ও আসিল। যে ৭।৮ বৎসরের কথা বলা হইয়াছে, সে সময়ে নীরদা সকলি বুঝিতে পারিত। যে রজনীতে শরৎচন্দ্র নীরদাকে প্রবঞ্চনা করিয়া চক্ষের জল নিবারণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ের পর আর শরৎচন্দ্র ইচ্ছা করিয়া নীরদার নিকট তাহার দুঃখের কথা শুনিতেন না। বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহার এ অভাব পূরণ করিতেন।

নীরদার বয়স এইক্ষণ ১৫।১৬ বৎসর। বিন্ধ্যবাসিনী বিংশতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন; স্ত্রীলোকের সুখের সময় এক রকম কাটিয়া গিয়াছে। নীরদার দুঃখের প্রকৃত সময়ই এই। নীরদার মুখে হাসি নাই; নীরদা বড় একটা কথা কয়না। খাইবার সময় হইলে দুটী খায়, শুইবার সময় হইলে শোয়, শুইলে নিদ্রা আসে না,—কেবল চিন্তা। নীরদা জানিত, এখন বুঝিত, এ চিন্তা চিরসম্বল! নীরদার দুঃখ অসীম!

শরৎচন্দ্র কলিকাতায় থাকিতে বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহার নিকট যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে কেবল নীরদার দুঃখের কাহিনী থাকিত।

দুই বৎসর হইল নীরদা আর বড় দাদার সঙ্গে যায় না। নিজের ভালমন্দ নিজেই বুঝে। শ্বশুর বাড়ী সুখের আলয়, আবার শ্বশুর বাড়ী দুঃখের আলয়। স্ত্রীলোকের আশা ভরসা সকলই শ্বশুর বাড়ী হইতে;

আবার সকল প্রকার নৈরাশ্যও ঐ এক স্থান হইতেই উৎপন্ন হয়। স্বামী থাকিলে শ্বশুর বাড়ীর মত সুখের স্থান জগতে আর নাই, আর না থাকিলে অমন দুঃখের স্থান আর কোথায়? নীরদা ভাবিল, জীবনে আর সুখ নাই, তবে বৃথা সুখে কাজ কি? এই ভাবিয়া এই দুঃখের আলয়কে বাসস্থান ঠিক করিয়া, শ্বশুর বাড়ী আসিয়া আর যায় নাই। তবুও শ্বশুর আছে, শাশুড়ী আছে, তবুও দেবর আছে! যাহার পিতা মাতা নাই,—তাহার শ্বশুর, শাশুড়ীর ন্যায় আরাধ্য দেবতা আর কোথায়? আর যাহার পুত্র নাই, তাহার দেবরের ন্যায় স্নেহের পাত্র জগতে আর নাই!! নীরদা নিজের অবস্থা বুঝিয়াই শ্বশুর বাড়ী ছাড়িয়া যায় নাই।

নীরদার শ্বশুর বাড়ী আর বিন্ধ্যবাসিনীর পিত্রালয় এক গ্রামে। এইক্ষণ নীরদার সহিত বিন্ধ্যবাসিনীর প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হইত। নীরদার দুঃখের কথা বিন্ধ্যবাসিনী শুনিতেন এবং সেই কথা শরৎচন্দ্রের নিকট কলিকাতায় লিখিতেন।

শরৎচন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া নাম মাত্র স্কুলে পড়িতেন; প্রধান কাজ ছিল পত্র লিখা এবং ক্রীড়া। লোকে ঠাট্টা করিয়া শরৎচন্দ্রকে ডাকাইত বলিত। পূর্ব্বে, পূর্ব্ববাঙ্গালায় এক প্রকার খেলা প্রচলিত ছিল, এখনও কোন কোন গ্রামে আছে; কিন্তু বৃটীশ-শাসিত ভারত সাম্রাজ্যের কোন সহরে এইক্ষণ আর সে প্রকার খেলা প্রচলিত নাই, সে খেলা তরবারি সম্বন্ধীয়। পূর্ব্বে এই খেলায় অনেক লোক মরিত, অনেক লোক ডাকাইত হইত; অনেক লোক লাঠিয়াল হইত। শরৎচন্দ্র তরবারি (পাইক) খেলায় একজন বিশেষ পারদর্শী লোক ছিলেন; তাঁহার সহিত খেলায় কেহই জয় লাভ করিতে পারিত না।

অবিনাশচন্দ্র স্কুলে রীতিমত পড়িতেন, অবিনাশ ভাল ছাত্র। লোকে শরৎচন্দ্রকে মন্দ বলিত, অবিনাশকে ভাল বলিত, কিন্তু ইহারা দুইজনে অকৃত্রিম প্রণয়ে আবদ্ধ। অবিনাশচন্দ্র জানিতেন, তরবারি খেলায় শরতের অদ্বিতীয় ক্ষমতা, তাহার তাহা নাই। শরৎচন্দ্র জানিতেন, লেখা পড়ায় অবিনাশ বিলক্ষণ পটু, তাহার সে ক্ষমতা অল্প। সুতরাং কাহারও মনে অহঙ্কার বা আত্মাভিমান ছিলনা; দুই জনের প্রাণ, এক প্রাণ ছিল।

অবিনাশের মাতা এখনও ক্ষীণ জীবন বহন করিতেছিলেন, অবিনাশের ভগ্নী এখনও জীবিত আছেন।

যে কথা বলিবার জন্য এত কথার সূত্রপাত হইল, তাহা এ বৎসরের কথা। এ বৎসর শরৎচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন। শরৎচন্দ্রের স্কুলের পড়া কেবল মাত্র একটা উপলক্ষ ছিল, এই বৎসরের শেষে শরৎচন্দ্রের বিড়ম্বনার শেষ হইল। শরৎচন্দ্র জুনিয়র পরীক্ষা দিয়া স্বদেশে আসিলেন। অবিনাশ চন্দ্র কলিকাতাতেই থাকিলেন।

স্বদেশে যাইয়া বিন্ধ্যবাসিনী এবং নীরদার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, কারণ তাহারা স্থানান্তরে ছিল। সময়ে নীরদাকে আনয়ন করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী আসিলেন না।

কিছুদিন পরে পরীক্ষায় কুফল ফলিল। শরৎচন্দ্র যেমন জানিতেন, তাহাই শুনিলেন, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। দেশশুদ্ধ লোকে শরতের গায়ে থু থু দিতে লাগিল, বিন্ধ্যবাসিনী ভয়ে কিছুই লেখেন নাই, নীরদা দুঃখিত হইয়া কিছু বলিতে ইচ্ছা করে নাই। শরৎচন্দ্রের মনে একটু দুঃখ হইল, ভাবনা আসিল, চিন্তার স্থান বিস্তীর্ণ হইল!! শরৎচন্দ্র দিন রাত্রি ভাবিতেন; লোকেরা ঠাট্টা করিত, তবু ভাবিতেন; জীবনের ভাবী পরিণাম দিন রাত্রি জপ করিতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্র পরিগ্রহ।

বাল্যকাল হাসিতে খেলিতে চলিয়া যায়; কোন ভাবনা নাই, সংসারের কোন চিন্তা নাই, জীবনের ভাবী পরিণামের কথা হৃদয়ে স্থান পায় না, সদাই সুখ, সদাই আনন্দ!! দুঃখের ঘটনা ঘটিলে মন ক্ষণকালের জন্য মেঘাচ্ছান্ন হয় বটে, কিন্তু তাহা কতক্ষণ থাকে? এক দিন, দুই দিন, তারপর আর সে মেঘ থাকে না, তারপর আবার আমোদ, আবার ক্রীড়া কৌতুক। বাস্তবিক বালকের মত সুখী জীব আর নাই।

তারপর ছাত্র,—যাহারা স্কুলে অধ্যয়ন করে। স্কুলে অধ্যয়ন কালে ভাবনা আছে, সে ভাবনায় সুখ ভিন্ন দুঃখ নাই। যাহারা বিদ্যার অমূল্য রত্ন বাছিয়া লইতে সক্ষম, তাহাদের শত ভাবনা থাকিলেও দুঃখ নাই। তবে দুঃ

কোথায়? দুঃখ আছে সংসারে,—দুঃখ আছে সংসারের চিন্তায়,—দুঃখ আছে সংসারের অর্থে।

শরৎচন্দ্রের সুখের সময় চলিয়া গেল! শরৎচন্দ্র বিদ্যার তিমিরময় গর্ভ হইতে অমূল্য রত্ন বাছিয়া লইতে পারিলেন না, তাহার জীবনের সুখের সময় অতিবাহিত হইল। শরৎচন্দ্রের মনে ভাবনা উপস্থিত হইল,—সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যে ভাবনা, শরৎচন্দ্রের মনে সেই ভাবনা উপস্থিত হইল।

লোক বড় হয় অনেক রকমে। কেহ পথ বাছিয়া বিনা কণ্টকাঘাতে উন্নতিতে আরোহণ করে, কেহ আঘাতে আঘাতে সতর্ক হইয়া উঠিতে থাকে, আর কেহ দৈববলে উঠিয়া যায়। কালিদাস, শঙ্করাচার্য্য আর শিবজি, ইহারা সকলে এক পথ অবলম্বন করিয়া উন্নতি লাভ করেন নাই। কেহ এ পথে, কেহ ও পথে। কেহ আঘাত পাইয়াছেন, কেহ আঘাত পান নাই, কেহ হঠাৎ উঠিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের পথ অবলম্বন করিবার এই প্রথম আঘাত। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের মনে ভাবনা উপস্থিত হইল। এতদিন হাসিয়া খেলিয়া সময় কাটিয়াছে, এইক্ষণ প্রকৃত ভাবনার সময়। শরৎচন্দ্র যে দিন ফেল হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই ভাবিতে আরম্ভ করেন,—ভবিষ্যতে কোন্ পথে অগ্রসর হইবেন। শরৎচন্দ্রের একদিকে সংসার—বিন্ধ্যবাসিনী—নীরদা—আত্মীয় পরিজন—সুখের স্বপ্ন; অপর দিকে দেশ—দেশের হীনাবস্থা—স্বীয় তরবারি শিক্ষা—বীরত্ব। একদিকে যশ; অপর দিকে নিন্দা। একদিকে সুখ; অপর দিকে চিরদুঃখ। শরৎচন্দ্র ভাবিতে বসিয়া দেখিলেন, একদিকে অর্থের চিন্তা—স্বার্থ সিদ্ধির উপায়—অধীনতা—চির কলঙ্ক; অপর দিকে অর্থ নাই, কেবল স্বার্থ নাশ—কেবল স্বাধীনতা—কেবল স্বর্গ সুখ।

মনুষ্যের মন দুর্ব্বল, শরৎচন্দ্র আবার দেখিলেন,—আশা বলিয়া দিতেছে, "এই পথে আইস, দেখ কত লোক আসিতেছে, সুখ পাইবে, জীবন সার্থক হইবে; অপরদিকে নৈরাশ্য ভয় দেখাইতেছে,—"কোথায় যাইবে, কে খাইতে দিবে, অর্থ কোথায়, আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই, অন্ধকার—হয় মৃত্যু, নয় মৃত্যু যন্ত্রণা।"

আবার মনের গতি ফিরিল, আবার ভাবিয়া দেখিলেন,—একদিকে অর্থ চিন্তায় শরীরও মনকে জর্জ্জরিত করিতেছে, সুখ নাই—কলহ-বিবাদ, বন্ধু-বিচ্ছেদ, পাপ-লিপ্সা; অপর দিকে সাহসে বলিয়া দিতেছে, 'অর্থ চাই

না, মন প্রাণ দাও, স্বাধীনতা বা স্বর্গ সুখের দ্বার অবারিত রহিয়াছে।' শরৎচন্দ্র ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না, তথাপি ভাবনা ছাড়ে না; ভাবনায় আবার দেখায়, একদিকে বিন্ধ্যবাসিনী চিৎকার করিয়া ক্রন্দনের ধ্বনিতে গগন কাঁপাইতেছে, বলিতেছে, 'নাথ আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? আমি মরিব; তোমা বিহনে সংসার জাল ছিঁড়িব।' নীরদা বলিতেছে, দাদা! আমার পৃথিবীতে আর কেহ নাই।' অপর দিকে ভীষণ সমর ক্ষেত্র, তরবারি লইয়া যোদ্ধাগণ উৎসাহিত চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আবার একদিকে,—অর্থের জন্য পরপদ অর্চ্চনা, পরপদে অঞ্জলি দান, সংসারের মনতুষ্টার্থ অর্থের সেবা! শরৎচন্দ্র ভাবিলেন, বিন্ধ্যবাসিনীও অর্থের জন্য আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। নীরদা কি ভাবিতেছে? ভাবিতেছে, দাদার চাকুরি হইলে আমার কষ্ট যাইবে। বিন্ধ্যবাসিনী ভাবিতেছে, শরৎ যে দিন পরপদ অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় ক্ষমতায় দুটাকা আনিতে পারিবে, সে দিন আর আমাকে পিত্রালয়ের কষ্টে এবং আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতে হইবেনা। এই অর্থ যদি না পাই, তাহা হইলে বিন্দু আমাকে পর ভাবিবে, নীরদা নৈরাশ হইবে, আমাকে ধিক্কার দিবে। নচেৎ দর্শন যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে বিন্দু ও নীরদা আমার অনুসরণ করুক না কেন! এক দিন আমিও মরিব, বিন্দুও মরিবে; নীরদার অস্থি আর কতকাল পৃথিবীতে পড়িয়া ছিন্নভিন্ন হইবে? তবে আমার সঙ্গে আসুক,—নয় ভীষণ অন্ধকারে ডুবিব। তবে আর ওদিকে চাহিব না। শরৎচন্দ্র ভাবিলেন, তবে সংসারের আশা ছাড়িয়া দিই। অর্থ অর্থ করিয়া পরপদ অর্চ্চনার আশা মন হইতে দূর করি. সংসার যা'ক! আত্মীয় পরিজন,—সুখের স্বপ্ন—দূর হউক! যদি তরবারি সহায় থাকে, যদি মন্ত্র সাধনার মর্ম্ম বুঝিয়া থাকি, যদি আমার মন্ত্র পরিগ্রহ হইয়া থাকে, তবে যাই, যে দিকে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনবৎ সমর ক্ষেত্রে যোদ্ধাগণ আনন্দে নৃত্য করেন; তবে যাই, যে দিকে অর্থ নাই, অর্থের সাধনা নাই। সংসারে থাকিয়া কি করিব? জীবনে সুখ থাকে, সুখী হব, দুঃখ থাকে, দুঃখে দিন কাটাব; তবু পথ আবিষ্কৃত হইবে, যে পথে বঙ্গবাসীরা ভ্রমেও পদনিক্ষেপ করেন না, তবু সে পথে হাটিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইব।—তবে যাই, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে বিন্ধ্যবাসিনীকে একখান পত্র লিখিয়া দেখি, বিন্দু আমার অনুসরণ করে কিনা। না করে;

বুঝিব, বিন্দুর মুখের কথা বৃথা, মন সরল নহে; বুঝিব, বিন্দু যাহা বলে, সকলই আমার মন রক্ষার্থ। তবে পত্র লিখি; এই বলিয়া শরৎচন্দ্র পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন;—

"প্রাণের বিন্দু! কতবার তোমাকে দেখিয়াছি, কিন্তু আবারও দেখিতে ইচ্ছা করে! তোমাকে দেখিবার তৃষ্ণা আমার আর মিটিল না। এবারও দূরদেশ হইতে তোমাকে এবং নীরদাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তোমার দেখা পাইলাম না, তুমি দেখা দিলে না!! আমার মনের ইচ্ছা মনেই রহিল। তুমি তোমার পিত্রালয়ে সুখে আছ, থাকিতে পার, আমি সেখানে সুখ পাইনা; যেখানে সুখ পাইনা সেখানে যাইব কেন? তুমি বলিবে, "মনে সুখ থাকিলে, সর্ব্বত্রই সুখ মিলে" আমি তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তোমাদের ওখানে গেলে আমার মনের সুখও চলিয়া যায়, তাই তোমাদের ওদেশে যাইয়া আর দেখা করিলাম না। আর দেখা করিবই বা কাহার সহিত? তুমি আমাকে ভালবাস বলিয়া থাক, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভালবাস কিনা, তাহা কে জানে? ভালবাসিলে আমার সহিত দেখা করিতে তোমার লজ্জা বোধ হইত না। সাধে কি আমি সমস্ত দিন তোমাদের বাড়ীর ঘাটে নৌকায় শুইয়া থাকি? আমি তোমাকে দেখিবার জন্যই তোমাদের ওদেশে যাই, কিন্তু কোথায় তুমি? সমস্ত দিন তোমাকে একবারও দেখিনা, তুমি সমস্ত দিবসের মধ্যে একবারও আমার সহিত দেখা কর না। তুমি দেখা করনা কেন? দেখা কর না—তুমি তোমার চিরাশ্রিত লজ্জাকে অধিক ভালবাস, তোমার দেশীয় সকলকে অধিক ভালবাস; তাই আমার সহিত দিনের বেলায় দেখা করনা। সমস্ত দিন লজ্জা এবং আত্মীয় স্বজনের পূজার জন্য রাখিয়া, রজনী যোগে শরৎ-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ কর!! অবগুণ্ঠনবতি! আবার বল তুমি আমাকে অধিক ভালবাস? ভালবাসিলে সমস্ত দিন তোমাকে দেখিতে পাইতাম, যে জন্য এই দূরদেশ হইতে অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া যাইতাম, তাহা পূর্ণ হইত, কিন্তু তাত হয় না? সাধে কি আমি নৌকায় যাই! অন্য লোক দেখিতে হইলে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, চিরদিন দেখিলেও দেখিয়া শেষ করা যায় না; অন্য লোকের সহিত দেখা করিতে আমি তোমাদের ওদেশে যাইব কেন? যেখানে যাই, সেই থানেই অন্য লোক পাই—পাইনা কেবল বিন্ধ্যবাসিনীকে। বিন্দু! তোমাকে দেখিবার জন্যই

তোমাদের দেশে যাই, তা তুমি লজ্জাপ্রযুক্ত দেখা দাও না, মনোদুঃখে রজনী প্রভাত হয়, মনোদুঃখে নৌকায় দিন কাটাই। যে পর্য্যন্ত তোমার এই লজ্জা থাকিবে; যতদিন পর্য্যন্ত আমা অপেক্ষা তোমার লজ্জাকে অধিক ভালবাসিবে, ততদিন আর তোমাদের ওখানে যাইয়া দেখা করিব না।

আর একটী কথা, তোমার কষ্টে আমি যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছি; এই মুহূর্ত্তে ইচ্ছা করে, হয় তোমাকে লইয়া থাকি, নয় মনের বাসনা পূরাই। এইক্ষণ আর গোপন করিতে অভিলাষ নাই। ছোট বেলা হইতে,—বিন্দু স্মরণ করিয়া দেখ, যখন কলিকাতায় পড়িতে যাইতাম, তখন হইতে মনে একটী বাসনা ছিল, সেই বাসনাকে এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি, এই-ক্ষণ হয় সেই বাসনা চরিতার্থ করিব, নচেৎ তোমাকে লইয়া সংসারে প্রবেশ করিব, বিড়ম্বনার জাল বিস্তৃত করিব! বিন্দু! তোমার উত্তর চাই। একদিকে তুমি, নীরদা, সংসার; অপরদিকে—দেশ, ভীষণ সমর ক্ষেত্র—মৃত্যু! এখন বল ত বিন্দু! কোন্ পথে যাইব। তুমি যদি আমার সহিত যাইতে পার, তাহা অপেক্ষা আর সুখের কিছুই নাই; তাহা হইলে চল এইক্ষণই শরীর মন দেশের জন্য বিসর্জ্জন দি। বিন্দু! দুঃখিনি! ভয় পাইও না। আমি কাপুরুষ নহি; আমি তোমাদিগকে কষ্ট দিবার জন্য আসি নাই। মনের কথা এতদিন এই জন্যই গোপন করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, তোমার মন সবল হইলে তারপর বলিব; আর প্রতীক্ষার সময় নাই; তাই বলিলাম, প্রিয়ে! ভয় পাইও না। আবার সংক্ষেপে বলি, আমার যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার অভিলাষ আছে; তোমার বাধা না থাকিলে লিখিও, শীঘ্র পত্রের উত্তর লিখিও। তবে আজ বিদায় হই।"

মধুপুর, ২৫এ চৈত্র। } তোমারই শরৎ।

পত্রখানি ডাক যোগে বিন্ধ্যবাসিনীর নিকট প্রেরিত হইল; শরৎচন্দ্র উত্তর পাইবার আশায় বাটীতেই রহিলেন। বাটীতে থাকিয়া থাকিয়া মনকে আরো দৃঢ় করিলেন। পাষাণে মন বাঁধিয়া জীবনের সার মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন;—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

নবম পরিচ্ছেদ।

বিন্ধ্যবাসিনীর পত্র।

বিন্ধ্যবাসিনী যখন শরৎচন্দ্রের পত্র পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মন কি প্রকার ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমরা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ; তাহার পত্র খানি অবিকল এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

দুঃখিনী বিন্দুর জীবন——শরৎ!

হর্ষে তোমার পত্রের কথা পড়িতে বসিলাম, কিন্তু পড়িতে পড়িতেই হর্ষ ফুরাইয়া গেল; ঘোর বিষাদ মনকে ঘেরিল। সুখী হইব বলিয়া তোমার পত্র খুলিয়াছিলাম, কিন্তু সুখ কোথায়? তোমার পত্র আমাকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিল। আমার যে একমাত্র আশা ছিল, তাহাও আজ ফুরাইল; দুঃখিনী আজ নৈরাশ সাগরে ঝাঁপ দিল!!

প্রাণের শরৎ।—এত দিন পরে তুমি আজ তোমার মনের কথা খুলিয়া বলিলে, শুনিয়া আমার মন চমকিয়া উঠিল! মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলাম, তা মন প্রবোধ মানিল না। শরৎ! আমি কাঁদিতে জন্মেছি, আমার আবার সুখের আশা?

শরৎ! পত্র লিখিতে আজ আর লেখনী সরেনা। তুমি আমাকে এই সংসার সমুদ্রে ভাসাইয়া কোথায় যাইবে? অশৈশব আমি সমুদ্রে ভাসিতেছি—আর কত কাল ভাসিব? তুমি কি আমার উপায় করিবে না? কূল কি পাইব না; এ নয়নের জল কি মুছিবে না? শরৎ! তোমার পদসেবা কি আমার কপালে ঘটিল না। আমি কত দিন আর এই প্রকার ঘৃণিত অবস্থায় পিত্রালয়ে থাকিব? আমি আর কত দিন সমুদ্রে ভাসিব? * * * *

শরৎ! আজ নয়নের নীরে ভাসিতেছি—তুমি কোথায়? বিন্ধ্যবাসিনীর নয়নের কোণে একবিন্দু জল দেখিলে, তোমার প্রাণ ফেটে যেতো, আজ আশাশূন্যা অনাথিনীর নয়ন জলে সমস্ত শরীর সিক্ত; কিন্তু তুমি দেখিলে না। দেখিলেনা—যে আশার মূলে এতদিন শয়ন করিয়াছিলাম, সেই আশার মূলচ্ছেদনে বিন্দুর প্রাণ কি প্রকার ছট্‌ফট্‌ করিতেছে!!

আর আশা নাই—কল্পনা নাই, জীবনের সুখ নাই; আজ আমার জীব-

নের সুখ বিদায় দিলাম, অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডন করিবে? আমি এত দিন কুহকিনী সুখ স্বপ্নের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভাবিতাম—'অদৃষ্ট কি'— আজ সে স্বপ্ন ভাঙ্গিল; অদৃষ্টের দুঃখ ঘাড় পাতিয়া মস্তকে লইলাম!

আমি অনেক কাঁদিলাম, হয়ত তুমি হাসিবে, আমাকে পাগল বলিবে। যাহাই বল, আমার মনের কয়েকটী কথা আজ তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম, বিরক্ত হইও না। বিরক্ত হইয়া তোমার একমাত্র মধুর পত্র লেখাও ক্ষান্ত করিও না। আমার কি? আমি দুঃখ নীরে ঝাপ দিয়াছি, চিরদিন ভাসিব। যাহার সমুদ্রে শয্যা, তাহার আবার শিশিরের ভয় কি? বাল্যকাল হইতে সমুদ্রে ভাসিতেছি, একবার তরঙ্গ পীড়নে ডুবিতেছি, আবার ভাসিতেছি, এবার নয় একেবারে ডুবিব, তার ভয় কি?

শরৎ! মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করি, মন প্রবোধ মানে না। বিনাইয়া বিনাইয়া কত বুঝাই, তা পোড়া মন বুঝে না। অবলাবালার দোষ কি নাথ! মনকে পাষাণ দিয়া বাধিতে পারি না; তুমি শিখালে না কেন? আমার দুঃখ কে বুঝিবে! তুমি আমাকে পাগল বলিবে, বল; নিশ্চয় জানিও, কিছুদিন পরে তোমার বিন্দু পাগল হইবে!

তুমি অনাথা বিন্ধ্যবাসিনীকে কাঁদাইয়া সংসারকে হাসাইতে যাইবে, যাও, বিন্দু বারণ করেনা। একাকিনী বিরলে বসিয়া বিন্ধ্যবাসিনী কাঁদিবে— আর এই সমস্ত দেশ প্রকাশ্যে হাসিবে; বিন্দু বারণ করিবে কেন? তুমি সংসারকে হাসাও, বিন্দুর ভাগ্যে যাহা আছে ঘটিবে। শরৎ! বিন্ধ্যবাসিনীর নির্জ্জন বিলাপধ্বনি কি দেবতাদিগের কর্ণে পৌছিবে না?

জন্মিলে মরিতে হইবে, ইহা ত সকলেই জানে, তবে আত্মীয়ের মৃত্যুতে লোকে এত দুঃখ প্রকাশ করে কেন? এসংসারে চিরস্থায়ী কিছুই নহে, যে ক্রন্দন করে, সেও একদিন এই দুঃখ পূর্ণ পৃথিবীকে ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। আমিও মরিব,! হয় আজ—নয় কাল, তবে আবার কাঁদি কেন? মন বুঝে না। পীড়ায় মৃত্যু হইলে ততদুঃখ হয় না; কিন্তু অপমৃত্যুতে মনে একটা খেদ্ থাকে, আমি আরো উহাকে দেখিতাম! এই খেদেই মন অজ্ঞাত বিষে পুড়িয়া ছারখার হয়।

তুমি অযথা আমাকে তিরস্কার করিয়াছ, আজ হতে আমার লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিলাম। আজ হতে অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিলাম! তুমি কি তবু আমাকে চরণ থেকে ঠেলিবে? তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাও, আর যাহাই

কর, আমি তোমার অনুসরণ করিব। না পারি মরিব, তবুও আর কষ্ট সহ্য করিব না।

শরৎ! তুমি কি জান না, বিন্দু তোমা ভিন্ন আর কিছু জানে না। আমার দুঃখ, সুখ সকলই তুমি! আমি সুখী হইলেও তোমার প্রসাদে হইব, দুঃখী হইলেও তোমার দ্বারাই! আমি তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানি না। বিন্দুর ক্ষমতা কি নাথ! তোমাকে সুখী করিবার আমার সাধ্য নাই, দুঃখী করিবারও সাধ্য নাই। শরৎ! বিন্দু তোমাকে কখনই কাপুরুষ মনে করে না। আমি তোমাকে কখনই দোষ দিব না—দোষ আমার—দোষ আমার অদৃষ্টের!

আমি শৈশব হইতে এই বিশবৎসর পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে দ্বারে দ্বারে অনাথিনীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, সেও আমার দোষ; তোমার ক্ষমতা থাকিতেও আমাকে এই সমুদ্রে ভাসাইয়া পতিত দেশকে উদ্ধার করিতে যাইবে, সেও আমার অদৃষ্টের দোষ। নাথ! তোমার কি দোষ! আমার অদৃষ্টের দোষ না হইলে যাহার গর্ভে দশ মাস দশ দিন অবস্থিতি করিয়া ছিলাম; তারপর যখন ক্ষুধায় অস্থির হইতাম, সম্মুখের আহার পরিত্যাগ করিয়া যে গর্ভধারিনী স্তন্য-পান করাইয়া আমাকে সুস্থ করিতেন, তিনিও (আমি অসহায়া) আমাকে সমুদ্রে ভাসিতে দেখিয়া, দূর করিয়া দিতে চাহেন! এদোষ কাহার নাথ! আমার কপাল মন্দ,—আমার অদৃষ্টের বিড়ম্বনা!!

শরৎ! তোমাকে পাইয়াও আমি তব সহবাস-জনিত সুখ ভোগে বঞ্চিত; হয়ত চিরবঞ্চিত হইতে বসিয়াছি, এ দুঃখ কাহাকে জানাইব? কে বুঝিবে? আমি কোথায় যাইব?—এ পৃথিবী শূন্যময় দেখিতেছি,—সকলই অন্ধকারবৎ বোধ হইতেছে। বিধাত! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! আমি বলিয়া থাকি নীরদা এবং সুশীলা * আমা হইতেও দুঃখিনী। এত দিন তাহাদিগের দিকে চাহিয়াই জীবিত ছিলাম, কেননা নীরদার পতি নাই, পিতা নাই, মাতা নাই, সুশীলার পতি নাই, মাতা নাই; তাহারা তবু মনকে প্রবোধ দিতে পারে—'এসংসার হইতে তাহারা বিদায় লইয়াছে,' তাহারা তাই বলিয়া কাঁদে। আমি কি বলিয়া কাঁদিব; আমার পিতা, মাতা, তুমি, সকলই জীবিত, তবে আমার দুঃখ কেন?

* সুশিলা বিন্ধ্যবাসিনীর মাতৃহীনা বিধবা ভগিনী; শরৎচন্দ্রের ভ্রাতৃবধূ।

তোমার পত্রে আর একটী কথা পড়িয়া আমি যার নাই ব্যথিত হইয়াছি, তুমি লিখিয়াছ, আমি পিত্রালয়ে সুখে থাকি; পিত্রালয়ে থাকিয়া সুখ পাইলে সুশীলা মধুপুরে পতিশূন্য-গৃহে গিয়াছে কেন? পিত্রালয়ে সুখ থাকিলে, মাতৃহীনা অনাথা নীরদা মধুপুর ছাড়িয়া তাহার পতিশূন্য শ্বশুরালয়ে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে কেন? পিত্রালয়ে সুখ থাকিলে, সৌদামিনী * মধুপুরে থাকে না কেন? যদি কেহ বলে পিত্রালয়ে সুখ আছে, সে আমার মত পিত্রালয়ে বাস করুক, বুঝিতে পারিবে পিত্রালয়ে কি সুখ! যে স্থানে তুমি এক মুহূর্ত্তও সুখ পাওনা, আমি সেই স্থানে অহঃরহ, কত দিন, কত মাস, কত বৎসর বাস করিতেছি। আমার মনে একটী আশা ছিল, একটী ভরসা ছিল, সেই আশার পানে তাকাইয়াই আজিও জীবিতা রহিয়াছি। শরৎ! তুমি কি আমাকে সেই আশা হইতে বঞ্চিত করিবে?

আজ অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম, তাতে মনে কিছু ভেব না। তুমি আমার মনে যে কষ্ট দিয়াছ—আমিই তাহা বুঝিতেছি—মনে রেখ, আমাকে ভুলিওনা।

পুঃ আজ তোমার সঙ্গে যাইতে পারিলে, আমার মনে ক্ষোভ থাকিত না; কিন্তু ভয় হয়; বিষাদ হয়?

তোমারি

চিরদুঃখিনী—বিন্দু

দশম পরিচ্ছেদ।

উপদেশ।

শরৎচন্দ্র বাটীতে একা ছিলেন; সম্প্রতি নীরদা আসিয়াছে। অবিনাশের মাতা রান্ধিয়া দেন, শরৎচন্দ্র আহার করেন। নীরদার পাক নীরদা আপনি করিয়া লয়। বালিকা নীরদা এখন বুদ্ধিমতী, না বুঝে এমন কিছুই নাই। সমস্ত দিন শরৎচন্দ্র কেবল নীরদার সহিত কথা বার্ত্তায় সময় কাটাইতেন। নীরদার মনে যে সকল সন্দেহ ছিল, সে সকল এই সময়ে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

* শরৎ চন্দ্রের একটী দূর সম্পর্কীয়া ভগিনী।

বিন্ধ্যবাসিনীর নিকট পত্র লেখার পর, আর শরৎচন্দ্রের কোন বিষয় ভাল লাগিত না; সকল সময়েই প্রায় চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। আর যখন অন্যমনস্ক থাকিতেন, তখন নীরদকে বুঝাইতেন।

এ দিনটা একটু মেঘাচ্ছন্ন হইল। মেঘ আকাশকে ছাইয়া ফেলিল, ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। শরৎচন্দ্র চিন্তা করিবার সময় ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতেন না, ঘরে বসিয়া ভাবিলে নীরদা আসিয়া বিরক্ত করিবে, এই আশঙ্কায় তিনি নির্জ্জন স্থানে যাইয়া ভাবিতেন। আজ আর যাওয়া হইল না। বৃষ্টি ক্রমে ছিট্ ছিট্ পড়িতে ধারাবহী হইয়া পড়িতে লাগিল, শরৎচন্দ্র স্থানান্তরে যাইবার বাসনা ছাড়িলেন। ক্ষণকাল পরে নীরদা আসিয়া উপস্থিত হইল।

শরৎচন্দ্রের পার্শ্বে নীরদা উপবিষ্টা, শরৎচন্দ্র একটু অন্যমনস্ক, কি যেন ভাসিতেছিলেন—নীরদা বলিল '———দাদা!'

শরৎচন্দ্র চমকিয়া বলিলেন '—কি নীর?——

নীরদা! আপনি সে দিন আমাকে বুঝাইতে বুঝাইতে উঠিয়া গেলেন, আজ সেই বাকী অংশটা বলিয়া দিন?——

শরৎ। সেই বাকী অংশটা কি, তা ত আমার স্মরণ নাই; তোমাকে কোন্ বিষয় বলিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করিয়া দেও, বুঝাইতেছি।

নীরদা। মন ঠিক থাকে না কেন? আপনি বলিয়াছিলেন, আমার জীবনের সুখ, দুঃখ এ সকলই ঈশ্বর হতে। যদি কখনও সুখী হই, তাহাও ঈশ্বরের সেবায়, আর তা না হলে বুঝিব, আমার মতি সংসারে লিপ্ত; তাত বেশ বুঝেছি। আপনি বলেছেন, দিন রাত্রি সেই একমাত্র অনাথস্মরণ দীনবন্ধুকে ডেক, তিনি তোমার মন ঠিক রাখিবেন। তা কই দাদা আমি ত প্রত্যহ ডাকি, প্রত্যহ তাঁহাকে মন দিবার জন্য প্রস্তুত থাকি, তা পোড়া মন সংসার ভুলিয়া ক্ষণকালও থাক্‌তে চায় না। রাত্রে যখন নির্জ্জনে দীনবন্ধুকে ডাকিব, তখনও নানা প্রকার সংসারের চিন্তা, সংসারের ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হয়, মনকে আজও ঠিক করিতে পারিলাম না, মন ঠিক হয় না, দাদা। এর উপায় কি?

শরৎ। নীর! ব্যস্ত হওনা। প্রার্থনার অঙ্গ ভক্তি, বিশ্বাস, বিনয় আর ধৈর্য্য, এই কয়টী অঙ্গ ঠিক থাকিলে তবে প্রার্থনা সফল হয়। কেবল ভক্তি থাকিলে হয় না; কেবল বিশ্বাস থাকিলে হয় না, কেবল বিনয় থাকিলে হয়

না; আরও কিছু চাই—সেটী ধৈর্য্য। তুমি দু দিন না যেতে যেতেই মন ঠিক হলো না বলে চঞ্চল হয়েছ?—কত সাধক চিরকাল যোগ, ধ্যান করেও তবু মনকে সম্পূর্ণ ঠিক রাখিতে পারেন না। যে সংসারে শৈশব হইতে এই পর্য্যন্ত নিমজ্জিতা হইয়া রহিয়াছ, সে সংসারকে সহসা ভুলিতে পারিবে, এমন আশা করিও না। আবার নৈরাশ্যও হইও না, আজ না হয় কাল হবে, কাল না হয়, তার পর দিন হবে, নয় পর মাসে হবে, নয় পর বৎসরে হবে, নয় মৃত্যু সময়ে হবে। তবু হবেই, এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করিও। প্রার্থনার অর্থ কি? নীর তা জাননা। সত্য সত্য ঈশ্বরই কি আসিয়া মনকে সবল করিয়া দেন? না নীর, এ বিশ্বাস করিও না। প্রার্থনা শুনিলেন যিনি, তিনি ঈশ্বর; আর প্রার্থনার ফল যাহা হইতে হইল, তিনি মানব। প্রার্থনার যদি কিছু গুণ থাকে, তাহা এই,—"মন শত শত বার পাপ পঙ্কে নিপতিত হইলেও প্রার্থনা আবার সে মনকে সবল করে--আবার উর্দ্ধার করে। আজ প্রার্থনা করিলাম—প্রার্থনার পরেই আবার পাপ করিলাম, মনে অনুতাপ হইল, তার পরদিন আবার প্রার্থনা করিলাম; এই প্রকার হইলে মন কখনই সবল হইবে না। একটু চেষ্টা চাই, একটু ইচ্ছা চাই। আজ পাপ করিলাম—আর কাল যাহাতে না করি সে ইচ্ছা, সে চেষ্টা মানবের! ঈশ্বর সে চেষ্টা করেন না! প্রার্থনার গুণ এই, পাপ হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছা, চেষ্টা, এবং শক্তি এই প্রার্থনা হতেই হয়। প্রার্থনাই মনকে সবল করে। কিন্তু নীর ধৈর্য্য চাই। সংসারে পাপের স্রোত এত প্রবল, সংসারের আকর্ষণ শক্তি এমন প্রবল যে, পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেও সেই স্রোত টানিয়া লয়। আমি তুমি কোন্ ছার! প্রার্থনা কর—বিশ্বাস কর যে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, ধৈর্য্য ধর যে সহসা মন বিচলিত না হয়; দেখিবে অসাধ্য যাহা তাহাও সাধিত হইয়া আসিবে। আজ যাহা পরিতেছ না, সময়ে তাহাই অভ্যাস হইয়া আসিবে, আর মন এ দিক ও দিক যাইবে না। চিন্তার সময়, ভাবনার সময়, ধ্যান আরাধনার সময়, পাপের সংসার কোথায় যাইবে, আর খুঁজিয়াও পাইবে না।

নীরদার মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, কাতর স্বরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল;—দাদা! আপনার নিকট এই কথা গুলি শুনে মন শান্ত হলো। অস্থির মনে কিছুই ঠিক পাই না, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি। আপনার নিকটে থাকিলে মন সুস্থ থাকে। আপনি আর কত দিন বাড়ী আছেন?

এই সময়ে পত্র বাহক একখানি পত্র আনিয়া শরৎচন্দ্রের হাতে দিল ; শরৎচন্দ্র পত্রখানি দেখিয়াই বিন্দুবাসিনীর পত্র বুঝিতে পারিলেন। উৎসুক মনে পত্রখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলেন। নীরদা দুই একবার পত্রখানি পড়িয়া শুনাইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র শুনাইলেন না। পত্রখানি সমাধা হইল—শরৎচন্দ্রের মনে গাঢ় চিন্তা উপস্থিত হইল। ক্ষণকাল পরে নীরদা সে স্থান হইতে অন্যমনস্ক হইয়া উঠিয়া গেল!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রের সাধনা।

ঘাত, প্রতিঘাত, মানব-হৃদয়-বৈচিত্র্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা এতক্ষণ পরে যে অধ্যায়ের অবতারণা করিতে বসিয়াছি, ইহা তাহার একটী দৃষ্টান্ত। সংসার তাড়নায় কালক্রমে মানব-চরিত্রে প্রতিনিয়ত যে ঘাত প্রতিঘাত হইতেছে, তাহা পাঠে নীতি শিক্ষার সহায়তা করে কি না, আমরা সে বিষয়ের আলোচনা এ স্থলে করিব না। যাঁহারা সমালোচক, তাঁহারা সে বিষয় লইয়া ঘোর আন্দোলন করিতে থাকুন : আমরা মনুষ্য-চরিত্রের বৈচিত্র্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি ; তাহা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। আমাদের অন্য খপরে কাজ কি ?

সহানুভূতি, সহৃদয়তা, পরদুঃখে-কাতরতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসা, এসকল উৎকৃষ্ট সামাজিকের অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ। যেখানে সমাজ, সেই খানেই অন্যের দুঃখে মন গলিয়া যায়, সেই খানেই অন্যের রোদনে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আর যেখানে রাজনীতি সেখানে কঠোরতা, কপটতা। রাজনীতি মনের সকল সৎবৃত্তিকে সমূলেই নষ্ট করিয়া ফেলে, সহস্র ক্রন্দনেও রাজনীতিজ্ঞের মন বিচলিত হয় না।

আবার সেই পূর্ব্ব অধ্যায়ের কথা। শরৎচন্দ্রের হাতে বিন্ধ্যবাসিনীর পত্র। শরৎচন্দ্র সমস্ত দিন মলিন ভাবে ভাবিয়াছেন—বিন্দুর অদৃষ্ট, আপনার ভাবী পরিণাম ; কিন্তু ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। শরৎচন্দ্র কেবল সামাজিক হইলে বিন্দুর বিলাপে গলিয়া যাইতেন, আবার কেবল

রাজনীতিজ্ঞ হইলে, বিন্দুর কথায় কর্ণপাত না করিয়াই স্বীয়-মন্ত্র সাধনার পথে অগ্রসর হইতেন। শরৎচন্দ্র সামাজিকও নহেন, রাজনীতিজ্ঞও নহেন, অথচ তাঁহাতে এ দুইয়ের অসদ্ভাব নাই। চিন্তা, ভাবনা, ঘাত, প্রতিঘাত এই সময়ে অসম্ভব নহে।

শরৎচন্দ্রের মনে যখন বিন্দুর পত্রের প্রত্যেক পুংক্তি পড়িতে লাগিল, তখন ভাবিলেন, অসহায়া বিন্দুকে সংসার সমুদ্রে ভাসাইয়া যাইব না। কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে পড়িতে লাগিল, চিরকালের বাসনা, জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়, তখনই হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল। তখনই মনে হইতে লাগিল, 'বিন্দু ভাসিতেছে, ভাসুক' আমার বাসনা আমি পূরাইব। একটী একটী পথ অবলম্বন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে সহস্র সহস্র ভাবনার পথ আবিষ্কার হইতে লাগিল, ভাবিতে লাগিলেন,—

'যদি জানিতাম বিবাহ দাসত্ব, তবে কখনই বিবাহ করিতাম না; বিবাহ করিতাম না, চিরকাল মনের আশা চরিতার্থ করিতাম। সংসারের যে কণ্টকে মনের বাসনা পূর্ণ করিতে দেয় না, সে কণ্টক পরিষ্কার করিতে কুণ্ঠিত হইব কেন? বিন্দু? বিন্দু জন্মেছে কাঁদিতে,—মরিবে কাঁদিয়া; সে জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করিব কেন? উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা বিবাহের সময় জানিতাম না; জানিলে কোন পাপিষ্ঠ ইচ্ছা করিয়া ফাঁদে পা ফেলিত? আর কোন্ মূঢ়ই বা সংসারের আশ্রয় লইত? বিন্দু আমার জন্য কাঁদে কেন? তাহাকে কে জানিত? 'আমি তাহার,' একথার সূত্রপাত কে করিল? বিবাহ কাহাকে বলে জানি না। যদি জানিতাম অজানিত বিষপান বিবাহ;—যদি জানিতাম লুক্কায়িত ব্যাধের ফাঁদ বিবাহ, যদি জানিতাম মনবাসনা পূর্ণ করিবার দারুণ কণ্টক বিবাহ, তবে যে মুহূর্ত্তে বিবাহের কথা কর্ণে প্রবেশ করাইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে আত্মঘাতী হইতাম; কিন্তু তখন জানি নাই বিবাহ কি!! তখন শৈশবসময়, সংসার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এই অপরিজ্ঞাত পিঞ্জরে যখন প্রবেশ করি, তখন কিছুই জানিতাম না। ভুলাইয়া আত্মীয় পরিজন এই সর্পবিবরে আমাকে পাঠাইয়াছেন, এইক্ষণ কাল-সর্পদংশনে প্রাণ যায়? কোথায় আত্মীয় পরিজন; কোথায় স্বার্থপর সংসার?

না বুঝিয়া কুকার্য্য করিয়াছি, না বুঝিয়া ফাঁদে পা দিয়াছি, না বুঝিয়া সর্প বিবরে আসিয়াছি, এখন আমার ক্ষমতা থাকে, আমি অবশ্য রক্ষা

পাইব। সংসার হাসে, হাসুক; নির্লজ্জ স্বার্থপর সংসার মন্দ বলে, বলুক; কি ভয়? নিরপরাধিনী বিন্দুর উপায় কি হইবে? হৃদয় বিদীর্ণ হয়! তা আমি কি করিব; সমস্ত জীবন উৎসর্গ করা সহজ কথা নহে। পারিব না; তা প্রাণান্তেও করিবনা; আমি নিশ্চয় জানি পাপের ভাগী আমি হইব না।”

“বিন্দু! যাহা ইচ্ছা তাহাই বল, আমি কি করিব? আমার ক্ষমতা নাই। আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। তোমার জন্য জীবন কাড়িয়া লইতে পারি না। আগে জানিলে তোমাকে ভাল বাসিতাম না।”

“কত বার বিন্দুকে বুঝাইলাম, সংসারের সুখ দুঃখ কিছুই নহে, কেবল মনের ভাব; তা বুঝিয়াও বুঝে না। এত দিন বুঝিল না; নিশ্চয় আর বুঝিবে না। না বুঝিলে, আমি আর তার কি করিব? এক ক্ষমতা আছে, মরিতে পারি। মরিতে পারি, তবু বিন্দুর সুখের জন্য অর্থের অন্বেষণে পর-পাদুকা মস্তকে বহন করিতে পারি না। মরিলে বিন্দুরও সুখ হইবে না; আমার জীবনের উদ্দেশ্য মুকুলেই বিনষ্ট হইবে; তবে মরিব কার জন্য?”

শরৎচন্দ্র আবার ভাবিলেন—“ভাবিয়াছিলাম আমার এই সময়ে, বিন্দু আমাকে বাধা দিবে না। মনুষ্যের মনে আশাই একমাত্র অবলম্বন। মনুষ্যের মনে যে ভ্রম, এ প্রকার ভ্রম আর কোথাও নাই। বিন্দুকে কত কথা বলিতাম, কত উপদেশ দিতাম, কত দৃষ্টান্ত দেখাইতাম, বঙ্গীয় নারীগণের চরিত্র আলোচনা করিবার ছলনে কত কথা বলিতাম; ভাবিতাম আমার আশা চরিতার্থ করিবার সময় বিন্দু আমাকে বাধা দিবে না। এই আশায় এত দিন আহ্লাদে ছিলাম; অহো দুর্ভাগ্য! কি বিড়ম্বনা!”

“বিন্দু আমাকে বাধা দিল; তবে আমার আর মমতা কি? তবে যাই! সংসার—থাক। আত্মীয় পরিজন! আশীর্ব্বাদ করি, সুখে থাক; যদি আমার প্রত্যাশা করিয়া থাক, তবে তাহা ভুলিয়া যাও। নীরদা! তোমার সুখই বা কি, দুঃখই বা কি? তোমার দুই সমান। আমার জীবন দুঃখময়! যদি বুঝিতাম, আমার দ্বারা তোমার দুঃখ মোচন হইতে পারে, তাহা হইলে আমি যাইতাম না; কিন্তু ভগ্নি! তাহা হইবে না। যদি বুঝিয়া থাক, আশা করিয়া থাক, তবে তাহা ভুলিয়া যাও। তুমি দুঃখের কীট—দুঃখই তোমার সুখ। নীর! বৃথা সুখ আশা করিও না! আমাকে বিদায় দেও।”

এই বার শরৎচন্দ্রের নয়ন হইতে জল পড়িল; শরৎচন্দ্রের সংসারে

নীরদার মত আর কেহই ছিল না; সেই নীরদাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময়, হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

রজনী তৃতীয় প্রহর, গ্রামের কোলাহল অনেকক্ষণ থামিয়াছে, পশু পক্ষী সকলই নীরব, জ্যোৎস্না আর নাই, পঞ্চমীর চাঁদ অস্তমিত। শিশির বিন্দু, বিন্দু পড়িয়া দুর্ব্বাদল সকল সিক্ত করিয়াছে, পুকুরে মৎস্যগণ দুই এক বার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিতেছে। শরৎচন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পুকুরের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; গৃহ হইতে বাহিরে আসিবার সময়, একটী কুকুর এক বার ডাকিতে ডাকিতে শরৎচন্দ্রের নিকটে আসিয়াই যেন কি ভাবিয়া নীরবে ফিরিয়া গেল। পুকুরের ধারে একা শরৎচন্দ্র! শরৎচন্দ্রের মন উত্তেজিত; শরৎচন্দ্র ভাবিতেছেন আর মনে মনে বলিতেছেন,—তবে অদ্যই যাই। মন ঠিক করিয়াছি, তবে আর মায়া বাড়াইয়া প্রয়োজন কি? মধুপুর! তবে আজ বিদায় হই! যদি কখনও এমুখ প্রসন্ন হয়; তবে আবার আসিব। জন্মভূমি! প্রসন্নচিত্তে আজ বিদায় দাও!

শরৎচন্দ্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক থানি ধুতি পরিধান, এক খানি উড়ানী গায়ে, সঙ্গে পাঁচটী মাত্র টাকা; শরৎচন্দ্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গৃহ, পুকুর, ময়দান, গ্রাম ক্রমে ক্রমে সকলকে অতিক্রম করিয়া শরৎচন্দ্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যে পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; ইহার ভাবী পরিণাম কি প্রকার তাহা কে বলিতে পারে? শরৎচন্দ্র পরিণাম ভাবেন নাই। ক্রমে মধুপুর অন্ধকারবৎ দেখা যাইতে লাগিল। শরৎচন্দ্র সাহসের উপর নির্ভর করিয়া চলিলেন; এক বারও ভাবিলেন না,—ভাবিলেন না নীরদা ঘরে একাকিনী শয়ন করিয়া আছে, আগামী কল্য তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে!!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

একি স্বপ্ন?

রজনী প্রভাত হয় নাই; পাখী কুলায়ে বসিয়া ভ্রমে একবার একবার ডাকিতেছে, আবার নীরব হইতেছে, ক্ষণকাল পরে আবার ডাকিতেছে।

গ্রাম্য কুক্কুর কচিৎ শব্দ শুনিয়া একবার একবার চমকিয়া উঠিয়া ডাকিতেছে, আবার চুপ করিতেছে, পার্শ্ববর্ত্তী কুক্কুর সকল অমনি ডাকিয়া একতার পরিচয় দিতেছে। দুই এক ঘরে দুই একটী দীপ জ্বলিতেছে, দুই এক ঘরে শিশু সন্তান কাঁদিয়া উঠিতেছে, মাতৃস্নেহ অমনি ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিতেছে। এক ঘরে রোগী—সে ঘরে সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বলিয়াছে, এখনও জ্বলিতেছে। দুই এক ঘরে দুই একটী বালক বালিকার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, তাহারা হর্ষে আমোদ করিয়া গান করিতেছে, আর গুরুজনের দ্বারা তিরস্কৃত হইতেছে। যে ঘরে স্বামী স্ত্রী শয়ান, সে ঘর এইক্ষণ নিস্তব্ধ। পূর্ব্ব দিক ভাল করিয়া ফরসা হয় নাই। শীতল সমীরণ মৃদু মৃদু বহিতেছে। কদলীবৃক্ষ-পত্র বায়ুর সহিত নৃত্য করিতেছে। একটী পাখী ডাকিয়া নীরব হইতে না হইতে আর একটী পাখী ডাকিতেছে; অনেকক্ষণ পরে আবার সকলে থামিতেছে। শরৎচন্দ্রের ঘরে দীপ নির্ব্বাপিত, গৃহে শুইয়া এক বিছানায় একাকিনী নীরদা, আর এক স্থানে দুইজন পরিচারিকা। বারাণ্ডায় এক ধারে শরৎচন্দ্র শুইতেন, সে বিছানা শূন্য; অন্য স্থানে আর দুইটী আত্মীয়।

তৃতীয় প্রহরাতীত রজনীতে নীরদার একবার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তারপর আর গাঢ়তর নিদ্রা আসিল না। নানা ভাবনা একদিকে, নিদ্রা এক দিকে, দুই দলে যুদ্ধ হইল; কোন দলের কামনা পূর্ণ হইল না। নীরদার চক্ষে গাঢ়তর নিদ্রা বসিল না, চক্ষুর সম্মুখে যেন কি ঘুরিতে লাগিল; ক্ষণকাল পরে স্বপ্নে দেখিল, শরৎচন্দ্র একটী ময়দানের মধ্য দিয়া কোথায় যেন চলিয়া যাইতেছেন। নীরদা চমকিয়া উঠিল, কিন্তু নিদ্রা একেবারে ভঙ্গ হইল না; ক্ষণকার পরে আবার দেখিল, শরৎচন্দ্র যেন নীরদাকে বলিতেছেন,—নীর! আমি চলিলাম, তুমি থাক।

এবার নীরদার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; স্বপ্ন দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল 'দাদা! কোথায় যাবে?' নীরদার ঘুম ভাঙ্গিল, 'দাদা দাদা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল; দাদা উত্তর করিল না। নীরদা কাঁদিতে আরম্ভ করিল, গৃহের অন্য লোক জাগিল। অন্য লোক জাগিল; রজনী প্রভাত হইল। শরৎচন্দ্রের খোঁজ নাই। নীরদা একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নদী গর্ভে!

যথন রজনী প্রভাত হইল, তখন শরৎচন্দ্র মধুমতীর তীর পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। বেলা অগ্রসর হইতে লাগিল। শরৎচন্দ্র একটু চলেন আর একটু বসেন, এই প্রকার করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন.; যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, মনের অবস্থা ততই মন্দ ভাব ধারণ করিতে লাগিল। কেন আসিলাম, কোথায় যাইব? এই সকল চিন্তা উঠিতে লাগিল। মন উত্তর করিতে লাগিল,—'আসিলে বাসনা চরিতার্থ করিতে',—উৎসাহ পথ দেখাইতে লাগিল,—'চল এই পথে'। শরৎচন্দ্র এইক্ষণ পর্য্যন্তও ক্ষুধায় কাতর হয়েন নাই। উৎসাহ যাই পথ দেখাইতে লাগিল, অমনি অজ্ঞাত পথে চলিতে লাগিলেন। দুইএকটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও, পথের কথা জিজ্ঞাসা করেন না, তাহার কারণ কোন্ পথের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন? শরৎচন্দ্র একবার ভাবিলেন, 'কলিকাতায় যাই, তার পর যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইব। কলিকাতায় অবিনাশচন্দ্র আছেন, আর অন্যান্য আত্মীয়গণ আছেন, এ কথা যথন মনে পড়িতে লাগিল, তখন আবার ভাবিতে লাগিলেন, না—সেখানে যাইব না। এই প্রকার একটী ভাবিয়া ঠিক করেন, আবার সেটীকে খণ্ডন করেন। চঞ্চল মন কোন বিষয়েই সহজে নিবিষ্ট হইতে চাহেনা।

যথন বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, তখন আবার নীরদার কথা শরৎচন্দ্রের মনে পড়িল। ভাবিলেন, অসহায়া নীরদা এইক্ষণ কি করিতেছে? নীরদাকে দেখিতে একান্ত ইচ্ছা হইল, আবার ফিরিলেন, ফিরিয়া কতকদূর আসিলেন, আবার যেন কি ভাবিয়া অন্যদিকে চলিলেন। একবার বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখিবার কথা ভাবিলেন। ভাবিলেন, সহসা বিন্দুর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলে, বিন্দু আকাশের চাঁদ হাতে পাইবে, কত আনন্দিত হইবে। বিন্দুর আনন্দের কথা শরৎচন্দ্রের মনে স্থান পাইল না, অন্যদিকে চলিলেন। একবার নদীতীর পর্য্যন্ত আসিয়া আবার ফিরিয়া একটী গ্রামের নিকট গেলেন, আবার সে স্থান হইতে নদীর তীরে আসিলেন। আবার

সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অগ্রসর হইতে হইতে গ্রাম দৃষ্টের অতীত হইল। একদিকে সূর্য্যের প্রখর তাপে শরীর উত্তপ্ত, ক্ষুধায় পাকস্থলী ক্লিষ্ট, —ত্রিবিধ জলীয় পদার্থ পাকস্থলীর দ্বারদেশে আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল; হৃদয় যন্ত্রের বলক্ষয় হইতে লাগিল, রক্তবাহিকা প্রণালীর রক্ত ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল; অন্যদিকে নানা প্রকার চিন্তায় মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান। নদীস্রোত রব করিতেছে, পথ উষ্ণ, বালুকণা বায়ুভরে উড়িয়া শরৎচন্দ্রের নেত্রে আঘাত করিতেছে। শরৎচন্দ্র ক্লান্ত হইলেন, ক্ষুধায় অস্থির হইলেন; কিন্তু অন্যমনস্ক হইয়া ক্রমান্বয়ে চলিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান অবস্থা মন হইতে চলিয়া গেল। এই প্রকারে কতদূর যাইতে যাইতে যে স্থানে নদী বক্রভাবে অন্য দিকে গিয়াছে, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একখানি খণ্ড মৃত্তিকার উপর দিয়া এবারে যাইতে হইল। মৃত্তিকা খণ্ডের নিম্নে তরঙ্গ আসিয়া প্রহত হইতেছিল; শরৎচন্দ্র যাই সেই মৃত্তিকা খণ্ড হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অন্য মৃত্তিকার আশ্রয় লইবেন, এমন সময়ে সেই মৃত্তিকা খণ্ড ভগ্ন হইয়া নদীগর্ভে নিপতিত হইল, শরৎচন্দ্রও তৎসঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িলেন। বলা বাহুল্য যে, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও শরৎচন্দ্র কূলে উঠিতে সমর্থ হইলেন না। তীরস্থ মৃত্তিকারাশি লম্বভাবে যে স্থানে জল স্পর্শ করিয়াছে, সে স্থানে অগাধ সলিল, শরৎচন্দ্র একবার ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিলেন, প্রবল স্রোত তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

ঐইসময়ে একখানি নৌকা বহিয়া যাইতেছিল; বাহকেরা দেখিয়া নৌকা সজোরে বহিয়া আসিয়া জলমগ্নোন্মুখ শরৎচন্দ্রকে তুলিয়া নৌকায় উঠাইল। সেই সময়ে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুধার পর, অতিরিক্ত জলপানে, অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন; নৌকার বিষয় তিনি কিছুই জানিলেন না।

সেইস্থানে নদীর ত্রিমুখ। নৌকার আরোহীরা সকলে নিদ্রিত, কেবল দাঁড়ীরা দাড় বহিতেছিল, আবার একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান তাহাদিগকে তাড়না করিয়া নৌকা চালাইতেছিল। শরৎচন্দ্রকে নৌকায় উঠান হইলে বাহকেরা ভয়ে ভয়ে তরী চালাইয়া নদী পার হইয়া আর একটী ক্ষুদ্র নদীর আশ্রয় লইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা শরৎচন্দ্রকে মৃতপ্রায় দেখিয়া নদীর তীরে রাখিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তাহারা তাহাকে লইয়া চলিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জগদীশ বাবু।

ঢাকা নিবাসী জগদীশ চট্টোপাধ্যায় পাটনায় ৪০০ টাকা বেতনের একটী চাকুরি করিতেন। তিনি অত্যন্ত ভীরু। নদীপথে চলিতে তিনি অত্যন্ত ভয় পাইতেন। কলিকাতায় তাহার একটী বাড়ী ছিল, শারদীয় পূজার সময় সেই বাড়ীই বিলাস-গৃহ হইত। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে তাঁহার পিতার মৃত্যুপলক্ষে তিনি স্বদেশে আসিয়াছিলেন। পাটনা হইতে আসিবার সময় তাঁহার সহিত ৪ জন হিন্দুস্থানী দ্বারবান আসিয়াছিল; দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার মধ্যে ৩ জনের ঢাকাতে মৃত্যু হয়। কার্য্য স্থানে যাইবার সময় স্বদেশ হইতে ৮ জন দেশীয় সর্দ্দার লইয়া কলিকাতায় যাইতেছিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ কখনও কলিকাতায় থাকিতেন, কখনও বা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন।

যে নৌকার দাঁড়ীরা শরৎচন্দ্রকে নৌকায় তুলিয়া লইল, এ সেই জগদীশ বাবুর নৌকা। জগদীশ বাবু সপরিবারে কলিকাতায় যাইতেছিলেন। যে সময়ে শরৎচন্দ্রকে নৌকায় তুলিয়া লওয়া হয়, সে সময়ে তিনি নিদ্রিত ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, উঠিয়া দেখিলেন, একটী অপরিচিত লোক নৌকায় শয়িত, তাহার মুখ হইতে জলের ফেণার ন্যায় কি যেন বাহির হইতেছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি সবিস্ময়ে দাঁড়ীদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন পর তাহারা অপরিচিত ব্যক্তিকে যে অবস্থায় পাইয়াছিল, তাহা সমুদয় বলিল। জগদীশ বাবু একটু আহ্লাদিত হইয়া দাড়ীদিগকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদান করিলেন।

জগদীশ বাবু স্বয়ং অপরিচিত শরৎচন্দ্রের সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার মনে একটু একটু ভাবনা হইতে লাগিল। অপরিচিত অবস্থায় লোকটীকে আমরা লইয়া চলিয়াছি; এ ব্যক্তি কোথায় যাইবে, তাহা আমরা জানি না; এই সকল বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, জীবনরক্ষা পাইলে যেখানেই থাকুক তাহাতে ক্ষতি কি? এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে আর নৌকা রাখিতে বলিলেন না, দাঁড়ীরা যদৃচ্ছাক্রমে নৌকা বহিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে শরৎচন্দ্রের চেতনা হইতে লাগিল। উদরস্থ জল, কতক মুখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল, কতক প্রস্রাব দ্বার দ্বারা নির্গত হইল। শরৎচন্দ্র চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, তাঁহার পার্শ্বে একটী অপরিচিত ভদ্র লোক উপবিষ্ট। শরৎচন্দ্র কথা বলিলেন না; তাহার চক্ষু আবার মুদ্রিত হইল। আবার ক্ষণকাল পরে চৈতন্য হইলে সম্মুখস্থ অপরিচিত জগদীশ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মহাশয় আপনি যিনিই হউন, আমাকে ক্ষমা করিবেন; ক্ষুধায় আমার শরীর অবসন্ন হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিছু আহার করিতে দিন।

জগদীশবাবুর নৌকায় আহারীয় দ্রব্যাদির অপ্রতুল ছিল না; তিনি স্বয়ং নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আনিয়া শরৎচন্দ্রের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। এই প্রকারে শরৎচন্দ্র একটু সুস্থ হইলে পর জগদীশবাবু সকল বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সমস্ত ঘটনা বলিয়া বলিলেন, মহাশয় আপনার নিকট আমি জীবন পাইয়াছি, আপনার এঋণে আমি চিরকালের তরে আবদ্ধ। সংপ্রতি আপনি কলিকাতায় যাইতেছেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আপনার সহিত লইয়া গেলে আমি বড় উপকৃত হই।

জগদীশবাবু।—আপনি যখন বলিয়াছেন যে আমি কলিকাতায় থাকি, তখনই আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম, আপনাকে আমার সহিত যাইতে অনুরোধ করিব। আপনি আমার সহিত যাইতে স্বীকৃত আছেন, ইহাতে আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম।

আলাপ পরিচয়ে জগদীশবাবুর সহিত প্রথম দিনেই শরৎচন্দ্রের হৃদ্যতা জন্মিল। জগদীশ বাবুর জীবনের ঘটনা সকলই শরৎচন্দ্রকে খুলিয়া বলিলেন। শরৎচন্দ্রও অতীত ঘটনা সকল বলিলেন। ভাবীপরিণামের অন্ধকারময় অংশ গোপন করিলেন। জগদীশবাবু শরৎচন্দ্রের তরবারি শিক্ষার কথা শুনিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন।

আমরা এই সময়ে বলিয়া রাখি, জগদীশবাবুর একমাত্র স্ত্রী ছিল, তাঁহার নাম মালতী। মালতী দেবীর গর্ভাবস্থা ছিল, তাঁহার পরিচারিকার নাম দিনমণি। জগদীশবাবু যে নৌকায় যাইতেছিলেন, সে নৌকার মাজীর নাম বকাউল্লা, জাতিতে মুসলমান। বকাউল্লার বয়স আনুমানিক ৫৫ বৎসর হইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দস্যুর হস্তে।

সে দিন গেল। রজনীযোগে শরৎচন্দ্রের সহিত জগদীশ বাবুর যে সকল আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, তাহা আমরা বিবৃত করিব না; তবে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি, জগদীশ বাবু অবিনাশচন্দ্রের মাতুলের একজন বন্ধু, সুতরাং শরৎচন্দ্রের একজন বিশেষ আত্মীয়।

তার পর দিন নৌকা চলিল। মাজীদের মন প্রফুল্ল, নৌকা তীরের ন্যায় ছুটিল। বেলা অগ্রসর হইতে লাগিল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস বাড়িল। জগদীশ বাবুর নৌকা যে দিকে যাইতেছিল, পবন সে দিকের অনুকূল, মাজীরা পাল তুলিয়া দিল, নৌকা পবনের বেগ বক্ষে ধারণ করিয়া উড়িয়া চলিল। জলের তরঙ্গ জলে মিশিতে লাগিল, নৌকা তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিতে লাগিল। জগদীশ বাবুর আহারাদি ক্রিয়া প্রায়ই নৌকায় সম্পন্ন হইত; যথা সময়ে আহারাদি সম্পন্ন হইয়া গেল। আহারান্তে জগদীশ বাবু নিদ্রাভিভূত হইলেন, শরৎচন্দ্র বসিয়া জীবনের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

বেলা অবসান হইতে না হইতে নৌকা আসিয়া একস্থানে লাগিল। আকাশে একটু একটু মেঘ উড়িয়া বেড়াইতেছিল, সে সকল ক্রমে ক্রমে একত্রিত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিতে লাগিল। সামান্য একখানি মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে আবৃত করিল। বৈশাখ মাস, সূর্য্য লম্বভাবে পশ্চিম গগনে পাতলা মেঘে আবৃত। সূর্য্যের রশ্মি পূর্ব্ব দিকে ক্ষীণ হইতেছিল। পূর্ব্ব-দিকে মেঘ, পশ্চিমগগনে মেঘ নাই, পশ্চিমের অর্দ্ধ-পৃথিবী হাস্যময়ী। সূর্য্যের মেঘাবৃত ক্ষীণরশ্মি জলের উপরে বিদ্যুতের ন্যায় চক্ মক্ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল, সেই চক্‌মকে বায়ু হিল্লোলোৎপন্ন জল হিল্লোল আহত হইতেছিল। কোথাও বা বহুদূর-বিস্তীর্ণ মেঘমালার ঘনীভূত ছায়া সলিলোপরি কাল মেঘ সদৃশ শোভা পাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তমিত হইলেন। নৌকার মাজীরা নৌকা বাঁধিল। একবার সকলে তীরে উঠিয়া আবার নৌকায় ফিরিয়া আসিল। ক্ষণকাল পরে

নৌকার নিকটে সহসা অনেক লোক আসিয়া আবার ফিরিয়া গেল। শরৎচন্দ্র নৌকায় উপবিষ্ট, ভালমন্দ কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

সূর্য্য অস্তমিত হইল। নদীর রূপ পরিবর্ত্তিত হইল। সহসা অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীর উপর বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে তরঙ্গ উত্থিত হইল। তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে আরো তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। সেই তরঙ্গ সমূহ পরস্পর প্রহত হইতে হইতে আসিয়া তীরে শেষ হইতে লাগিল, নৌকাখানি সেই তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হইতে লাগিল। নৌকার আন্দোলনে জগদীশ বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। শরৎচন্দ্রকে মৌনভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, শরৎ! তুমি কি ভাবিতেছ?

শরৎচন্দ্রের অনুরোধে জগদীশবাবু 'তুমি' সম্বোধন করিতেন।

শরৎচন্দ্রের মন নানা চিন্তায় বিলোড়িত। দহ্যমানজ্বরে পীড়িত লোকের ন্যায় শরৎচন্দ্র উপবিষ্ট হইয়াই নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। জগদীশ বাবুর কথায় সহসা চমকিয়া হইয়া বলিলেন, অদ্য কি এই স্থানেই নৌকা থাকিবে? এই কথা ভাবিতেছিলাম।

জগদীশ বাবু অত্যন্ত ভীত লোক, বলিলেন 'এ কোন স্থান?

শরৎচন্দ্র যে স্থানের নাম করিলেন, তাহা শুনিয়া জগদীশ বাবু অত্যন্ত ভীত হইয়া মহাবিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহারা দুইজনে নৌকার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, আর একখানিও নৌকা নাই, চতুর্দ্দিকেই নদীর গভীর নীল জল রাশি কলকল রবে ধাইতেছে; সম্মুখে নদীর ত্রিমুখ—ভয়ানক স্থান।

জগদীশ বাবু মাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মাজি! এ স্থলে নৌকা রাখিয়াছ কেন?

মাজী।—আজ্ঞা, আকাশে মেঘ, সম্মুখে বড় নদী, আপনি ঘুমায়ে ছিলেন, আপনার হুকুম পাইলে এখন নৌকা ছাড়িয়া দেই।

জগদীশ বাবু একটু বিস্মিত হইলেন। মাজীর কথায় তাহার সন্দেহ একটু কমিয়া আসিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র বলিলেন, 'যখন নৌকা আসিয়াছিল তখন নৌকা ছাড়িয়া গেলে কোন আপত্তি ছিল না। এইক্ষণ নৌকা রাখিলেও যে ভয়, ছাড়িলেও তাই, সম্মুখে বড় নদী। আরো বুঝাইয়া বলিলেন, চক্রান্ত মাজীদের। জগদীশ বাবু মহা ভাবনায় পড়িলেন।

ধকাউল্লা মাঝি জগদীশ বাবুর উত্তর না পাইয়া ভাবিল, বাবুর সম্মতি হই-

য়াছে; সুতরাং নৌকা খুলিয়া দিল। ক্ষণকালের মধ্যে নৌকা ত্রিমুখের মধ্যস্থল অতিক্রম করিল। তিনটী নদীর সন্ধি স্থল, দুইটী নদীর জল সমভাবে বহিয়া তৃতীয় নদীর পানে যাইতেছিল, সেই নদী সাগরের সহিত মিলিয়াছে, সুতরাং এইক্ষণ ভাটা। ভাটায় এস্থলে কলিকাতার পথের উজান। নৌকা বিপরীত দিকে স্রোতের সহিত ভাসিয়া চলিল, মাঝীদের অভিসন্ধি মন্দ, তাহারা নৌকা ফিরাইল না।

আর নৌকা নাই। মেঘাচ্ছন্ন রজনী ঘোরতর অন্ধকারাবৃত, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে; শরৎচন্দ্র এবং জগদীশ বাবু বৃষ্টির পূর্ব্বেই ছইয়ের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সহসা একখানি নৌকা পাশ কাটিয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া গেল, শরৎচন্দ্র বলিলেন, নৌকা কোথায় যাইবে? কেহই উত্তর করিল না। শরৎচন্দ্রের মন সন্দেহে পূর্ণ, বর্ত্তমান ঘটনায় সেই সন্দেহ ভাবনায় পরিণত হইল, জগদীশ বাবুকে বলিলেন, 'আমাদের একাকী আসা ভাল হয় নাই।

জগদীশ বাবু ভীত মনে বলিলেন, 'তবে উপায়?

শরৎ।—উপায় ঈশ্বর! আপনি ভয় করিবেন না। বন্দুক কয়েকটা এবং তরবারি কয়েকখান বাহির করুন। এই বলিয়াই শরৎচন্দ্র মাজীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মাজি! আর নৌকা দেখা যায়? মাজী কিছুই উত্তর দিল না দেখিয়া শরৎচন্দ্র আর অপেক্ষা করিলেন না, তৎক্ষণাৎ একখানি তরবারি লইয়া ছইয়ের বাহিরে আসিলেন, বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, নদীর তীর ঘোর অরণ্যময়; এ পথে কখনও আসিয়াছেন, মনে পড়িল না। মাঝীকে বলিলেন,—মাজি, তুই কোথায় লইয়া চলিয়াছিস্? মাজী বলিল, "আল্লা আল্লা হো"। মাজীর এই ডাকের এক মুহূর্ত্ত পরেই শরৎচন্দ্র দেখিলেন, চতুর্দ্দিক হইতে আর না হইলেও আট নয় খানা নৌকা আসিয়া ঘেরিয়াছে, প্রত্যেক নৌকায় ছয় সাত জন লোক, নৌকা গুলি নিকটে আসিলেই সকলে মিলিয়া ডাক ছাড়িল—'আল্লা আল্লা হো।'

আর সময় নাই। শরৎচন্দ্র চিন্তা করিবার সময় পাইলেন না; সর্দ্দারদিগকে বন্দুক বাহির করিয়া আনিতে বলিয়াই, স্বীয় অসি নিষ্কাষিত করিয়া মাজীদিগকে এই দুঃখ পূর্ণ সংসার হইতে বিদায় দিতে লাগিলেন। তরবারি পরিচালনের সময় ফুরাইল, চতুর্দ্দিক হইতে লাঠির আঘাত আসিয়া নৌকায় প্রহৃত হইতে লাগিল; শরৎচন্দ্র বন্দুক লইয়া স্বীয় ক্ষমতায় নৌকা রক্ষা

করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সর্দ্দারেরা প্রথমে একবার চেষ্টা করিয়াই সকলে প্রাণের আশঙ্কায় পলায়ন করিল। একা শরৎচন্দ্র বীর পুরুষের ন্যায় প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন লোককে বাধা দিতে লাগিলেন। জগদীশবাবু ভয়ে জড়সড় হইয়া মালতী দেবীর অঞ্চল ধরিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অর্দ্ধদণ্ড পর্য্যন্ত এই ভাবেই গেল। দস্যুদিগের সম্বল একমাত্র লাঠী; শরৎচন্দ্র প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ দস্যু বিনাশ করিলেন; শরৎচন্দ্রের সাহায্যার্থে একটী লোক পশ্চাতে, সে হিন্দুস্থানী অনবরত শরৎচন্দ্রকে বন্দুকের সজ্জা করিয়া দিতে ছিল।

দস্যুদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল, কেহ বলিতে লাগিল, আর কাজ নাই, পলায়ন করি। কেহ দম্ভ করিয়া শেষ চেষ্টা করি বলিয়া লম্ফপ্রদান করত জগদীশ বাবুর নৌকায় উঠিয়া সেই হিন্দুস্থানীর মস্তকে আঘাত করিল, সে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেল। শরৎচন্দ্রও হস্ত প্রসারণ করিয়া যাই অন্য সজ্জিত বন্দুক গ্রহণ করিবেন, এমন সময়ে তাহাকে জলে ঠেলিয়া ফেলিল। শরৎচন্দ্র আত্ম রক্ষা করিতে পারিলেন না; দস্যুরা উচ্চৈঃস্বরে আবার 'আল্লা আল্লা হো,' করিয়া উঠিল। কণ্টক পরিষ্কার হইল, দস্যুরা একে একে জগদীশ বাবুর নৌকায় উঠিয়া লুট্পাট করিতে লাগিল। জগদীশ বাবু ও মালতী যে কামরায়, সে ঘরের দরজা বন্ধ।

দস্যুরা যথেচ্ছায় নৌকার সকল দ্রব্য অপহরণ করিতে লাগিল; তাহাদিগের বৃথা চিৎকার এবং পদভরে নৌকা কম্পিত।

মালতী দেবী জগদীশবাবুর কর ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—নাথ! আর যে উপায় দেখি না; কি করিব, কি হইবে? আর বিলম্ব নাই? ওমা, এই যে এই দিক পানেই আসিতেছে!

জগদীশবাবুর শরীর কম্পিত, উত্তেজিত; সকরুণস্বরে বলিলেন, আমি থাকিতে তোমার ভয় কি?

দিনী একটী জানালার খড়্খড়ী খুলিয়া দেখিতেছিল; সহসা দস্যুদিগকে ঘরের দিকে আসিতে দেখিয়া বলিল, বাবু! এই যে! এখন উপায়? জগদীশবাবু ইহা শুনিয়া হতচেতন হইলেন। দিনী দুইখানি ছুরিকা মালতী দেবীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল—'ধর—আর দেখিস্ কি? শুধু কাঁদলে কি হবে?'

দস্যুরা দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন

বলিল—'এই জগদীশবাবু'। দিনী চিনিল, সে নৌকার একজন মাল্লা।

জগদীশ বাবু নানা প্রকার মিনতি করিতে লাগিলেন, বলিলেন, তোমরা নৌকার সমস্ত লইয়া যাও, ইচ্ছা হয় আমাকে বধ কর, কিন্তু মালতীকে কিছু বলিও না। দস্যুরা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জগদীশবাবুর হস্তপদ দৃঢ়তর রূপে বন্ধন করিয়া প্রহার করিতে করিতে অন্য ঘরে লইয়া গেল। কতকগুলি দস্যু মালতীদেবীকে আক্রমন করিতে অগ্রসর হইল।

দিনীর হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরকা ছিল, বলিল;—তোদের সাহস থাকে আমার নিকটে আয়, নচেৎ এ ঘর হইতে দূর হ।

একজন দস্যু সাহস করিয়া দিনীর নিকটে আসিল, কিন্তু আসিয়াই বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় দংশিত হইয়া সরিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে আর কতকগুলি দস্যু আবার সেই ঘরে ফিরিয়া আসিল। দিনী দেখিতেছিল, জগদীশবাবুকে কোথায় লইয়া যায়। এ দিকে তাহারা মালতীদেবীকে গৃহ হইতে টানিয়া লইয়া গেল।

দিনী ফিরিয়া আসিয়া আর মালতীকে দেখিতে পাইল না। নৌকার বাহিরে যাইয়া দেখিল, দস্যুরা মালতীকে লইয়া পলায়ন করিতেছে; দেখিয়া মন দগ্ধ হইতে লাগিল।

যেখানে দিনী দাঁড়াইয়া ছিল, সেই খানেই জগদীশ বাবু আবদ্ধ। জগদীশ বাবু দিনীকে বলিলেন—দিনি, আমার হাতের বন্ধন খুলিয়া দে। দিনী তাহাই করিল। জগদীশবাবু উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শক্তি হইল না। দিনী সেই খানে বসিয়া রহিল। জগদীশ বাবু নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিলেন।

দিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিল;—মালতী না থাকিলে আমি থাকিয়া কি করিব? এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল, নৌকা তীরে সংলগ্ন, আর বিলম্ব না করিয়া দিনী নৌকা হইতে মালতীর উদ্দেশে সরিয়া পড়িল।

আর লোক নাই, জগদীশ বাবু একা। জোয়ার আসিলে নৌকা ভাসিতে ভাসিতে উত্তরদিকে চলিল।

তার পরদিন যেখানে নৌকা ভাসিতে ভাসিতে যাইয়া লাগিল, সেটী ভদ্রলোকের আবাসস্থান। সেখানে বর্ত্তমান সময়ে একটী মহকুমা স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় প্রহরাতীত বেলার সময়ে গ্রাম হইতে কয়েক জন ভদ্রলোক

আসিয়া জগদীশবাবুকে উপরে তুলিয়া লইল। জগদীশবাবু সেই খানে আসিয়া, মালতী দেবী এবং শরৎচন্দ্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই গ্রামের লোকেরা জগদীশবাবুকে মোকর্দ্দমা করিতে বলিল। মোকর্দ্দমায় দস্যুদিগের উপযুক্ত শাস্তি হইল, কিন্তু মালতী এবং শরৎচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেল না। একমাস পরে জগদীশবাবু অন্য এক খানি নৌকা ভাড়া করিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন। কলিকাতায় যাইয়া শরৎচন্দ্রকে অনুসন্ধান করিবার সময় হইল না, অবিলম্বে রাণীগঞ্জের ট্রেনে পাটনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে শরৎচন্দ্র জলমগ্ন হইয়া ক্ষণকাল সন্তরণের পর একটু আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নদীর তীর অরণ্যময়, সে রজনী সেই খানেই অবস্থিতি করেন। তার পরদিন কতকগুলি কাঠরিয়ার সহিত অরণ্যের মধ্যে একটী আশ্রয়ে গমন করেন। আর সঙ্গতি না পাওয়ায় সেই খানেই কতকদিন অবস্থিতি করেন। সময়ক্রমে যখন কাঠরিয়াদিগের কাষ্ঠ কাটা সমাপ্ত হইল, তখন তিনি তাহাদিগের নৌকায় উঠিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, প্রায় দুই মাস পর্য্যন্ত জগদীশবাবুর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

মালতী দেবী এবং দিনীর কি হইল, সে ঘটনা পরে বিবৃত হইবে। অগ্রে আমরা বিন্ধ্যবাসিনীর কথা বলিব।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যাহার বেদনা সেই বুঝে।

সংসারে সুখ কোথায়? অর্থকে সংসারের অনেক লোক সুখের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু যাঁহার অর্থ আছে, তাঁহার মনে প্রবেশ করিবার যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তবে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তাঁহার মত অসুখী জীব আর নাই। তবে সুখ কোথায়? নির্ধনের মনে সুখ

নাই, কারণ তাহার অর্থ নাই; আবার ধনীর সুখ নাই, কারণ ধনের তৃষ্ণা প্রজ্জ্বলিত হুতাশন সদৃশ অনবরত জ্বলিতে থাকে, কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। তবে সুখ কোথায়? নীরদার সুখ নাই, তাহার পতি নাই; বিন্ধ্যবাসিনীর পতি আছে, কিন্তু সুখ কোথায়? বিন্দুর সুখ—শরৎচন্দ্র, সুতরাং শরৎচন্দ্রের অদর্শনে বিন্দুর কষ্ট। গ্রন্থকার বলেন, যাহার মনে সুখ নাই, এ পৃথিবী তাহার নিকট দুঃখের আলয়!!

আশাই মানবের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন। যাহার আশা নাই, সে জীবন শূন্য; শরীর ধারণ তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, সে প্রাণ থাকিতে মৃত। ঐ যে পুত্র শোকে কাতরা বৃদ্ধ-রমণী আহোরাত্র ধূলায় লুণ্ঠিতা, ক্ষমতা থাকিলে যাইয়া দেখ, উহাকেও আশা স্বপ্ন দেখাইতেছে। বিন্ধ্যবাসিনী, শরৎচন্দ্রের পত্র পাইয়া দিবানিশি অশ্রু মুছিতেছেন, মনে মনে ভাবিতেছেন, সুখ নাই; কিন্তু ঐ যে আবার ক্ষণে ক্ষণে ভাবান্তর দেখিতেছ, উহা কি জান? উহাই আশার স্বপ্ন। শরৎচন্দ্রের পত্রে বিন্ধ্যবাসিনীর আশালতা বিলোড়িত হইয়াছিল মাত্র, একেবারে মূলে ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু যখন শরৎচন্দ্রের দেশ-ত্যাগের বার্ত্তা বিন্দুর কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন বিন্দুর কি আশা ছিল?

স্ত্রীলোকের নিকটে শুনিয়াছি—'স্ত্রী জাতির যদি কিছু সুখ থাকে, সে সুখ যৌবনে স্বামী সহবাস'। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, বাঙ্গালার স্ত্রীলোকের ভাগ্যে সুখ নাই। বাঙ্গালায় বাল্য বিবাহ প্রচলিত, যাহারা দুগ্ধপোষ্য বালিকাগণকে বিবাহ করে, তাহারা স্কুলের ছাত্র; বালিকাগণের যৌবন অতিবাহিত না হইলে আর বালকগণের পাঠ্যাবস্থা শেষ হয় না। পাঠ্যাবস্থায় যাঁহারা স্ত্রীকে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত হয়েন, তাঁহারা স্ত্রীলোকের নিকট প্রশংসা পাইলে পাইতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে সমাজের অনিষ্টকারী বলিয়া নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত নহি। আর যাঁহারা তাহা না করেন, তাঁহারা স্ত্রীর অভিশাপে পরজীবনে দাসত্ব ব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়েন। সংক্ষেপে পাঠ্যাবস্থার বিবাহের ন্যায় অন্যায় কার্য্য আর পৃথিবীতে নাই।

বিন্ধ্যবাসিনীর এমন সাধের যৌবনফুল, যাহা জীবনে একবার ভিন্ন আর ফুটে না, অস্পৃশ্য ভাবে মলিন হইল; ভ্রমর গুঞ্জরিল না, মধুকর মধু পান করিল না, বিন্ধ্যবাসিনীর যৌবনফুল ফুটিয়াও সুখ দিল না। বিন্ধ্যবাসি-

নীর যৌবন মলিন হইয়া আসিল, কিন্তু আশা ত মলিন হয় না, আশার চিরদিনই নবজীবন; আশা ত বিন্দুকে যৌবনহীন বলে না। বিন্দু দিন গণে, মাস গণে, বৎসর গণে, ভাবে আর বিলম্ব নাই; শরতের চাকুরি হইলেই কষ্ট যাইবে। বিন্ধ্যবাসিনী শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেন না, কত দিনে পড়া শেষ হইবে। শরৎচন্দ্র বৎসরের মধ্যে একবারের অধিক বাড়ী আসিতেন না, তাহাও সকল বৎসর নহে; আবার সকল বারই বিন্ধ্যবাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইত না। যে বারে হইত, সেবারেও চারি পাঁচ দিনের অধিক নয়। সমস্ত যৌবন এই প্রকারে গত হইয়াছে; বিন্দুর কষ্ট কি, তাহা বিন্দুই জানে।

সৌন্দর্য্য যৌবনের সহচর। তুমি চেষ্টা কর আর না কর, প্রণয়িনীকে প্রেম ডোরে বাঁধিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা তোমার যৌবনে বিকশিত হইবেই হইবে। এই জন্যই অনেকে বলিয়া থাকেন, আদান প্রদান জীবনের সুখ। আমার মন তোমাকে দিলাম, তোমার মন আমাকে দিলে; দুই জনে অকৃত্রিম ভালবাসায় আবদ্ধ হইলাম, তবে কি আমরা সুখী? ক্ষণেক অপেক্ষা কর, দেখিবে, বিচ্ছেদে এ মন-মিলন আবার ভাঙ্গিয়া যাইবে; আর ইচ্ছা করিয়াও তোমার মন গ্রহণ করিতে পারিব না। সেই জন্যই প্রণয়িনীর বিলাপধ্বনি অনবরত স্বর্গের বায়ুকে উষ্ণ করিতেছে; যুবক, যুবতীর বিচ্ছেদানলে সংসার পুড়িয়া ছার খার হইতেছে। আমরা বলি, যাঁহারা আদানের আশা ছাড়িয়া প্রদান করিতে পারেন, সংসারে যদি সুখ ঘটনীয় হয়, তবে সে সুখ তাঁহাদের। তুমি আমাকে মন দেও আর না দেও, আমার মন তোমাকে দান করিলাম, ইহাতে যদি সুখ না থাকে, তবে সংসারে আর সুখ নাই।

পুরাকাল হইতে এই ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রবই শুনিয়া আসিতেছি, বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। ইহার কারণ কি? যে প্রণয় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রণয় দেখে, সে প্রণয় প্রগাঢ় নহে, যে প্রণয়ে অতলস্পর্শ বারিধির ন্যায় গভীরতা নাই, যে প্রণয়ে অল্প বাতাসে তরঙ্গ উঠে, সে প্রণয় বঙ্গদেশ হইতে তিরোহিত হইলেও দেশের অমঙ্গল নাই।

যে কথা বলিতেছিলাম,—লোকের সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যের আবশ্যক কেন, তাহা আমরা এইক্ষণ বলিব না। বলিবনা, কিন্তু জানি আধুনিক বঙ্গে প্রণয়ের মূলে সৌন্দর্য্য চাই। অনেক সময়েই দেখিতে পাই, বৃদ্ধদম্পতি-

গণের এই বাঞ্ছিত সৌন্দর্য্যের অভাব হইলে তাঁহারা কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া এক প্রকার পশুর ন্যায় সংসারে ভ্রমণ করেন। কিন্তু কেবল রমণীগণই কি সৌন্দর্য্যপ্রিয়? না—তাহা নহে। তবে এ সব কথা বলি কেন? আমাদের মনে পড়ে বিন্ধ্যবাসিনীর সৌন্দর্য্য! যাঁহার ইচ্ছা হয়; একবার বিন্দুর দিকে চাহিয়া দেখুন।

যে দিন শরৎচন্দ্রের পলায়নের বার্ত্তা বিন্দুর শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিল, সেই দিন হইতে তাহার ভাবান্তর উপস্থিত। রমণীকুলের চিরশোভা, চিক্কণ কবরীপুঞ্জ আলুলায়িত হইয়া সমস্ত পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, মস্তকে তৈল নাই, কপালে সিন্দুর ফোঁটা নাই, ইচ্ছা করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী আর তাম্বুল দ্বারা অধর রঞ্জিত করেন না। যাহা ইচ্ছা তাঁহাই করেন, কাহারও কথা শুনেন না। ইচ্ছা হইলে আহার করেন, নচেৎ উপবাসী। শরীর ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতে লাগিল; তাহার সহিত বলও ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইল। বিন্দুর পিতা মাতা তাহাকে কত বুঝাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের কথা বিন্দুর কর্কশ বোধ হয়, তাহা শুনেন না। সরলা বিন্ধ্যবাসিনী এইক্ষণ কপট ভাব ধারণ করিয়াছেন,—কাহারও নিকট মনের কথা খুলিয়া বলেন না, অনবরত চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। চিন্তা করিতে করিতে মস্তিষ্ক উষ্ণ হইল; উন্মত্ত অবস্থার পূর্ব্ব লক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই প্রকারে ছয় সাত দিন গত হইল।

একদিন অপরাহ্নে বিন্ধ্যবাসিনী একাকিনী নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতেছিলেন;—'জল তুই চুপ করিয়া থাকিস্ কেন? আমার ছবি তুই চুরি করিয়াছিস; অতএব তোকে মারিব। মাথা কামড়ায় কেন, তা তুই কি জানিস? না জানিস না জানিস, আমি তোকে ভালবাসি,' ইত্যাদি কত অসংলগ্ন কথা বলিতেছিলেন; বিন্ধ্যবাসিনীর মাতা এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী সে স্থান হইতে ছুটিয়া একটী বনে প্রবেশ করিলেন, তাহার মাতা কুল-বধূ, পশ্চাৎগামিনী হইতে পারিলেন না।

বিন্ধ্যবাসিনীর সময়ে সময়ে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। যখন প্রকৃতিস্থ থাকেন, তখনই শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ে, আর মস্তিষ্ক ঘুরিতে থাকে, আর উন্মত্তের ন্যায় অস্থির হইয়া পড়েন। যখন বনে প্রবেশ করেন, তখন মনটা একটু ভাল ভাবে ছিল, ভাবিতে লাগিলেন, 'গৃহবাসে অনেক

যন্ত্রণা, না হইলে আমার এ প্রকার দশা হইবে কেন? সংসার বিষময়, না হইলে আমার হৃদয় অস্থির হয় কেন? আমার কি দুঃখ? ধনের কষ্ট নাই, মা বাপের অদৃশ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই, তত্রাচ আমার প্রাণ অস্থির। প্রাণ অস্থির হয় কার জন্য? শরৎচন্দ্র? নামটী কি মধুর! দূর হউক, তাহাকে কে চিনিত? শরৎচন্দ্র কাহার? আমার শরৎ। তবে আমার কষ্ট কি! 'শরৎকে কি আর দেখিব না?' শরৎচন্দ্রের প্রতিবিম্ব বিন্ধ্যবাসিনীর হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল, বিন্ধ্যবাসিনী অস্থির হইয়া, স্ত্রী-গৌরব কেশপুঞ্জকে ভূমি স্পর্শ করাইয়া নৈসর্গিক ব্যাপারে ভগ্নমান বৃক্ষের ন্যায় হঠাৎ ভূতলশায়িনী হইলেন।

শরৎচন্দ্রের কথা মন হইতে অপসৃত হইল; কাননের কথা মনে হইল। কাননের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভূপতিতা বিন্ধ্যবাসিনীর একটু নিদ্রাবেশ হইল। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন,- "তিনি যেন এক অপূর্ব্ব কাননে ভ্রমণ করিতেছেন; সেখানে নানা প্রকার বৃক্ষ, ফল এবং ফুলভরে অবনত হইয়া দর্শকমণ্ডলীর নয়ন মনকে তৃপ্ত করিতেছে। অনেক বৃক্ষে নানা প্রকার লতা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বিন্দুর যেন ভাবান্তর উপস্থিত হইল।"

দেখিলেন—"কত নব প্রস্ফুটিত, সুগন্ধযুক্ত পুষ্পাধারকে কণ্টকাবৃত দুর্গন্ধময় লতায় ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, বৃক্ষের অপূর্ব্ব শোভাকে স্বীয় তীক্ষ্ণ কণ্টকের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; বৃক্ষে এমন স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না, যে স্থান লতা-বেষ্টন-চিহ্ন হইতে রক্ষিত আছে। আবার কত সুন্দর লতা, যাহাকে একবার দেখিলে, যাহার ফুলের ঘ্রাণ একবার নাসিকায় প্রবিষ্ট হইলে, সংসার ছাড়িয়া তাহার আশ্রয়ে যাইতে অভিলাষ হয়, এমন কত লতিকাকে কত কদর্য্য বৃক্ষ, একেবারে রসহীন শুষ্কপ্রায় করিয়া ফেলিতেছে।"

আবার দেখিলেন—"সহসা যেন এ বন নিমেষ মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, আর একটী কানন দৃষ্টির সম্মুখে পড়িল। এ কাননে অনেক সুন্দর বৃক্ষ, বৃক্ষে ফুল আছে, শোভা আছে, ফল আছে; কিন্তু লতা নাই, কণ্টক নাই। কোন কোন বৃক্ষে দুই একটী পাখী নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিয়াছে; কোন কোন বৃক্ষে পাখী নানা স্বরে গান করিতেছে। বিন্ধ্যবাসিনী যেন দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, পক্ষীদিগের কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট পক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কুঞ্জবিহারি পাখী

সকল, তোমরা রব করিতেছ না কেন'? তাহারা যেন উত্তর করিল,—'আমরা পক্ষীজাতি, পরের ফলে আমরা উদর পূর্ণ করি; আমরা চেষ্টা করিনা, এইখানে বসিয়া থাকি, বৃক্ষ আমাদিগকে ফল যোগায়, আমরা আনন্দে আহার করি; স্থানান্তরে যাই নাই। অনেক দিন, আমরা এই ভাবে সুখে আছি; কিন্তু দিন কয়েক পর্য্যন্ত একটী রব উঠিয়াছে, এই সকল বৃক্ষে লতা বেষ্টন করিবে। তাই আমরা নিরানন্দে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিয়াছি।' বিন্ধ্যবাসিনী যেন কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'লতিকা বেষ্টন করিবে, তাহাতে তোমাদের নিরানন্দ কেন?' পক্ষিগণ যেন উত্তর করিল, 'বৃক্ষে লতিকা বেষ্টন করিলে, প্রায়ই ফলের মিষ্টতা অপহৃত হয়। সময়ে সময়ে উভয়ের মিলনে ভাল ফল হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই বিষময় ফল উৎপন্ন হয়; আমরা তাহা ভক্ষণ করিলে মরিয়া যাইব, তাই নিরানন্দ।'

দেখিতে দেখিতে একটী মনোহর বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল; বিন্দুর হৃদয়-সাগরের লীনতরঙ্গ সহসা উথলিয়া উঠিল—ভাবিলেন, আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, অনেক দূর ভ্রমণ করিয়াছি, তথাপি বিশ্রাম করি নাই। ভাবিতে ভাবিতে বিন্ধ্যবাসিনী সেই বৃক্ষ সন্নিধানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিতে লাগিল, শরীর শীতল হইল; সেই বৃক্ষের পরিপক্ক ফল আহার করিবার জন্য যেন তিনি অস্থির হইলেন। বিন্ধ্যবাসিনী আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না; অল্প সময়ের মধ্যেই ধর্ম্মভয় এবং সমাজের ভয় তিরোহিত হইল, সেই ফল পাড়িতে অভিলাষ জন্মিল।

ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না, বাহুবিস্তার পূর্ব্বক যেন বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য—পশ্চাৎ দিক হইতে অমনিই কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিল। বিন্ধ্যবাসিনীর মনে ভয় হইল, সহসা যেন অবতরণ করিলেন, ক্ষণকাল পরে শুনিলেন কে যেন বলিতেছে, 'বিন্দু! তুমি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে সংসার মায়ায় এবং সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া সংসারের বিষফল ভোজনে অভিলষিতা হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যাহা হউক জানিলাম, এসংসারারণ্যে সতী নারী অতি বিরল।'

বিন্ধ্যবাসিনীর বাক্য ফুটিল না, লজ্জিতা হইয়া অনিমেষ লোচনে, শব্দের উৎপত্তি স্থান লক্ষ্য করিয়া চাহিলেন—যাহা দেখিলেন, তাহা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। মনের মধ্যে একটী চিন্তা ছিল, সেই চিন্তার প্রতিবিম্ব

কল্পনায় উদিত হইল, দেখিলেন, শরৎচন্দ্র যেন দূরে পলায়ন করিতেছেন।' দেখিয়াই উন্মত্তের ন্যায় ধাবিতা হইলেন; বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহার মনে ছিল না, অরণ্য হইতে ছুটিয়া যাই লোকালয়ের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কতকগুলি স্ত্রীলোক আসিয়া বিন্দুকে ধরিল। বিন্ধ্যবাসিনী অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

তোমরা আমাকে ধরিলে কেন?

উত্তর হইল—কেন? তুমি দৌড়িয়া কোথায় যাইবে?

আমি পুড়িয়া মরিতে যাইব।

কোথায় পুড়িয়া মরিতে চলিয়াছ?

বহ্নিতে।

'বহ্নি কি আমরা বুঝি না। যদি আগুনে এই দেহ পোড়াইতে ইচ্ছা থাকে, তবে ঘরে চল, আগুন জ্বালিয়া দেওয়া যাইবে।'

'আমি যে বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাই, তাহা ঘরে নাই। ঘরে থাকিলে আমি কি দুঃখে ঘর ছাড়িব?'

তবে তোমার সে বহ্নি কোথায়?

সে রূপ-বহ্নি আমার হৃদয়ে।

তোমার হৃদয়ে, তবে পুড়িয়া মর না কেন?

আমিও এই বহ্নিতেই পুড়িয়া মরিতে চাই, কিন্তু মরিতে পারি না আমার একমাত্র দুঃখ এই, হৃদয়ে বহ্নি থাকিতেও পুড়িয়া মরিতে পারি না, সে বহ্নি আমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয় না। তোমরা আমাকে ধরিলে কেন? ছাড়িয়া দেও—আমি যাই—যাইবই যাইব।

'বিন্দু! তুমি কি উন্মত্ত হইলে। ছি ছি—তোমাকে দেশ শুদ্ধ লোকে নিন্দা করিতেছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না? চল, এইক্ষণ ঘরে চল।

বিন্ধ্যবাসিনী একটু লজ্জিত হইলেন! শরৎচন্দ্রের রূপ তাঁহার মন হইতে বিদায় হইল; বলিলেন চল, ঘরেই যাইতেছি। এই কথা বলিয়া বিন্ধ্যবাসিনী গৃহাভিমুখে চলিলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা সারি দিয়া যাইতে লাগিল।

মেয়ে-স্বভাব এই, দুই তিন জন একত্রিত হইলে আর তাহারা নিস্তব্ধ-ভাবে থাকিতে পারে না, কথায় কথায় তাহারা সামান্য ঘটনাকে বৃহৎ করিয়া তুলে। এই ঘটনার পর দেশময় রাষ্ট্র হইল যে, বিন্ধ্যবাসিনী উন্মত্ত

হইয়াছে। যাহার মনে যাহা আসিল, সে তাহাই বলিতে লাগিল। অনেকে বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখিতে আসিতে লাগিল।

এদিকে বিন্ধ্যবাসিনী ঘরে আসিয়া কতক্ষণ অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন, ক্ষণকাল পরে তাঁহার আবার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, পূর্ব্বে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই স্বপ্নের কথা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন; ভাবিতে ভাবিতে একটু তন্দ্রা আসিল; আবার স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নের কথা ভাল করিয়া হৃদয়ে ধারণা হইল না; হঠাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর মাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—বিন্দু—বিন্দু! তুমি একবারে অধৈর্য্য হইলে? ছি! তোমাকে সকলেই মন্দ বলিতেছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না?

আঁধার ঘরে দীপ জ্বলিয়া উঠিল, বিন্ধ্যবাসিনীর চেতনা হইল; মাসীকে সম্মুখে দেখিয়া একটু আহ্লাদ হইল; আবার সহসা সে আনন্দ নিরানন্দে মিশিল। বিন্ধ্যবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাকে যে বিষয় লিখিয়াছিলাম, তাহার কিছু সন্ধান পাইয়াছ?

মাসী।—না বিন্দু! আমি তোমার এই প্রকার অবস্থার কথা শুনিয়াই এখানে আসিয়াছি; তাঁহার কিছুই সন্ধান করিতে পারি নাই।

বিন্ধ্যবাসিনীর মাথা ঘুরিয়া গেল, আরো কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অভিলাষ ছিল, কিন্তু বাক্য ফুটিল না।

মাসী বলিলেন, বিন্দু ওরকম কর কেন, ও কি? বিন্ধ্যবাসিনী নিরুত্তর, তাঁহার মাসীর ক্রোড়ে পড়িয়া গেলেন; পড়িতে পড়িতে চক্ষু মুদ্রিত হইল, আবার দেখিলেন—"তিনি যেন একটী সুদীর্ঘ প্রান্তরের মধ্যে দিয়া যাইতেছেন। প্রান্তরের মধ্যস্থান অতি রমণীয়। সেই রমণীয় স্থানে তিনি যেন প্রথমে একটী মাত্র সুদীর্ঘ পথ দেখিতে পাইলেন। সেই পথ অবলম্বন করিয়া যাইতে যাইতে পথি মধ্যে একটী অপূর্ব্ব বিড়াল দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া তাঁহার মন ভুলিয়া গেল, তিনি বিড়ালটীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বিড়ালটী তাঁহার পোষ্য হইল, তাঁহার প্রিয় হইল। সেই পথের সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন, সেই ধারা-বাহী অবক্র পথ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। এই খানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কোন্ পথে যাইবেন, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া অবাক হইলেন। সেই বিড়ালটী তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল; তাই বিড়ালকে মনে মনে একটু একটু শ্রদ্ধা করিলেন। তিনি অন্য দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিতে-

ছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ বিড়ালটী অন্য এক পথে চলিয়া গেল, তাহা তিনি দেখিলেন না। ফিরিয়া বিড়ালটীকে না দেখিয়া বড়ই অস্থির হইয়া যাই পাশ ফিরিতে লাগিলেন, অমনি কর্ণে প্রবেশ করিল, 'বিন্দু! বিন্দু!' বিন্ধ্যবাসিনী বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। মাসী বলিতে লাগিল; 'বিন্দু! তুমি এত অল্প সময়ের মধ্যে অস্থির হইলে? তোমাদের মধ্যে যে প্রকার ভালবাসা, তাহাতে আমার বেশ বিশ্বাস আছে, শরৎচন্দ্র তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না।

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, মাসি! আমি তোমাকে সংক্ষেপে পত্র লিখিয়াছিলাম, 'এই পত্র দেখ' বলিয়া শরৎচন্দ্রের পত্রখানি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

মাসী পত্রখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন—'দেখ বিন্দু! তোমাকে উপদেশ দেই এমন আমার কিছুই ক্ষমতা নাই, তবে একবার তোমার নিকটে যাহা উপদেশ স্বরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই তোমাকে স্মরণ করিয়া দিতেছি। সংসার সমুদ্রে স্ত্রীলোকের ধৈর্য্য চাই, তাহা কি তুমি জাননা? স্থির ভাবে বসিয়া থাকিলে, তরী অনায়াসে বায়ু ভেদ করিয়া, তুফান কাটিয়া চলিয়া যাইবে। দেখ যখন পাল ছিড়িয়া যায়, তখন কি করা উচিত? পাল ছিঁড়িলে নৌকা আপনি নড়িয়া উঠে, তুফানে কাঁপিতে থাকে। যদি তুমি এই সময় ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির ভাবে থাকিতে পার, তাহা হইলে নৌকা অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু যদি চঞ্চল হও, জীবন তরী জলমগ্ন হইবে। তোমার এইক্ষণ পাল ছিঁড়িয়াছে, তুমি কি ধৈর্য্য ধরিবে না?'

বিন্দু।—মাসি! আমি বাঁচিব না, মরিব, এপ্রাণে আর কাজ কি?

মাসী।—'বিন্দু! তোমার কথা শুন্‌লে আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হয়। দেখ তোমার সমবয়স্কা কত মেয়ে বিধবা হইয়া চিরকালের মত সুখাশায় বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের বাঁচিয়া কি সুখ? সুখ নাই, তবুও তাহারা বাঁচিতেছে। তোমার কি? তোমার সুখের দিন এখনও আসিতে পারে। শরৎচন্দ্র বিদেশে গিয়াছেন, তাহাতে তোমারই শেষে সুখ হইবে। শরৎচন্দ্র বিচক্ষণ লোক; জানেন, স্ত্রীলোকের স্বভাব বড় মন্দ; বড় মায়া বাধাইতে পারে, তাই তোমাকে ছাড়িয়া বিদেশে গিয়াছেন; তাহাতে তুমি ব্যস্ত হও কেন?'

বিন্দু।—'মাসি! তুমি আমাকে যাহা যাহা বলিলে, তা সকলি বুঝি; কিন্তু এবার আমি কার্য্যে কিছুই করিতে পারি না, মানুষ আমাকে পাগল বলিতেছে, কিন্তু তাহা বুঝিয়াও সারিয়া চলিতে পারিতেছিনা। যখন আমার ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তখন আমি অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু স্থির ভাবে থাকিতে পারিনা। যখন অচৈতন্য হইয়া পড়ি, তখনই স্বপ্ন দেখি। মাসি! এবার আর আমার উপায় নাই!

মাসী।—'দেখ বিন্দু! দিন যাইতেছে ও যাইবে। তুমি কষ্ট পাইতেছ, তোমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু মানুষে তাহা বুঝিতেছে না। তাহারা কেহ তোমাকে পাগল বলিতেছে, কেহ বলিতেছে, তোমাকে ভূতে পাই-য়াছে। তুমি যে যন্ত্রণা সহ্য করিতেছ, এযন্ত্রণা সকল সতীরাই সহ্য করেন। বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সকলকেই সহ্য করিতে হয়; কিন্তু অনেকেই ধৈর্য্য ধরিয়া থাকেন। জোয়ারের পর ভাটা, ভাটার পর জোয়ার আসিবে, ইহা তাঁহারা জানেন, তাই সহ্য করেন। দুঃখ সহ্য না করিলে সুখ হয় না, ইহা জানি-য়াই তাঁহারা সকল প্রকার দুঃখ অম্লান বদনে মস্তকে বহন করেন। তাঁহারা জানেন, পিঞ্জরের পাখীর মনোদুঃখ এবং বেদনা কেহই বুঝিতে পারে না, তাই সহ্য করে। সহ্য করিবে না, তবে কি করিবে? অস্থির চিত্তকে লোকে পাগল বলে। দেখ, তুমি পিঞ্জরের পাখী, অস্থির হয়েছ, তোমার এত কষ্ট বোধ হইতেছে যে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছ না, কিন্তু লোকে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না, তাহারা তোমাকে পাগল বলিতেছে। তোমার কষ্ট তুমি ভিন্ন আর কে বুঝিতেছে? দিন যাইবে, কিন্তু দুর্নাম ঘুচিবে না; এমন স্থলে ধৈর্য্য ধরিবে না ত আর কি করিবে?'

বিন্ধ্যবাসিনীর মস্তক ঘুরিতে লাগিল, আবার অস্থির হইয়া পড়িলেন; মাসী তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন,—'একটী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তিনি যেন একটী পাখী পাইলেন, পাখিটী অতি সুন্দর। সেই পাখীর স্বর তাঁহার নিকট বড়ই মিষ্ট বোধ হইত। পাখিটীও তাঁহার কাছে কাছেই থাকিত। এই প্রকারে বৃক্ষের অনেক দূর উঠিলেন, এমন সময়ে ব্যাধ আসিয়া ফাঁদ পাতিল; বৃক্ষস্থ সকল পাখী উঠিয়া গেল; সেই সময় হইতে তাঁহার সেই সুন্দর পাখিটীও আর নয়ন গোচর হইল না।"

"পাখিটীকে দেখিতে না পাইয়া বিন্দু কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

মাসী বলিলেন, বিন্দু! ভয় পাইয়াছ?

বিন্ধ্যবাসিনীর চেতনা হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—এই দেখ মাসি, আবার স্বপ্ন দেখিলাম; আমার আর উপায় নাই। আমি স্বপ্নেও যাহা যাহা দেখি, জীবনেও তাই। আমার জীবনের শেষ সীমায় বিচ্ছেদানল জ্বলিতেছে, আবার স্বপ্নেও তাই। আমার আর উপায় নাই। আর সহ্য হয় না, আমি মরিব, জলে ডুবিব—স্রোতে ভাসিব, শরীর জুড়াইবে।

মাসী।—বিন্দু! আর কেন? লোকে তোমাকে ঘৃণা করে, পাগল বলে, ছি একটু ধৈর্য্য ধর না কেন?

বিন্দু।—ঘৃণা কি? যাহার ইচ্ছা সে ঘৃণা করুক। মানুষের কথায় আমার কি? আমার ঘৃণার ভয় নাই; না থাকিলেও মাসি, আমি আর এখানে থাকিব না। বাবা বড় বিরক্ত হয়েছেন; তাঁহাকে যে যা বলে, তিনি তাহাই বিশ্বাস করেন। মাসি! অন্যে যে যা বলে বলুক, বাবাও যখন আমাকে বলেন, তখন আমার আর সহ্য হয় না। মাসি! আমাকে বুঝাইলে কি হইবে? তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ, আমি, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমার মনের বেদনা আর কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। সহ্য করা উচিত, তা জানি, কিন্তু এখন সহ্য করিতে পারি না। আমার মন ধৈর্য্য ধরিতে চায় না। আমি কি করিব? তোমাকে বলিতেছি, তুমি আর কাহাকেও বলিও না; আমাকে বাধাও দিও না। আমি এবার পিঞ্জর ভাঙ্গিব, তুমি বলিবে তাহা হইলে আমাকে লোকে দুশ্চরিত্রা মনে ভাবিবে; ভাবে ভাবুক, লোকের কথায় আমার ভয় নাই। শরৎচন্দ্র আমাকে কখনই দোষী মনে করিবেন না, অন্যের কথায় আমার কি? তিনি বেশ জানেন, আমি তাঁহার চরণ ভিন্ন অন্য কিছু জানি না। আমাকে আর উপদেশ দিওনা। আমার মন যাহা চায়, তাহা না পাইলে সামান্য উপদেশে আমার কিছুই হইবে না। আমি নিশ্চয় পিঞ্জর ভাঙ্গিব।

মাসী বিন্দুর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, তবে আমাদের সহিত এই শেষ দেখা?

বিন্দু।—না মাসি! বাঁচিয়া থাকিলে আবারও দেখা হইবে।

মাসী।—আর কি বলিব! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

এই বলিয়া মাসী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।

বিন্ধ্যবাসিনীও সেই দিন বেদনায় অস্থির হইয়া তাঁহার পিত্রালয় ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণে পথে পথে।

যে রজনীতে বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহার পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সে রজনী সময়ানুসারে পোহাইল। পাখীরা ডাকিল। জলীয় বাষ্প জলের উপরে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল, শীতল বায়ু তাহাদিগকে লইয়া ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল, বৌ-কথা-কও পাখীরা ঘাটের ধারে বৃক্ষোপরি বসিয়া বিষাদে, ঘাটে উপবিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আর এক প্রকার পাখী, বিলাসপ্রিয় লোকদিগকে 'চোকগেল চোকগেল' বলিয়া সাবধান করিয়া দিতে লাগিল। যবনের খাড়ীর ঘরের পার্শ্বে, কংশের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কুক্কুট সকল 'কংসার সার সার' করিয়া মিনতি করিতে আরম্ভ করিল। পথিকেরা পথে চলিতে আরম্ভ করিল; বৃক্ষেরা দুঃখেব জলে তাহাদিগকে সিক্ত করিতে লাগিল। ফুলের বাগানে কুমারীগণ দেবার্চ্চনার জন্য ফুল তুলিয়া ডালা পূরিতে লাগিল, ফুলের গাছ ক্রোধে তাহাদিগের গায়ে জল ছড়াইয়া দিতে লাগিল। ফরসা হইল, গৃহ কোণের বৌরা বাসন মাজিতে ঘাটে চলিল। নব বিবাহিত বর লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া নববিরহিনীকে বিষাদ সাগরে ভাসাইয়া দ্রুতবেগে ছুটিল। দাসীরা হাঁড়ি হাতে করিয়া গোমাই ছড়া দিয়া পথের অপবিত্রতা দূর করিতে লাগিল। পুকুরের ধারে ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যের উপযোগী হইতে লাগিল। কৃষকেরা প্রাতঃ ভোজন লইয়া আহ্লাদে ক্ষেত্রাভিমুখে চলিল। রাখালেরা গরু ছাড়িল। গ্রাম্য জমিদার 'কাহার সর্ব্বনাশ করিবেন' এই কথা ভাবিতে ভাবিতে শয়নগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। গ্রাম জাগিল—নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র নদীর স্রোতে বুক দিয়া আস্তে আস্তে নৌকা সকল ভাসিয়া যাইতে লাগিল, মাঝীরা আমোদে সুন্দর টপ্‌পা গাইতে লাগিল। প্রভাত কাল, সকলেই

কার্য্যে তৎপর হইল, আর এদিকে বিন্ধ্যবাসিনীর কারাগার স্বরূপ শয়নগৃহ দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল।

আস্তে আস্তে সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইয়া তীক্ষ্ণতর দীপ্তিরাশি ঢালিতে লাগিলেন। বিন্দুর ঘরের দরজা আবদ্ধ, প্রথমে কেহই এঘরের দিকে চাহিয়া দেখে নাই। কতকগুলি স্ত্রীলোক বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখিতে আসিয়া গোলমাল করিতে আরম্ভ করিল, দরজা আবদ্ধ দেখিয়া যাহার মনে যা উঠিতে লাগিল, সে তাহাই বলিতে লাগিল। যাহারা লেখাপড়া জানিত, তাহারা আসিয়া দরজার গায়েব লেখা দেখিয়া বিস্মিত হইল।

বিন্ধ্যবাসিনী যখন ঘর হইতে বাহির হয়েন, তখন দরজার গায়ে এই পদটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

"ভাসানু জীবন তরী, দুঃখরূপ সাগরে।
পিতা মাতা, ভাই, বন্ধু, মনে রেখ আমারে॥"

ক্রমে ক্রমে বিন্ধ্যবাসিনীর আত্মীয় স্বজন আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা পড়িতে জানিত তাহারা পড়িয়া দেখিল, যাহারা পড়িতে জানিত না, তাহাবাও অন্যের নিকট শুনিল। কেহ কেহ দুঃখিত হইল, কেহ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেল, কেহ তামাসা দেখিতে পারিল না বলিয়া ক্ষুণ্ণচিত্ত হইল; আর কাহারও মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

হঠাৎ ক্রন্দনের ধ্বনি গগনভেদ করিয়া চতুর্দ্দিক ছড়াইয়া পড়িল।

মাতৃ-স্নেহ তুল্য জগতে আর অকৃত্রিম ভালবাসার দ্বিতীয় উদাহরণ নাই; ইহার নিকটে সকলি পরাস্ত; পৃথিবীর সকলেই এক জনকে পরিত্যাগ করিতে পাবে, এবং একজনের বিয়োগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে, কিন্তু মাতা পারেন না। সন্তান মূর্খ হউক, পাগল হউক, বুদ্ধি এবং জ্ঞানহীন হউক, কিম্বা পৃথিবীস্থ সকল প্রকার দোষে দূষিত হউক, মাতার নিকটে তাহাই আদরের। সংক্ষেপে পৃথিবীর সকলই মাতার নিকট সন্তানের কল্যাণের জন্য পরিহার্য্য। বিন্ধ্যবাসিনীর মাতার কর্ণে যখন তাঁহার পলায়ন-বার্ত্তা প্রবেশ করিল, তখন তিনি একেবারে অস্থির হইলেন। ক্ষণকাল স্থির ভাবে থাকিয়া, তারপর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রতিবাসিনীদিগের মধ্যে যাহারা তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়া ফিরিয়া গেল; আর কেহ কেহ আত্মীয়তা দেখাই-

বার জন্য বিন্ধ্যবাসিনীর মাতাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। বিবর্ণমনে কোন বালসহচরী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিন্দুর বিছানায় এক খানি পত্র দেখিতে পাইল এবং আগ্রাতিশয় সহকারে পত্র লইয়া শীঘ্রই গৃহ হইতে অপসৃত হইল। শিরনামায় নীরদার নাম। বাহিরে আসিয়া অগত্যা পত্র খানি খুলিল। পত্রখানি এই—

"আমি চলিলাম। পতি অনুসরণে যদি সুখ না পাই, তবে এদেহ পরিত্যাগ করিব। বাঁচিয়া কাজ কি? কার জন্য প্রাণ রাখিব?"

তোমারই—বিন্ধ্যবাসিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজনীতি কি?

এক মাস, দুই মাস, তিন মাস অতীত হইল শরৎচন্দ্র তবু জগদীশ বাবুর কোন সংবাদ পাইলেন না; আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই, শরৎচন্দ্র ভাবিলেন, হয় জগদীশ বাবুকে দস্যুরা হত্যা করিয়াছে, নচেৎ তিনি পাটনায় গিয়াছেন। পাটনা শরৎচন্দ্রের গম্য স্থানের পথ; শরৎচন্দ্র আর বিলম্ব না করিয়া গম্য স্থানে বাসনা চরিতার্থ করিতে যাইবেন ঠিক করিলেন।

শরৎচন্দ্রের বাসনা কি, তাহা তাঁহার পত্রে পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে, গম্যস্থান কোথায়? কে বলিবে?

আমীর খাঁর অন্তরে যে আগুন জলিতেছিল, তাহাও একদিন প্রকাশ পাইয়াছে; তাঁহার জীবনের উৎকৃষ্ট পুরস্কার আণ্ডামান! হতভাগ্য নেপোলিয়নের চিরকীর্ত্তি সেণ্টহেলেনায় ভস্মীভূত হইয়াছিল; তাঁহার জীবনের গম্যস্থান কি হেলেনা? রাজনীতির বিড়ম্বনা! রণজিৎসিংহের বিধবা মহিষী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন বারাণসীতে। এসকল স্মরণ করিলে কি হইবে? ইংলণ্ডে প্রথম জেম্‌সের সময়ে চক্রান্তকারী গণের শেষ পুরস্কার!—স্মরণ করিতে শরীর সিহরিয়া উঠে। শরৎচন্দ্রের মনে প্রবেশ করিবার যদি কাহারও ক্ষমতা থাকে, তবে সেই বুঝিতে পারে, শরৎচন্দ্রের গম্যস্থান

কোথায়, এবং তাহার জীবনে পুরস্কার কি ? আমরা যখন শরৎচন্দ্রের মনে প্রবেশ করিয়া তাঁহার জীবনের ভাবী অঙ্কের অভিনয়ের পর্য্যালোচনা করি, তখন আমাদের মনে পড়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট—আর মনে পড়ে সেণ্টহেলেনা। আমরা ক্ষীণদেহধারী বাঙ্গালী, আমরা রাজনীতির গূঢ়তত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না ; শরীর বিকম্পিত হয়।

রাজনীতির মূলমন্ত্র কপটতা। তোমার মনে যাহা জ্বলিতেছে, তাহা বাহিরে প্রকাশিত না হইলেই তুমি রাজনীতিজ্ঞ, পৃথিবীর স্বর্ণমুকুট তোমার মস্তকে শোভা পাইবে ; আর প্রকাশ কর,—ঐ আণ্ডামানদ্বীপ তোমার আবাস স্থান !! প্রবঞ্চনা করিতে শিখিয়া থাক আর না থাক, কপটী হইতে না শিখিলে, রাজনীতির উপযুক্ত তুমি নহ ! এই রাজনীতির কথা মনে পড়িলে আমাদের শরীর বিকম্পিত হয়। ঐ যে যুবক পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া মনের আগুন অন্য-হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিবার মানসে মনের কথা খুলিয়া বলিতেছে, সাবধান রাজনীতি উহার জন্য নহে। উহার দেশহিতৈষণা কারাবাসেই নিঃশেষিত হইবে! আর ঐ যে পুকুরের ধারে দুইটী যুবক উপবিষ্ট হইয়া মনের কথা বলিতেছে, আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, একবার পশ্চিমে চাহিতেছে, আর হৃদয় উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে, উহাদের গম্যস্থান ভাবিলে আমাদের হৃদয় দুঃখে অবসন্ন হয়। তাই বলি রাজনীতির শিক্ষা বিড়ম্বনার একশেষ ; বাঙ্গালীর সরল মন রাজনীতির উপযুক্ত নহে !

যাহা বলিতেছিলাম, ঐ যে পুকুরের ধারে দুইটী যুবক। একটী গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিয়াছে, আর একটী কতই কি বলিতেছে। শেষোক্ত যুবকটী যাহা বলিতেছিল, তাহার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই, সে সকল কবির কল্পনা,যেন ভাসিয়া ভাসিয়া হৃদয়-সরসীতে তরঙ্গ তুলিতেছিল। আর একটী দুই একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিল, আর মনের আগুনেদগ্ধীভূত হইতেছিল। কলিকাতা মহানগরী পশ্চিম দিকে বৃটীশ শাসনের জয়পতাকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া মহা ধুমধামে মত্ত, অন্যদিকে নির্জীব বাঙ্গালীর আবাস স্থান, সে শুন্ডী পল্লী।

যুবক দুইটী যেখানে উপবিষ্ট, সে স্থান বৃক্ষাদির দ্বারা বেষ্টিত ; রাত্রি প্রহরাতীত, সে স্থানে আর লোক ছিল না। শেষোক্ত বালকটী বলিতেছে,—'আমার মতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। যে পাঁচ বৎসরের কথা বলিলে, এই পাঁচ বৎসরে হয়ত আরো পঁচিশ জন লোক যাইবে ; কিন্তু তুমি যদি

পথ না দেখাও, তাহা হইলে আর পাঁচ বৎসর পরে কেবল মাত্র একা তুমি। আবার দেখ, সেখানে গেলে হয়ত তুমি সুস্থ শরীরে থাকিবে, কারণ মন প্রফুল্ল থাকিলে শরীর সুস্থ থাকিবেই ; কিন্তু এখানে থাকিলে কে জানে যে এই পাঁচ বৎসর পরেও তোমার স্বাস্থ্যের কোন বিঘ্ন ঘটিবে না ? নয় ধরিলাম, সেখানে গেলেও তোমার পীড়া হইতে পারে, এখানেও পারে, কিন্তু সেখানে গেলে তোমার মনের বাসনা চরিতার্থ হইবে, তাহাতে তোমার মনে যে সুখ হইবে, এখানে তাহা কখনই হইবে না ;—এখানে থাকিলে তুমি মৃতবৎ থাকিবে। তাই বলিতেছিলাম, যত শীঘ্র পার যাও। আর সয়না। মুসলমানদিগের রাজত্ব অত্যাচারময় ছিল তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তখনকার অর্থ বিদেশে যাইত না ; ভারতবর্ষের অর্থ ভারতবর্ষেই থাকিত। আবার দেখ এদেশীয়দিগকে তাহারা কতদূর বিশ্বাস করিত। আকবরের সৈন্যাধ্যক্ষ মানসিংহ, কোষাধ্যক্ষ এদেশীয়, প্রধান মন্ত্রী তোদারমল্ল। সেরাজদৌল্লার সময় দেশ অত্যাচারে পীড়িত ছিল ; কিন্তু মোহনলাল, বিরবল, এবং জগৎসেট প্রভৃতিকে যে প্রকার বিশ্বাস করিত, এইক্ষণ এদেশীয়দিগকে সে প্রকার বিশ্বাস করে কে ? উচ্চ উচ্চ পদ সকলই বিদেশীয়দিগের। আমাদিগের দেশ, আমরা তাহার শাসন সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারি না। আর হতভাগ্য বাঙ্গালী—দেশের জন্য রক্তপাত করা ইহাদিগেব অদৃষ্টে নাই।' বলিতে বলিতে যুবকের নিস্তেজ শরীর উৎসাহে কম্পিত হইয়া উঠিল, বলিল, ইচ্ছা করে আমিও তোমার সঙ্গে যাই। আর এদেশে থাকিতে ইচ্ছা করে না।

প্রথমোক্ত যুবকটী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, স্থির হও। তুমি আমি কি করিতে পারি ? আমাদিগের আস্ফালন, উড্ডীয়মান পিপীলিকার ন্যায়। ইংরাজদিগের যে প্রকার দ্রুতগতিতে রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে, ইহাদের চরম সীমা কি, কে জানে ? যখন হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত মনে পড়ে—তখন স্বপ্নবৎ দেখি সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া ইংরাজের প্রবল প্রতাপের বিজয় ভেরী নিনাদিত হইতেছে। ভাই! অধৈর্য্য হইও না। তুমি ক্ষুদ্রপ্রাণী—কি করিবে বল ? এই বিস্তৃত ভারতবর্ষে বিশকোটী অধিবাসী, সকলেই নিদ্রিত ; তুমি কি করিতে পার ? আমাদের আশা কি ? এজীবন থাকিতে কিছু দেখিব না, ভাবী কোন বংশ আবার ভারতকে স্বাধীন দেখিবে কি না তাহাই বা কে জানে ? তবে যাই কেন ? শ্মশান ছাড়িয়া যাই কেন ?

জিজ্ঞাসা করিও না। উত্তর পাইবে না। কি উত্তর দিব ? এ মনে অহর্নিশ যে আগুন জ্বলিতেছে তাহা প্রকাশ করিলে যাহারা বুঝিবে, তাহারা পুরস্কার দিবে,—কারাবাস—নয় দ্বীপান্তর ; আর যাহারা বুঝিবে না, তাহারা কিছু বলিবে না, বরং আমার এ আগুন নির্ব্বাপিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিবে।'

বলিতে বলিতে যুবকের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, দ্বিতীয় যুবকের গলা ধরিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন ; বোধ হইল যেন নিশ্বাসের সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় যুবকটী বলিলেন—'দাদা, তোমার মনে প্রবেশ করিবার আমার ক্ষমতা নাই, হিমাদ্রিশেখর হইতেও তোমার মন উচ্চ। ঈশ্বর অবশ্য তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। আমার ইচ্ছা হয়, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। সম্প্রতি তুমি কোথায় যাইবে ঠিক করিয়াছ ?'

প্রথম যুবক বলিলেন,—'ভাই ! তুমি কোথায় যাইবে ? সংসারে কষ্ট যাহাদের অস্পৃশ্য, তাহাদের এই কার্য্যে ব্রতী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাহাদের মন পাষাণ হইতেও কঠিন এবং দৃঢ়, যাহারা পৃথিবীর দয়া মায়াকে বিসর্জ্জন দিতে পারে, এ ভীষণ পথ তাহাদেরই জন্য ; তুমি যাইয়া কি করিবে ? চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা তোমার সহধর্ম্মিনী, বৃদ্ধ মাতা এখনো তোমার পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন, সংসার তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তুমি সংসার ছাড়িবে কেন ? আজ তুমি সংসার ছাড়িয়া দেও, কাল দুপা অগ্রসর হইতে না হইতেই ভাবিবে, সংসারে থাকিলে যে সুখ হইত, সে সুখ কোথায়, —আত্মীয় পরিজন কোথায়,—সুখের স্বপ্ন কোথায় ? তবে আমি যাইতেছি কেন ? আমি সংসারকে চিনিয়াছি, বিষময় সংসারের বিষের জ্বালায় শরীর অস্থির। তাহার মধ্যে আবার আগুন জ্বলিতেছে, এ আগুন যে দিন নির্ব্বাপিত হইবে, সেই দিন আবার সংসারে প্রবেশ করিব। যাইব কোথায় ? ভাই ! আবারও জিজ্ঞাসা করিলে ? যাইব শ্মশান ছাড়িয়া। যেখানে শ্মশান নাই,—যেখানে শ্মশানের ভূতপ্রেত নাই,—যেখানে ইংরাজ নাই, যেখানে ইংরাজের রাজত্ব নাই। সে স্থান কোথায় ? সেই হিমালয়ের ধবল শিখর,—যে আজও স্বাধীন ভাবে মস্তক উন্নত করিয়া কত রাজ্য উপরাজ্যের উত্থান পতন দেখিতেছে, যে আজও ভারতীকে অতল জলধিতলে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া অশ্রুপ্লাবনে সিক্ত হইতেছে, আর উচ্-

সাহ ও আশাকে বুকে বাঁধিয়া আজও ভাবী পরিণামের দিন গণিতেছে। আমি সেই খানেই যাইব। ভাই! নীরদা এবং বিন্ধ্যবাসিনীকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম, নীরদা জন্মদুঃখিনী, বিন্দুর জীবনের ভাবী অঙ্কে সুখ নাই; ইহাদিগকে দেখিও।

দ্বিতীয় যুবকটী আবার বলিলেন—'দাদা! তুমি আর কতদিন পরে ফিরিবে'?

উত্তর হইল কে জানে, কতদিন পরে আসিব? 'ভাই! এ সকল কথা প্রাণান্তেও কাহাকে বলিবে না।'

'বলিলে কি হইবে? দাদাদিগের নিকটও বলিবনা? ভাল, তুমি মধ্যম দাদা মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া যাইবে না?'

'না, আমি আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিব না। স্বেচ্ছায় কে আত্মীয়কে বিসর্জ্জন দিতে চায়? মনের কথা মনেই রাখিও; কাহাকেও বলিও না।

এই প্রকার কথোপকথনের পর, যাঁহারা যুবক দুটীকে জানিত, তাহারা আর শরৎচন্দ্রকে পরদিন দেখিতে পাইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সতীত্বের আদর্শ।

কি দেখিলাম, আরও কত কি দেখিব। বাল্যকাল হইতে এই পর্য্যন্ত সংসারে ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, সংসারের সুখ,—আর দেখিলাম সংসারের অসুখ। পূর্ব্বে শুনিতাম, বিরহিনীগণ অধৈর্য্য হইয়া বিষম অনলকুণ্ডে শরীর বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীসহ স্বর্গারোহণ করিতেন, আর এখন দেখি, পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানিনী বাঙ্গালির ললনা, বৈধব্য-দশায়ও ভোগবিলাসে বীতস্পৃহ নহেন। আর পঞ্চাশ বৎসর জীবিত থাকিলে দেখিব, সেই সাহেব আর এই বাঙ্গালী, সেই সাহেবের ললনা আর এই বাঙ্গালীর সহধর্ম্মিনী। এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যখন বাঙ্গালীর পরিণাম ভাবিতে আরম্ভ করি, তখন সতীত্ব বিস্মৃত হই,—মনে হয় সতীত্বই যেন সংসারের অসুখ,—এই সতীত্বের দশা ভবিষ্যতে কি হইবে কে জানে?

বাঙ্গালির বর্ত্তমান সমাজিক অবস্থার ন্যায় শোচনীয় অবস্থা আর নাই। অবগুণ্ঠনবতী সতীগণ এইক্ষণ অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে অভিলাষিণী, পুরুষগণ ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও ভয়ে, বিষাদে, এবং আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে আবার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিতে যত্নশীল। লজ্জা সতীর অঙ্গের ভুষণ; যে সতী সেই লজ্জাশীলা, কিন্তু এক্ষণ তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে। বঙ্গে সভ্যতার স্রোত যে প্রকার বক্রগতিতে অগ্রসর হইতেছে, কালে সতীত্ব বজায় থাকিবে কি না, কে জানে? যদি সতীত্ব না থাকে, তবে মহত্ত্বও যে থাকিবে না, তাহাও স্থির নিশ্চয়।

এক বৎসর হইল অবিনাশচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে; সহধর্ম্মিনী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা,—তাহার বয়স এইক্ষণ চতুর্দ্দশ বৎসর;—অতি পবিত্র, অতি নিষ্কলঙ্ক; রূপ ও সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত ধবল পদ্মের ন্যায়। সেই বালিকাটী অবিনাশকে অত্যন্ত ভালবাসিত, এক দণ্ডও অবিনাশকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। বিবাহের পর অবিনাশ শ্বশুর বাড়ীতেই থাকিতেন। তিনি যখন স্কুলে যাইতেন, তখন সেই বালিকাটী পথ পানে চাহিয়া থাকিত, বাড়ী আসিলেই অবিনাশের নিকটে যাইয়া তৃষিত হৃদয়কে শীতল করিত। বালিকার মনে লজ্জা ছিল না, অবিনাশচন্দ্রকে অবিনাশ বলিয়া ডাকিত। প্রথমতঃ অবিনাশচন্দ্র তাহাতে একটু একটু লজ্জিত হইতেন, কিছুদিন পরে সে ভাব গেল। ক্রমে ক্রমে অবিনাশচন্দ্রও সেই বালকাটীকে অত্যন্ত ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন।

যে দিন বিন্ধ্যবাসিনীর পলায়নের সংবাদ অবিনাশচন্দ্রের কর্ণে গেল, সে দিন বৈকালে স্কুল হইতে আসিয়া অবিনাশচন্দ্র গম্ভীর ভাবে একখানি পুস্তক লইয়া বসিয়া ভাবিতে ছিলেন, এমন সময়ে বালিকাটী আসিয়া অবিনাশের নিস্তব্ধভাব দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল,—'অবিনাশ! কি ভাবিতেছ?' এই বলিয়া অবিনাশের সন্মুখস্থ পুস্তকখানি অপসৃত করিয়া বলিল, 'অবিনাশ! কথা বল না কেন?

অবিনাশচন্দ্র আর ঠিক থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন 'নলিন! দুঃখের কথা শুনিয়া কি করিবে? আমার মন আজ অস্থির হয়েছে; আমি শীঘ্রই বাড়ীতে যাইব।

বালিকাটী সহৃদয়ে করুণস্বরে বলিল—'তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া

কি করিব ?—হৃদয় থাকে কাঁদিব, তোমার দুঃখের শেল যদি এ হৃদয়ে না বিঁধিল, তবে অবিনাশ আমার জীবনে কাজ কি ?

অবিনাশচন্দ্র অকৃত্রিম ভালবাসার পুরস্কার দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

নলিনী বলিতে লাগিল—'তুমি বাড়ী যাবে আর আমি কি এখানে থাকিব ? আমিও তোমার সহিত যাইব।'

অবিনাশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, তুমি যাইবে কোথায় ? দুঃখ তোমার অস্পৃশ্য—সুখশয্যা তোমার জীবন-সহায় ; তুমি কণ্টকময় পথে আমার সহিত যাইবে কেন ? তুমি তোমার পিতা মাতার একমাত্র আদরের বস্তু, আদরে রক্ষিত, অযত্নপ্রতিপালিত এই অধমকে তুমি কেন ভালবাস, আমি জানি না। কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে তোমার যখন কষ্ট হইবে, তখন আমি কি করিব নলিন ? তখন কি প্রকারে তোমার কষ্ট দূর করিব ?

নলিনীর ঈষৎ রক্তিম মুখ আরো রক্তবর্ণ হইল, দুঃখে বলিল—সুখশয্যায় শুই বটে, কিন্তু তোমার আশা ছাড়িয়া এক দিনও থাকিতে পারি না। আমি পিতা মাতার আদরের ধন, তাঁহারা আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না সত্য, কিন্তু তুমি আমার জীবনের আদরের ধন, আমি তোমাকে ছাড়িব কেন ? কষ্টের কথা বলিলে ? ছার কথা ! আমি তোমাকে মন প্রাণ সঁপে দিয়াছি, তুমি যে পথে যাইবে আমিও সেই পথে যাইব। অবিনাশ ! আমি কখনও কি তোমার কোন কথা অবহেলা করিয়াছি ? তবে তুমি আমাকে এমন কথা বলিলে কেন ? তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেই-খানে যাইব ; কিভয় ? তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে আমি কাহাকেও ভয় করি না।

শরৎচন্দ্রের সেই রজনীর কথা অবিনাশচন্দ্রের মনে জাগিল,—'চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা তোমাব সহধর্ম্মিনী, দুঃখ তোমার অস্পৃশ্য, তুমি সংসার ছাড়িবে কেন ?' ভাবিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার মনে যে তেজ দেখিতেছি, বিন্ধ্যবাসিনীর মনে তাহা দেখি নাই। সহসা মনে এক অপূর্ব্ব-ভাবের উদয় হইল, শরৎচন্দ্রের জীবনের কণ্টকাবৃত পথের কথা স্মরণপথকে অবরুদ্ধ করিল, যে কথার প্রসঙ্গে এত কথার সূত্রপাত হইল, সে সকল মন হইতে চলিয়া গেল, বলিলেন 'নলিন ! তোমার হৃদয়ে যে শক্তি, ইহা নারী-চরিত্রের গৌরব সন্দেহ নাই, কিন্তু স্থির হও, একটু ভাবিয়া দেখ। আমার সহিত যাইবে ?—মনে কর, আমি যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য দেশান্তরে

যাইতেছি, মনে কর সমরক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতেছি ; এমন সময়ে তুমি আমার সঙ্গে, তোমার মনে ভয় হয় না ?

নলিনী মৃদুস্বরে গম্ভীর ভাবে বলিল ;—

"যে পথে যাইবে তুমি, যাইব সে পথে,
বিজন কাননে কিম্বা ভীষণ সমবে।
কে ডরে সমর ক্ষেত্র ? কি ভয় আমার
তব সহ প্রবেশিতে সমব-অনলে ?
নলিনী জীবন, প্রাণ, তুমি অবিনাশ
বাঁচিলে বাঁচিব, নয় মবিব নিশ্চয ;
কি ভয় আমাব তবে, যাব তব সাথে।
মাতিলে সমব ক্ষেত্রে, মাতিব তখনি,
শোভিবে কোমল কবে, বীব অহঙ্কাব ;
কাঁপিবে সুবম্য পৃথ্বী মমপদ ভবে।
সাজিলে তপস্বী তুমি, সাজিব তখনি,
কি কাজ ভূষণে আর, নব তপস্বিনী।
যাবে দেশে ? যাও তবে, চলিব এখনি
তব সঙ্গে, সুখ আশে জলাঞ্জলি দিয়া ;
পিতার অপাব ধন, ঐশ্বর্য্য বিস্তব
মানি তাহা, কিন্তু জীবনের পবিণাম
নহে সুখ শর্য্যা মম ; জানিও নিশ্চয
তুমিই সর্ব্বস্ব মম, নলিনী-জীবন।
বিজলিযা ঘনঘটা সৌদামিনী প্রায়,
মাতিয়া মাতাব সবে, তব সহ পশি
সমবে, খেলিবে বাহু, যদিও নির্জ্জীব,
বল শূন্য ক্ষীণ কায়, তব বলে বলী,
যথা বৈশ্বানব খেলে প্রবল পবনে।
না পারি সহিতে কষ্ট, মরিব, কি ভয় ?
সম্মুখে মরণ মোর, যেন স্বর্গবাস !
চল তবে অবিনাশ ! যে পথে মানস !"

অবিনাশচন্দ্র স্ত্রীর উৎসাহ-পূর্ণ বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এমন

সঙ্গিনী পাইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া জীবনকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। বাঙ্গলায় এমন রত্ন মিলে, পূর্ব্বে তাঁহার এ ধারণা ছিল না; নলিনীর অনন্ত জীবন্ত কথায় সে সংস্কার দূর হইল। বলিলেন, বিন্ধ্যবাসিনীর অনুসন্ধান করিয়া পরে দাদা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। যদি স্বামীকে জীবনের সার বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে আমার সহিত এক্ষণই চল।

এই বলিয়া উৎসাহ মনে অবিনাশচন্দ্র যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, নলিনীও অবিনাশচন্দ্রের অনুসরণ করিবেন, এই মানসে আহ্লাদিত মনে, সঙ্গে লইবার দ্রব্যাদি একত্র করিতে লাগিলেন। সূর্য্য অস্ত গেল। রজনীযোগে অবিনাশচন্দ্র নলিনীর হস্ত ধারণ করিয়া গৃহের বাহির হইলেন। কিন্তু নিকটস্থ প্রহরী দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। বিন্ধ্যবাসিনীর অনুসন্ধানই অবিনাশের গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আড়ম্বরে তাহাও পূর্ণ হইল না, অনেক দিন পর্য্যন্ত সেইখানে সেইভাবে থাকিতেই বাধ্য হইলেন। অবিনাশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের অনুরোধ পালন করিতে পারিলেন না বলিয়া ক্ষুণ্নচিত্ত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিজন অরণ্যে।

লেখকেরা কল্পনায় না করিতে পারেন, এমন কিছুই নাই। জীবনের বিগত ঘটনা তাঁহাদিগের কণ্ঠস্থ, তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বর্ত্তমান জীবনের সামান্য ঘটনাও এড়াইতে পারে না; ভাবী জীবন তাঁহাদের এক-চাটিয়া মহল। অন্ধকার রজনীতে তরীকে অনির্দ্দিষ্ট পথে ছাড়িয়া দেও, লেখকেরা তরীর পরিণাম বলিয়া দিবে। যাহা ঘটে, তাহা যিনি বলিতে পারেন তিনি কবি নহেন, অসাধারণ কল্পনার পথ অতিক্রম করিয়া যিনি অমানুষী প্রতাপের ন্যায় লোক সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনিই কবি। জন্মান্ধের চক্ষু ফুটাইয়া যিনি অসম্পূর্ণ অঙ্গহীন কাব্যের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতে পারেন, তিনি উপন্যাস-লেখক হইলেও কবি, আর যাঁহাদের এপথ কল্পনার অতীত, তাঁহারা কবিতা লিখিলেও কবি নহেন।

বিপদে আশ্রয়, রোগে আরোগ্য, দুঃখের পরই সুখ, এই প্রকার ঘটনা লেখকগণের প্রধান অবলম্বন। যে বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, তাহার যত বিপদ আসুক, লেখকগণ মিলন পর্য্যন্ত তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া পুস্তকের শোভা বর্দ্ধন করিবেনই করিবেন। এই জন্য সুখ ও দুঃখের স্থায়ীভাব আধুনিক বাঙ্গালার পুস্তক পাঠে আমাদের মনে স্থান পায় না। যখন পুস্তকে লিখিত ব্যক্তি বিশেষের বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া চক্ষু হইতে জল বাহির করিবার সময় হয়, তখনই মৃদু মধুর স্বরে কে যেন বলিয়া দেয়, "এদিন যাইবে, ভানুদয় হইবে।" দিন যায়, রোগ আরোগ্য হয়, বিপদে আশ্রয় পাওয়া যায়, এ সকল কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু এমন দিন কি ঘটে না, যে দিনের হাত আর এড়ান যায় না? এই প্রশস্ত জীবনক্ষেত্রে কেহই কি বিপদে পড়িয়া সময়-স্রোতে মিশাইয়া যায় নাই? রোগে কত লোক মরে, কিন্তু পুস্তকে অল্পেরই দৃষ্টান্ত আছে, মহৌষধ নায়ক নায়িকার ঘোরতর পীড়াও আরাম করিয়া দেয়। এ সংসারে সকলেরই কি দিন যায়, কেহই কি দিনের সহিত যায় না? মিথ্যা কথা। বিশ্বাস করিতে পারি না, —যে চৈত্র-বায়ু-বিলোড়িত-তরঙ্গমালায় কপালকুণ্ডলাকে অগাধ-সলিলে ডুবাইল, সেই তরঙ্গ আবার তাহাকে বাঁচাইল। আধুনিক বঙ্গে স্থায়ীভাব উদ্দীপক পুস্তক নিতান্ত অল্প। তাই বলিতেছিলাম, লেখকেরা কল্পনায় না পারেন, এমন কার্য্যই নাই।

আমরা কবি নহি। সামান্য নৌকা বাহিয়া চলিয়াছি, যখন প্রতিকূল বায়ুতে সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গ উঠিবে, যখন দৈব বিপাকে নৌকা ডুবিবে, কিম্বা নৌকার সরঞ্জম তরঙ্গে বিলীন হইবে, তখন আমরা আর তাহা তুলিব না, কাল-স্রোত হইতে তুলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। নৌকা চলিতেছে, তাই তরঙ্গ গণিতেছি, আশার চক্ষে সুদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি। দিন না আসিলে,—তরঙ্গে তরী ডুবিলে,—আমরা হাইল ছাড়িয়া পলায়ন করিব, নৌকা বাহিবার সাধ একবার মিটিবে, আবার অন্য নৌকা বাহিব। সংক্ষেপে বিপদে আমাদের ভয় নাই; যাহা দেখিয়া আর দেখি না, তাহা দেখিবার জন্য আমাদের মন ব্যাকুল নহে; যাহা দেখি নাই, তাহাও দেখাইতে বাসনা নাই; যাহা ডুবিয়া যায় তাহা তুলিবার আমাদের সাধ নাই। সংসারের মতে আমাদের মত না মিলিলেও আমাদের পথ আমরা ছাড়িব না।

বিন্ধ্যবাসিনী সংসার জাল ছিঁড়িয়াছেন,—উন্মত্তা বিন্দু সংসার সমুদ্রে ভাসিতেছেন। সমুদ্রে ভাসিতেছেন,—কিন্তু তরঙ্গ বিন্দুকে ডুবায় না, বিন্দুর ডুবিবার বাসনা ছিল, কিন্তু তরঙ্গ ডুবাইল না। ডুবাইলে সংসারের দুঃখভোগ কে করিবে? এইজন্য বিন্দু সমুদ্রেও আশ্রয় পাইলেন, সে আশ্রয় কি, তাহা আমরা এইক্ষণ বিবৃত করিব।

অপরিণামদর্শিতার ফল হাতে হাতে। কণ্টকিত সংসারে অধীনতার কঠোর শৃঙ্খলের ন্যায় কষ্টদায়ক বস্তু আর নাই। কিন্তু যাহারা অপরিণত অবস্থায় সেই পিঞ্জর ভাঙ্গিতে যত্ন করে, তাহাদের পরিণাম অন্ধকারময়—দুঃখ-উদ্দীপক।

কয়েকদিন অপরিচিত পথে অনাহারে ভ্রমণ করিয়া আজ বিন্ধ্যবাসিনী যে স্থানে উপস্থিত, সে বিজন বন, ব্যাঘ্র এবং অন্যান্য ভয়ঙ্কর জন্তুগণের আবাসস্থান। সেই স্থানের দুই দিকে নদী, একদিকে জঙ্গলময় ক্ষুদ্র প্রান্তর, প্রান্তরের অপর পার্শ্বে আবার অরণ্য, মানবের বসতিস্থান অনেক দূরে। এমনস্থানে বিন্ধ্যবাসিনী কেন আসিলেন? মরিবার জন্য! অকৃত্রিম প্রণয়ের শেষ চিহ্ন মন হইতে অপসৃত করিবার জন্য!

বিজনবন, মধ্যাহ্নসময়,—লীলাময়ী সূর্য্যদেবের রশ্মি কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপিয়া মৃত্তিকা সংস্পর্শ করিয়াছে, অন্য স্থানে রশ্মি নাই—অল্প আলোকময়; কবির সৌন্দর্য্য, সাধকের সাধনার উপযুক্ত স্থান। বিন্ধ্যবাসিনী এই স্থানে আসিয়াছেন। অন্যদিন যেখানে যাহা পাইতেন, তাহাই উদারসাৎ করিতেন, অদ্য আর কিছু না পাইয়া কয়েকটী অপরিচিত ফল সংগ্রহ করিয়া তাহাই আহার করিলেন। ফলের মধ্যে একটী ফলে মাদকতাগুণ অধিক ছিল, খাইতে না খাইতে বিন্ধ্যবাসিনী এই স্থানে ঢলিয়া পড়িলেন।

অপরাহ্নে বিন্ধ্যবাসিনী একটু সুস্থ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে কয়েক জন শিকারী ব্যাঘ্র অন্বেষণ করিতে করিতে আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। শিকারীগণের পশ্চাতে একটী বৃদ্ধ সাধক, ব্যাঘ্র চর্ম্মের জন্য শিকারীগণের সহিত ছিলেন। শিকারীগণ বন্য পশুবৎ। তাহারা বিন্ধ্যবাসিনীর প্রতি তীর লক্ষ্য করিয়া পশ্চাতে অনুমতির জন্য ফিরিয়া চাহিলে সাধক বলিলেন—'স্থির হ, প্রাণসংহার করিস্‌নে।' শিকারীরা তীর রাখিয়া পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল, সাধক যাইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর হস্ত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, 'মা! তুমি এই অল্প বয়সে কেন একাকিনী আসিয়াছ, তাহা আমি বুঝি-

যাচ্ছি, সংসারে আত্মহত্যার ন্যায় আর পাপ নাই, তুমি মরিও না, আমার সহিত আইস।'

বিন্ধ্যবাসিনী কথা বলিলেন না, সাধক হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। অনতিদূরে একটী ব্যাঘ্রের গর্জন কর্ণে প্রবেশ করিল, শিকারীরা সাবধান হইয়া প্রস্তুত হইল, সাধক বিন্ধ্যবাসিনীকে বলিলেন 'মা! যে গর্জন শুনিলে উহা ব্যাঘ্রের রব, আমরা না আসিলে ঐ ব্যাঘ্র তোমার প্রাণ সংহার করিত, এখন আর ভয় নাই, আমার সহিত আইস।' ক্ষণকাল মধ্যে শিকারীগণের তীক্ষ্ণ শরে ব্যাঘ্রের মৃত্যু হইল, শিকারীরা সেই স্থানেই চর্ম্ম খুলিয়া লইল। সাধক বিন্ধ্যবাসিনীর হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন, শিকারীরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

বন অতিক্রান্ত হইলে একটী ক্ষুদ্র নদী দেখা গেল, সেই খানে দুই খানি নৌকা সংলগ্ন ছিল; সাধক একখানিতে বিন্ধ্যবাসিনীকে লইয়া উঠিলেন, শিকারীরা ব্যাঘ্রচর্ম্ম নৌকায় উঠাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। বিন্ধ্যবাসিনী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'পিত! আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন? আমি অবলা, আপনার ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইয়াছি—আপনার সহিত কোথায় যাইব?

সাধক বলিলেন 'মা!—আমার সহিত যাইতে তোমার ভয় হইতেছে? তবে তোমাকে ঐ নৌকায় দি, সংসারে যাইয়া মনের বাসনা পূর্ণ করিও। যদি বিপদে পড়, তবে আমাকে স্মরণ করিও। তোমার শরীর ক্লিষ্ট, মস্তিষ্ক উষ্ণ বোধ হইতেছে, এই ফলটী খাও, সুস্থ হইবে।' বিন্ধ্যবাসিনী তাহাই করিলেন, হঠাৎ যেন তাঁহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য উপস্থিত হইল; সসম্ভ্রমে বলিলেন—'পিত! আমি আপনার সহিতই যাইব। আপনি আমার মনের কথা বুঝিয়াছেন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার ঔষধ কি আপনার নিকটে নাই?'

সাধক বলিলেন, মা! আপাততঃ তুমি ঐ নৌকাতেই যাও; আমি আর এক বৎসর বনে থাকিব, তার পর একবার দেশভ্রমণে বহির্গত হইব; এই এক বৎসর পরে তোমাকে লইয়া যাইব।

বিন্ধ্যবাসিনী আর কিছুই বলিলেন না। সে রাত্রে সাধকের সহিত রহিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে সাধক উভয় নৌকাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। যেখানে নদীর ত্রিমুখ, সেইখানে যাইয়া অন্য নৌকার দাঁড়ী-

দিগকে বলিলেন—'তোমরা এই পথে যাইয়া ক্রমে দক্ষিণদিকে গেলে,একটী ক্ষুদ্র খাল দেখিবে, সেই খাল ধরিয়া গেলেই গোবিন্দপুরের নদী পাইবে।'

এই কথা শুনিয়া ছইয়ের ভিতর হইতে একটী লোক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল;—সাধক বলিলেন, রজনি! তবে এখন যাই; যে পথের কথা বলিলাম, এই পথে গেলেই গোবিন্দপুরের নদী পাইবে। এই অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকটীকে তোমার সহিত লইয়া যাও, এক বৎসর পরে আমি তোমার গোবিন্দপুরে যাইয়া ইহাকে লইয়া যাইব। বিন্ধ্যবাসিনীকে বলিলেন, মা! এই লোকটীকে অপরিচিত ভাবিতেছ? আশঙ্কা নাই; ইহার সহিত যাও। বিন্ধ্যবাসিনী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে, সাধক আশীর্ব্বাদ করিলেন; রজনী হস্ত ধরিয়া বিন্ধ্যবাসিনীকে তাঁহার নৌকায় তুলিয়া লইলেন। সাধক আবার পথ প্রদর্শন করিয়া স্বীয় নৌকা বিপরীত দিকে চালাইতে বলিলেন; সাধকের নৌকা নিমিষের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সাধকের নৌকা দৃশ্যের অতীত হইলে, রজনীবাবুর আদেশানুসারে তাঁহার নৌকা চলিল। প্রবাহিত জলতরঙ্গ ভেদ করিয়া তরী সজোরে ধাবিত হইল। তীর অরণ্যময়। সাধক যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনি কতক দূর যাইয়া একটী ক্ষুদ্র খাল দেখা গেল, সেই খাল অবলম্বন করিয়া মাজীরা নৌকা বাহিয়া চলিল। খালটী প্রশস্ত কিন্তু দৈর্ঘ্যে কম নহে; প্রায় একদিনের পথ হইবে। দুই প্রহর বেলার সময় আকাশে শাদা মেঘ উড়িতেছিল; যাই বেলা পড়িয়া আসিল, অমনিই সেই সকল একত্রিত হইতে লাগিল। সূর্য্য মেঘে আবৃত হইল। উত্তরদিকে প্রথম লাল, তারপর ঈষৎকাল, অবশেষে কাকের ডিম যেন আকাশ ভরিয়া ছড়াইয়া পড়িল। পক্ষীগণ ভয়ে ভীত হইয়া বৃক্ষ ছাড়িল—উড়িতে লাগিল। তীরস্থ জল কল কল করিয়া উঠিল। মেঘের ছায়া নদীতে পড়িল, নদীর জল নীলবর্ণ হইল। মাজীরা বিপদের আশঙ্কা করিয়া জোরে দাঁড় টানিতে

লাগিল। নৌকা তীরে সংলগ্ন হইতে না হইতে ঝড় উঠিল, গাছের পাতা উড়িল—তীর হইতে ধূলা উড়িল। জল নাচিয়া উঠিল, তরঙ্গ উঠিল, এক তরঙ্গ আর এক তরঙ্গে প্রহৃত হইয়া সজোরে ধাবিত হইল। জলের ভীষণ গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইল, ধূলা বর্ষণে দিক্ আঁধার হইতে লাগিল। মাজীদের চেষ্টা বিফল হইল, তরী বেগে ধাবিত হইয়া স্থানান্তরে লাগিল। বিন্ধ্যবাসিনী এতক্ষণ অবাক্ হইয়া বসিয়াছিলেন, এইক্ষণে ভীত মনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ কোন্ স্থান? আপনি কোথা হইতে কোথায় চলিয়াছেন?

রজনী বাবু ব্যস্ততার সহিত বলিলেন,—'ভয় নাই, আমাদের তরী রক্ষা পাইবে। এই বলিয়া ছইয়ের বাহিরে যাইয়া নৌকা তীরে বাঁধিতে বলিলেন। কতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রবলবেগে বায়ু বহিতে বহিতে আকাশের মেঘ উড়িয়া গেল, বৃষ্টি পড়িল না, বায়ুর বেগও থামিয়া আসিল, আদেশানুসারে খুলিয়া দেওয়া হইলে নৌকা আবার চলিল। রজনী বাবু ছইয়ের ভিতরে আসিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন—'সাধককে আপনি জানেন?

রজনী বাবু বলিলেন—না; আমি বিশেষ কিছুই জানি না; দুই দিন হইল আমরা পথ ভুলিয়া অন্য পথে আসিয়াছিলাম, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম, তিনি একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। আপনার সহিত কি প্রকারে সাক্ষাৎ হইল?

বিন্ধ্যবাসিনী সমস্ত ঘটনা বলিলেন। রজনী বাবু শুনিয়া বলিলেন, 'সাধকের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আপনার প্রাণ বিনষ্ট হইত।'

বিন্দু।—আপনি কোথায় যাইতেছেন? আমাকেই বা কোথায় লইয়া যাইবেন?

রজনী।—আমি গোবিন্দপুরে যাইব; গোবিন্দপুরে আমার মাতুলের বিষয়ের আমিই উত্তরাধিকারী; আমার নিবাস কৃষ্ণপুর। আপনাকে সাধকের আদেশানুসারে আমার সহিত গোবিন্দপুরেই লইয়া যাইব। এক বৎসর পর আবার সাধক আসিলে আপনি তাঁহার সহিত যাইবেন। আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার আশঙ্কা হয়। সাধক মহাপুরুষ, তাঁহার আদেশ আমার পক্ষে দৈববাণীর ন্যায়; আপনার পরিচয়

না পাইলেও আমার ঘরেই আপনাকে রাখিব। কিন্তু আপনার পরিচয় দিলে বড়ই সুখী হইব।

বিন্ধ্যবাসিনী জীবনের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। অপ্রাপ্ত বয়সে শরৎচন্দ্রের সহিত বিবাহ, বিবাহের পূর্ব্বের স্নেহ: বিবাহের পরের অকৃত্রিম প্রণয়, শরৎচন্দ্রের পলায়ন, তাঁহার পত্র, এ সকলি বলিলেন। তারপর তাহার উন্মত্ততা—পিতার কঠোর ব্যবহার, গৃহত্যাগ, পথের কষ্ট, সকলি বলিলেন।

রজনী বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'আপনি এত ত্রস্ত হয়েছেন কেন? সময় মত অবশ্যই আপনাব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

বিন্দু।—জ্ঞানবুদ্ধিহীনা অবলা জাতি, কি বুঝে? এ পথে আসিলে এত কষ্ট পাইব, পূর্ব্বে জানিলে আমি এ পথে আসিতাম না।

রজনী বাবু।—আপনি যখন উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তখন আপনার কেমন বোধ হইত? এখন আপনাব আর কোন উদ্বেগ নাই?

বিন্দু।—তখনকার কথা বলিতে পারি না। কল্য সাধক আমাকে একটী ফল দিয়াছিলেন, সেই ফল খাইয়া অবধি একটু ভাল আছি: কিন্তু ক্রমেই যেন আবার কেমন কেমন বোধ হইতেছে।

রজনী বাবু।—আপনি ব্যস্ত হইবেন না। সংসার বিষময়। সুখই বা কি, দুঃখই বা কি? দুই সমান। দুঃখ যদি এত কষ্টদায়ক না হইত, তাহা হইলে সুখও এত সুখপ্রদ হইত না। যাঁহাবা অনবরত সুখ সম্ভোগে রত, তাঁহারা দুঃখের পর সুখ, কত সুখের, তাহা জানেন না। জগতে অন্ধকার না থাকিলে আলোকের এত আদর হইত না। অভাব না হইলে কোন বস্তুই মধুর বোধ হয় না। শৈশবে আমার জীবনতরী এক স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, জানিতাম না, উজানে তরী চালান কত কষ্টকর ব্যাপার। যৌবনে যাই তরী ভিন্ন স্রোতে ফিরিল, অমনিই হৃদয় যন্ত্রে আঘাত পাইলাম, বুঝিলাম, কষ্ট কি? ভাবিলাম দুঃখ ভিন্ন সুখ, সুখপ্রদ নহে। তাই বলি দুঃখই সুখ। আপনি দুঃখে পড়িয়াছেন, প্রকৃত সুখ আপনার। আর আমি? আর আমি যে এই ক্ষুদ্র তরী লইয়া সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, আমার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ নাই। ধন, জন, ঐশ্বর্য্য এ সকল থাকিতেও আমার মনে সুখ নাই,—সুখ নাই,—বাল্যকাল আব আসে না, জীবনের অন্ধকাবময় অংশ দিন দিন

নিকটবর্ত্তী হইতেছে। বাল্যকালে যে সুখ ছিল, তাহা এইক্ষণ নাই; যৌবনে যাহা ছিল, এইক্ষণ তাহাও নাই। গ্রন্থকার বলিয়াছেন,— সকলের সুখই সীমা-বিশিষ্ট। তুমি যতই কেন চেষ্টা কর না, নিয়মিত সুখের অধিক কখনই পাইবে না। কাহার সুখের সীমা নাই? শরৎ কাল,—শরৎসুন্দরীর শোভায় শোভান্বিত, কিন্তু এ শোভা কদিনের?—পক্ষান্তরে আবার অন্ধকার হইবে। ফুলের বাগানে কত শত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, অন্যের মন হরণ করিতেছে, কিন্তু এ শোভা কতক্ষণের, ক্ষণকাল পরেই আবার মলিন হইবে, ফুলের ঘ্রাণ বায়ুতে মিশাইবে। সংসার প্রান্তরের পথিক! তুমি বলিবে, আবার নূতন ফুল ফুটিবে। তাহাতে তোমার অধিকার কি? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও অগ্রসর হইতেছ, এ বাগানের ফুলের ঘ্রাণ তুমি আর কদিন ভোগ করিবে? দিন যাইতেছে, তুমিও অগ্রসর হইতেছ, এ বাগানের অন্য ফুলে আর তোমার অধিকার কি? অধিকার নাই—জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, কালের অবিশ্রান্ত গতি তোমাকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে? দেখ—তোমার যৌবন ফুল ফুটিয়া শুকাইয়া গিয়াছে, আর ফুটিবে না। সময়ের গতিতে মানুষ যে স্থান অতিক্রম করে, তাহা আর ফিরে না, ফিরে না—যে সময় অতীত হয়, তাহা আর নয়ন মনকে ভুলাইতে আসে না। কোথায় ছিলে, কোথায় আসিয়াছ, আবার কিছু দিন পরে কোথায় যাইবে? গত জীবন স্মরণ কর, সাবধান হও, বৃথা আশা করিও না; তুমি কি করিতে পার? ক্রন্দন করিলে কি হইবে,—অধৈর্য্য হইলে কি হইবে. তুমি সামান্য সীমাবিশিষ্ট মানব, তুমি কি করিতে পার? সৃষ্টির কৌশল কে বুঝিতে পারে? তবে আস্ফালন কর কেন? তবে গত সুখ স্মরণ করিয়া ক্রন্দন কর কেন? তবে যাহা গত হইয়াছে, তাহার দিক্ তাকাইয়া থাক কেন? ভ্রান্ত মানব! আর কত দিনে তোমার ভ্রম দূর হইবে?

রজনী বাবু দেখিলেন, বিন্ধ্যবাসিনীর চক্ষুর প্রান্তভাগ দিয়া অবিশ্রান্ত জল নির্গত হইতেছে। দেখিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, গত কথা স্মরণ করিলে যদি আপনার কষ্ট হয়, তবে আমি আর কিছুই বলিব না; আপনি সমস্ত বিস্মৃত হউন।

বিন্ধ্যবাসিনী বলিতে লাগিলেন,—অন্তরের দুঃখ বাহির হইলে দুঃখ উপশম হয়। সে সকল কথা স্মরণ না করিলেও অন্তর গুপ্তভাবে দগ্ধিয়া

যায়। হৃদয়ের কথা স্মরণ না করিলে যদি কষ্টের হ্রাস হইত, তাহা হইলেও বরং বিগত কথা গোপনে রাখিতাম; বিস্মৃত হইতে পারি না। গোপনে রাখিয়া দেখিলাম, কিন্তু তাহাতে যন্ত্রনার একশেষ, মাথার বেদনায় শরীর অস্থির।

রজনী বাবু শান্তনা বাক্য দ্বারা বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর মস্তিষ্ক উষ্ণতর হইল; উন্মত্তের ন্যায় নানা প্রকার প্রলাপ বাক্য বলিতে লাগিলেন।

রজনী বাবু মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন; বিন্ধ্যবাসিনী আবার বলিতে লাগিলেন,—কার জন্যে মনভৃঙ্গ হইলে চঞ্চল? ইচ্ছা হয় উড়ে যাও, নিবাতে অনল। আর যে সহেনা প্রাণে বিরহ যন্ত্রণা, পরপ্রেমে ভুলে মন. মিছে আর মজোনা॥—হায় জগদীশ্বর! অভাগিনীর প্রতি একটুও দয়া হলো না। দিনে দিনে কি ছিলেম, আবার কি হলেম? বিধাত! তোর মনে কি এই ছিল? আমার দশা কি হলো! উঃ প্রাণ যায়! থাক—থাক—থাক—হিঃ—হিঃ—আমি কাঁদিব কেন? একটী গান গাই—"সই—কেন আবার মনের আগুন জ্বলিলো।"

রজনীবাবু বিস্মিত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর সকল কথা শুনিতে লাগিলেন এবং ব্যবহার নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন—'পতিপরায়ণা সতী—নারীর চঞ্চল মন সাগরের জল, অল্পেই তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়—বিচ্ছেদানল ভয়ানক, একবার জ্বলিয়া উঠিলে নির্ব্বান হয় না,—স্ত্রী লোকের উন্মত্ততা—কি প্রকারে তিরোহিত হয়। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে নৌকা অনেক দূর চলিয়া গেল; সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকা গোবিন্দপুরের নদীর সম্মুখে আসিল। মাজীদের আহ্লাদে শরীর নাচিয়া উঠিল, তাহারা পরিচিত পথ দিয়া গোবিন্দপুরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। প্রায় এক প্রহর রাত্রিতে নৌকা গোবিন্দপুরের ঘাটে লাগিলে, রজনীবাবু উন্মত্ত বিন্ধ্যবাসিনীকে লইয়া বাটীতে উঠিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আরোগ্য।

রজনীবাবু গোবিন্দপুরে পৌঁছিয়া প্রাণপণ করিয়া বিন্ধ্যাবাসিনীর চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বিন্দুকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য লোক নিযুক্ত হইল; ভাল আহার, ভাল পরিচ্ছদ যোগান হইতে লাগিল, উপযুক্ত চিকিৎসক আসিয়া মস্তিষ্কের দোষ সংশোধন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য রজনীবাবু যথেষ্ট টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দপুরের সুস্নিগ্ধ জল বায়ুতে এবং চিকিৎসকের উৎকৃষ্ট ঔষধে বিন্ধ্যবাসিনী দিন দিন আরোগ্য হইতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্রকে ভুলিয়া গেলেন, দিন দিন তাঁহার উন্মত্ততার লক্ষণ তিরোহিত হইতে লাগিল।

রজনীবাবু বিন্ধ্যবাসিনীকে স্বীয় কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন; বিন্দুর রোগ আরোগ্য হইলে রজনীবাবুর বিমল আনন্দ হইতে লাগিল। তিন মাস পরে বিন্ধ্যবাসিনীর ব্যমহ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল; এই তিন মাসের মধ্যে এক দিনও শরৎচন্দ্রের কথা মনে উঠে নাই।

এক দিন বিন্ধ্যবাসিনী রজনীবাবুর বাটীর একটী নির্জন কামরায় হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। সে ঘরে দুইটী মাত্র দ্বার, একটী নিকটবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানের দিকে, অপরটী অন্তঃপুরের দিকে। বিন্ধ্যবাসিনী প্রথম-বাতায়নে বসিয়া চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলেন।

দেখিলেন, বাগানটী অপূর্ব্ব, চতুর্দ্দিকে নানা রকমের বৃক্ষের সারি, মধ্যে একটী পুকুর। পুকুরে অনেক পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, ভৃঙ্গগণ অভিমান সহকারে সঞ্চিত মধু চয়ন করিতেছে,—সরোজিনীর মনপ্রাণ কাড়িয়া লইয়েছে। জলে মৎস্যগণ ক্রীড়া করিতেছে, সাঁতার দিতেছে, আহ্লাদে পুকুরের জল নাচাইতেছে। জল অভিমান-শূন্য হইয়া নাচিতেছে, এক তরঙ্গে অন্য তরঙ্গ প্রহত করাইয়া তাহাদের হর্ষ বৃদ্ধি করিতেছে। জল বিলোড়িত হইতেছে, শৈবালসমূহ তৎসঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হইতে হইতে এক ধারে সরিয়া যাইতেছে। নলিনীগণ জলের সহিত হেলিয়া

দুলিয়া নৃত্য করিতেছে, ভ্রমরগণ তাহাদিগকে মানিনী বলিয়া উপেক্ষা করিতেছে, নিকটে যাইতেছে না। কিয়ৎক্ষণ পর বিন্ধ্যবাসিনীর দৃষ্টি দ্রব্যান্তরে পড়িল। তিনি দেখিলেন, বৃক্ষগণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে দুই একটী পাতা বৃক্ষ হইতে খসিয়া মাটীতে পড়িতেছে। অজ্ঞাতে শীতল বায়ু মৃদু মৃদু ভাবে বৃক্ষগণের মধ্য দিয়া চলিতেছে, তাহাতে পল্লব সমূহ কম্পিত হইতেছিল; বিকম্পিত পল্লবপুঞ্জের প্রতিঘাতে এক প্রকার শব্দ হইতেছিল, আর সেই শব্দে দূরবর্ত্তী নির্জ্জন কলকণ্ঠের মধুর স্বর মিশিয়া আশ্চর্য্য ধ্বনি উৎপন্ন হইতেছিল! সেই শব্দ লইয়া বায়ু আসিতে আসিতে আবার বিন্দুর শরীরে বিলীন হইতেছিল,—নিঃস্বার্থভাবে আবার দূরবর্ত্তী পুষ্পনিচয়ের সুঘ্রাণ আনিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইতেছিল! ফুলের গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রে অজ্ঞাতভাবে প্রবেশ করিতে লাগিল; সুস্বর-সংযুক্ত মলয়ানিল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল; রমণীয় বিচিত্র শোভাবিশিষ্ট কত প্রকার দৃশ্য আসিয়া চক্ষুর দৃষ্টিকে অজ্ঞাতসারে অবরুদ্ধ করিতে লাগিল! এ সকলই বিন্ধ্যবাসিনী ভুলিলেন; সহসা তাঁহার মনে চিন্তার বেগ উত্থিত হইল, তাঁহার মন অন্যদিকে ধাবিত হইল, মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের ঐক্য না হইলে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয় না; তাঁহার মন অন্য দিকে, সুতরাং সকলই বিস্মৃত হইলেন। ভাবিতে ভাবিতে আরো ভাবিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল; ইচ্ছা অপূর্ণ অবস্থায় হৃদয়ে বিলীন হইল না, আবার ভাবিতে লাগিলেন,—গাছ—ভৃঙ্গ-পদ্ম-কোকিল। আবার এক দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়াও মন ভাবনা ছাড়িল না, আবার ভাবনা উঠিল, বসন্ত, মলয়ানিল, আবার কোকিল। মন তৃপ্ত হইল না; আবার ভাবিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল।

মন তৃপ্ত হইতেছেনা, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কেন তৃপ্ত হইতেছেনা? দেখিতে দেখিতে নয়ন তৃপ্ত হইল; সুস্বর শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধির হইল, সুঘ্রাণে সুঘ্রাণে নাসিকা আস্বাদন শক্তি হইতে বঞ্চিত হইল, ভাবিতে ভাবিতে মন নিস্তেজ হইল, কিন্তু তবুও পোড়া মন তৃপ্ত হয় না। তৃপ্ত হয় না কেন? বিন্ধ্যবাসিনী বুঝিতে পারিলেন না; বুঝিতে পারিলে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিত না; আবার ভাবনার তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া, আন্দোলিত হইতে লাগিলেন।

দিবা অবসান হইয়া আসিল। সূর্য্যদেব আরক্তলোচনে পশ্চিম-শেখরে আরোহণ করিয়া, তদীয় গম্ভীর ভাব জগতে প্রচার করিতে লাগিলেন। রশ্মি উজ্জ্বল অথচ মলিন; তীক্ষ্ণ অথচ কোমল; উত্তপ্ত অথচ শীতল, আলোকময় অথচ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া পৃথিবীস্থ সকলকে মাতাইতে লাগিল। অস্তমিত সূর্য্যের সেই রশ্মি, বৃক্ষগণকে অতিক্রম করিয়া পুকুরে পড়িল, পুকুর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সরোজিনীগণ, সেই রশ্মিতে শোভিত হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মৎস্যগণ জলের উপরে উঠিয়া সাঁতার দিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বলতা আরো মলিন হইয়া আসিতে লাগিল; পৃথিবী সময়ানুসারিণী সাজে সজ্জিত হইল।

বিন্ধ্যবাসিনী একাগ্রমনে দেখিতে লাগিলেন, সূর্য্যের শেষরশ্মি জলের উপরে ছড়াইয়া পড়িতেছে; জল ঈষৎ পবনে বিকম্পিত, সেই কম্পিত জল মুক্তা সদৃশ টলমল করিতেছে। হঠাৎ এভাব তিরোহিত হইল। গোধুলি উপস্থিত! পৃথিবী দুঃখের সাজ পরিল। পঙ্কোজিনী মলিন হইল। পুকুরের আনন্দ-লহরী জলে বিলীন হইয়া গেল। গম্ভীর ভাব চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতে লাগিল। পক্ষীসকল হঠাৎ একবার কলরব করিয়া আবার নিস্তব্ধ হইল। জগৎ নীরব, প্রকৃতি দেবীর শান্তি কোথায়ও ভঙ্গ হইতেছে না। বিন্ধ্যবাসিনীর মনে কি ভাব উপস্থিত হইল, তিনি গাইতে লাগিলেন—'দীনদয়াল, কোথায় তুমি। একবার এসে দেখ প্রভু, যে দুঃখে দিন কাটাই আমি।'

গীত সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল। দাসী অজ্ঞাতসারে ঘর আলোকময় করিয়া চলিয়া গেল। রজনী বাবু সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিতে করিতে বিন্ধ্যবাসিনীর সুমধুর স্বর শুনিতে পাইলেন। তিনি নিস্তব্ধভাবে পাদনিক্ষেপ করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী ফুলের ঝোপের মধ্যে অপ্রকাশিত ভাবে দাঁড়াইলেন!

সঙ্গীত সমাধা হইল; বিন্ধ্যবাসিনী প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—'জগৎজীবন! দাসীর সাধ মিটালে না? দিনে দিনে দিন চলিল, কিন্তু অন্তর অদ্যাবধিও পরিশুদ্ধ হলোনা, পাপলিপ্সা হৃদয় হইতে তিরোহিত হলোনা, তোমার নিকটে কতবার কাঁদ্‌লেম, কিন্তু জন্মদুঃখিনীর প্রতি সদয় হলে না! জগদীশ! আমার এ শুষ্ক হৃদয় লইয়া প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে

থাকাতে আর ফল কি? দয়াময়! অধিনীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেও করিলে না, আমার মনকে ফিরাইয়াও ফিরাইলে না। দুঃখে দিন গেলেও যদি এ মন অসুখী হতো, তা হলেও মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম; কিন্তু কই তাত হয় না! তবে আমার এত কষ্ট কেন? নাথ! তবে তোমার প্রতি মন ধাবিত হয়না কেন? সংসার সেবার অনুরোধে তোমাকে ভুলিয়া যাই কেন? তোমাতে যে সুখ-প্রস্রবণ রহিয়াছে, তাহাতে নিমগ্ন না হইয়া পাপ-পঙ্কযুক্ত সংসার সলিলে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া সুখী হই কেন? সংসারে সুখ নাই, ইহা কতবার প্রত্যক্ষ করিলাম, তবু মন ভুলে কেন? দীনবন্ধু! দীনার আর উপায় নাই. তুমিই একমাত্র ভরসা।'

বিন্ধ্যবাসিনীর বাক্য অস্ফুট হইয়া আসিল। হৃদয়ের প্রেম উৎস সজোরে ধাবিত হইল। বাক্য সীমাবিশিষ্ট সুতরাং বাক্যের অতীত ভাব প্রকাশিত হইল না। বিন্ধ্যবাসিনী অবনত হইলেন. মুদিত নয়ন হইতে অবিরল ধারে প্রেম উৎস ঝরিতে লাগিল। রজনীবাবুও সেইখানে বসিয়া নির্জ্জন স্থানের গম্ভীরতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

এদিকে সংসার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। আকাশে নক্ষত্রগণ চন্দ্রমার সহিত দেদীপ্যমান হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। কোমল জ্যোতি সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়া পড়িল। দিনের উজ্জ্বল, উত্তপ্ত, প্রখর সূর্য্য-কীরণের পরিবর্ত্তে, পবিত্র, শীতল, কোমল চন্দ্রের জ্যোতি প্রকাশ পাইতে লাগিল, পৃথিবীর শরীর জুড়াইল। কত শত অনির্ব্বচনীয় শোভা ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হইয়া জগতের মনকে ভুলাইতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে বিন্ধ্যবাসিনীর চক্ষু উন্মীলিত হইল; চন্দ্রের প্রতিভা তাঁহার নয়ন সন্মুখে পতিত হইল, হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। গত কথা একে একে সকলই তাঁহার স্মরণ-পথে পড়িতে লাগিল; অভাব-পূর্ণ হইল; হঠাৎ বলিলেন—'এই কি শরৎচন্দ্র?'

'শরৎচন্দ্র' নামটী মধুর বোধ হইল না। নামটী মনে পড়িতে পড়িতেই তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। রক্ত ধমনীর মধ্যে ধড়ফড় করিয়া উঠিল। নাম বিস্মৃত হইয়া যে সুখ পাইতেছিলেন, তাহার সহিত তুলনা করিতে লাগিলেন; সুখ আয়ত্ত হইল না। নামটী ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন হইতে অপসৃত হইল না, অপসৃত হইল না—

বিন্দুর প্রধান অভাব পূর্ণ হইল। বিন্দুর শরৎচন্দ্র পুন বিন্দুর হৃদয়ে স্থান পাইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সমদুঃখিনী।

মালতী দেবী এইক্ষণ পরিচারিকা। দস্যুদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় এবং মকর্দ্দমার আশঙ্কায় বকাউল্লা মাজী মালতীদেবীকে বিক্রয় করে। যেখানে দস্যু কর্ত্তৃক জগদীশ বাবুর নৌকা লুন্ঠিত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে দুই প্রহর অন্তরে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্রয় করেন। হরগোবিন্দ গোবিন্দপুরের কাছারির নায়েব; মালতী দাসীকে বাড়ীতে রাখিলে লোকে মন্দ বলিবে, এই ভয়ে তিনি তাঁহাকে কাছারিতে আনিয়া রাখেন। মালতী দেবীর রূপ দেখিয়া অনেকেই বলিত—'ভদ্র বংশীয়া কুলবধূ দৈব বিপাকে দাসী হইয়াছে।' সপ্তম অধ্যায়ে এক স্থানে যে দাসীর কথা উল্লেখ হইয়াছে, ঐ দাসীই হরগোবিন্দের ক্রীতা দাসী মালতী; মালতী স্বীয় অবস্থার কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট খুলিয়া বলেন নাই. কেহ এপর্য্যন্ত ভাল করিয়া শুনিবার জন্য আগ্রহও প্রকাশ করে তাই।

একদিন আহারান্তে বিন্ধ্যবাসিনী বসিয়া একখানি পুস্তক পড়িতেছিলেন, দাসী আসিয়া বলিল—'ঠাকুরণ! আপনার এ প্রকার ভাব দেখি কেন? সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকেন, মুখে হাসি নাই, যেন কোনতাতেই সাধ নাই। আপনি এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী, আপনার প্রকৃত সুখের সময়,আপনি এত মলিন ভাবে দিন অতিবাহিত করেন কেন?

বিন্ধ্যবাসিনী দাসীকে অশ্রদ্ধা করিতেন না; স্বীয় অবস্থায় কাহাকেও অশ্রদ্ধা করিতে দিত না, বলিলেন—আমি কাঙ্গালিনী, তাই এই প্রকার মলিন ভাবে দিন কাটাই।

দাসী উত্তর করিল—আমার নিকটে প্রবঞ্চনার আবশ্যক কি? 'বলিব না,' বলিলে আমি আর দ্বিতীয়বার কথা বল্‌তাম না।

বিন্ধ্যবাসিনী।—তোমাকে বলিলে তুমি বিশ্বাস করিবে কেন? আমি

এই অট্টালিকার মধ্যে আছি, রজনী বাবু আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তুমি মনে ভাবিতে পার, আমিই প্রকৃত সুখী; বাস্তবিক আমার জীবনের কথা যে জানে, সেই বুঝিতে পারে, আমার ন্যায় দুঃখিনী আর নাই। বিগত কথা স্মরণে বিন্ধ্যবাসিনীর নয়ন জলে বক্ষ প্লাবিত হইল।

দাসী বলিল।—আপনার বিগত কথা স্মরণ করিলে হৃদয়ে যদি কষ্ট হয়, তবে আর বলিবেন না। দেখুন, আমার ন্যায় হতভাগিনী আর নাই; আমি পূর্ব্বে বা কি ছিলাম, এক্ষণে বা কি হয়েছি! কিন্তু কি করিব, অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কে খণ্ডন করিবে?

বিন্ধ্যবাসিনী পরিধেয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন—তোমার কথা শুনে বোধ হলো, তুমিও আমার ন্যায় হতভাগিনী; তোমার জীবনের কথা বলিতে যদি বাধা না থাকে, তবে বল, আমার হৃদয় সমদুঃখিনীর কথায় শীতল হইবে।

দাসী স্থির ভাবে আপনার জীবনের সকল কথা খুলিয়া বলিল। হৃদয়ের স্তরে স্তরে যত দুঃখের কথা সঞ্চিত ছিল, দাসী তাহা বলিল। বিন্ধ্যবাসিনী দাসীর কথা শুনিয়া অপ্রতিভ হইলেন; পূর্ব্বে ধারণা ছিল, তাঁহার ন্যায় দুঃখী আর জগতে নাই; দাসীর কথা শুনিয়া সে ধারণার ভ্রম দূর হইল; বুঝিলেন, সমদুঃখিনীর সংখ্যা এই পৃথিবীতে বিরল নহে;—বুঝিলেন, তিনি যে আগুনের অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছিলেন, দাসীর হৃদয়ে তদপেক্ষাও বিষের আগুন জ্বলিতেছিল, বুঝিয়া, আপন জীবন-কাহিনী দাসীর নিকট বলিলেন। দাসী ও বিন্ধ্যবাসিনী, উভয়ের অবস্থাই একপ্রকার, সুতরাং উভয়ে উভয়কে পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করিল। ভালবাসার মূল-বীজ উভয়ের মধ্যে রোপিত হইল;—উভয়ের জীবন উভয়ের জীবনের শান্তনা স্বরূপ হইল।

মালতীদেবী বিন্ধ্যবাসিনীর জীবনের সকল কথা শুনিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—ঈশ্বর, তোমার বিচিত্রলীলা কেহই বুঝিতে পারে না। তুমি এক স্থানে সুখ দুঃখ দেখিয়া সুখী হও। পদ্মকে এত কোমল করিয়াও তাহাতে আবার কণ্টক সৃজন করিয়াছ, চন্দ্রকে এত পবিত্র করিয়াও তাহাতে আবার কলঙ্কের রেখা রাখিয়াছ। আমরা অবলা, জ্ঞানহীনা, তোমার বিষয় কি ভাবিব?

বিন্ধ্যবাসিনী আর কথা বলিলেন না। অতি অল্প সময়ের ভিতরে

উভয়ের মধ্যে গাঢ় ভালবাসা জন্মিল। মালতী দেবী বুঝিলেন, যে শরৎ-চন্দ্র নৌকায় দস্যুদিগের হস্তে পড়িয়াছিলেন, তিনিই বিন্দুর প্রাণ-পতি, বুঝিয়াও কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই; মনের আগুনে মনেই পুড়িতে লাগিলেন। দুঃখিনী বিন্দু জীবনের আর এক অধ্যায় অতিবাহিত করিবার একটী অবলম্বন পাইলেন; সে অবলম্বন—এই মালতী।

নবম পরিচ্ছেদ।

কলঙ্ক-রেখা।

কুক্ষণে রজনী বাবু পথহারা হইয়া দিগন্তব্যাপিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর আশ্রয় লইয়া, সাগর সন্নিহিত বনরাজি অতিক্রম করিয়া, প্রদোষ-কালে, সেই পরোপকার-রত, নির্ম্মলচিত্ত মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন; কুক্ষণে হতভাগিনী, কালসর্পিনী সদৃশ বিন্দু তাহার নৌকায় পা তুলিয়াছিলেন। আর অনাথা মালতী? হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী কুক্ষণে সংসারের গরল অর্থদ্বারা ক্রয় করিয়া রজনী বাবুর ঘরে সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মালতী দেবীর গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। গোবিন্দপুরের সমস্ত লোক রজনী বাবুর বিরোধী হইয়া উঠিল। দূরস্থ আত্মীয় স্বজন, যাহারা সবিশেষ ঘটনা জানিত না, তাহারাও রজনী বাবুর প্রতি সন্দেহ-যুক্ত পত্রে তিরস্কার বর্ষণ করিতে লাগিল। ভদ্রলোক হইতে ইতর প্রজা পর্য্যন্ত, সকলেই তাঁহার পবিত্র, পরোপকার-রত চরিত্রে কলঙ্ক অরোপ করিতে লাগিল। রজনী বাবু ক্ষণকালের জন্যও স্বীয় চরিত্রের প্রতি দোষারোপের ভার বহনে বিরক্ত হয়েন নাই; অম্লান বদনে লোকের ঠাট্টা, তিরস্কার এবং গঞ্জনা সহ্য করিতে লাগিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনীর নিকটে রজনী বাবু যে দিন মালতীদেবীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাকে দাসীর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ভদ্রমহিলার ন্যায় থাকিতে বলেন, এবং সেই দিন হইতেই ভদ্রভাবে মালতীদেবীর সহিত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কুসংস্কারাবৃত দেশ, সহসা পূর্ব্ব ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া রজনী বাবুর প্রতি ঘোর সন্দেহযুক্ত হয়; সেই সন্দেহ মালতী দেবীর পুত্র প্রসবের পর, ঘোরতর

কালিমাময় রূপ ধারণ করিল। স্বীয় ক্রটীতে এই সকল কার্য্য ঘটিতেছে, দেখিয়া, হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ক্ষুণ্ণচিত্ত হইলেন, তিনি জানিতেন, রজনীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র; তিনিই মাত্র জানিতেন, মালতীকে ক্রয় করিবার সময়ে তাঁহার গর্ভাবস্থা ছিল। কিন্তু তাঁহার কথা কে বিশ্বাস করিবে? তিনি রজনী বাবুর আশ্রিত, বেতনভোগী কর্ম্মচারী; তাঁহার সত্য কথায় কাহার সন্দেহ দূর হইবে? অল্পকাল মধ্যে দেশ শুদ্ধ লোক রজনী বাবুর প্রতি খর্গ-হস্ত হইয়া উঠিল। অনেকে রজনী বাবুকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টায় রত হইল।

ধীশক্তি-সম্পন্না মালতী অন্তঃপুরে থাকিয়াই রজনী বাবুর আশু-বিপদের কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন,—বুঝিলেন, "এই দুঃখপূর্ণ পৃথিবীতে হতভাগিনী মালতীদেবীর দ্বিহস্ত পরিমিত একটু স্থানই রজনী বাবুর এই বিপদের হেতু। কে ইচ্ছা করিয়া স্বীয় কর্ম্মোচিত পাপের ফল কিম্বা অদৃষ্টনেমির দুরপণেয় কলঙ্কের অংশ অন্যের মস্তকে অর্পণ করিয়া সুখে সময়াতিপাত করিতে পারে? কে স্বীয় জীবন ধারণে অন্যের মহা বিপদ দেখিয়া অক্ষুব্ধ হৃদয়ে সংসারে তিষ্ঠিতে পারে? যে পারে, সে রমণী নহে, সে এই বিদ্যা-বিশারদ, নীতি-শাস্ত্রজ্ঞ, পরদুঃখে-কাতরা, নিরপরাধিনী, পতী শোকে-বিহ্বলা মালতী দেবী নহেন; সে এই অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনের দুঃখ তরঙ্গ-গণনাকারিনী, অতল জলদগম্ভীরা মালতী নহেন। মালতীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; যে মন মুহুর্মুহু দস্যু-অত্যাচারেও অটল ছিল, সেই অটল মন আজ পরদুঃখে গলিয়া গেল। মালতীদেবীই রজনীবাবুর এই পবিত্র স্বভাবের কালিমা—একথা মালতীর হৃদয়ে শেল-স্বরূপ বিদ্ধ হইল।

মালতী দেবী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"স্ত্রীলোকের মন দর্পণ-স্থিত স্বচ্ছসলিলবৎ চঞ্চল। যে মনে দুঃখের লহরী মৃদু মৃদু ভাবে, অজ্ঞানিত রূপে, অপ্রকাশ্য ভাবে বিলীন না হইল, সে মন রমণীর। যে প্রজ্জলিত হুতাশন হৃদয়-ভস্মে দীর্ঘকাল আবরিত থাকিয়া, অলক্ষিত ভাবে নির্ব্বাপিত না হইল, সে প্রজ্জলিত হুতাশন রমণীর হৃদয়ে! কি অপরিণামদর্শিতা! হৃদয়ের অগ্নি কি জন্য বাহির করিলাম? যে শরীর অনন্ত সময়-স্রোতে মিশিয়া যাইবে—সেই শরীরের মায়ায় আমি এই ক্ষুদ্র অনলকণা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপ্রচ্ছন্ন ভাবে পতিন্দপ জপ করিতে করিতে, জীবনস্রোতের এক ক্ষুদ্রতম প্রবাহও কাটাইতে পারিলাম না? ধিক আমাকে! ধিক আমার মনকে! দুঃখের

কথা বাহিরে কেন প্রকাশ করিলাম? কেন দাস-ব্রত পরিত্যাগ করিয়া আবার সুখের অনুসরণ করিলাম? এই দুরপণেয় কলঙ্ক বিদূরিত হইবে না। আজ ইচ্ছা করিলে এই সংসারকে পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু রজনী বাবুর এ কলঙ্ক চিরকাল থাকিবে। আমার কথা কে বিশ্বাস করিবে? করিলে, আজ জগতে স্বীয় জীবনের পরীক্ষা দিতে কুণ্ঠিতা হইতাম না; কিন্তু আমি হতভাগিনী—আমার কথা কে শুনিবে? হৃদয় বিদীর্ণ হয় না কেন? নিরপরাধী নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের আদর্শ রজনী বাবু! তাঁহার চরিত্রে রোষারোপ,—প্রাণ, এখনও রয়েছ কেন? সরলা বিন্দু সংসারের কিছুই বুঝে না। অপ্রচ্ছন্ন ভাবে কতলোক আসিতেছে, কতলোক যাইতেছে, মনের কথা সকলকেই খুলিয়া দিতেছে। কতদিন বারণ করিয়াছি, তা শুনে না; সংসার বিন্দুর সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

দুঃখিনী বিন্ধ্যবাসিনী দিন গণে, মাস গণে, কবে সাধক আসিবেন? কবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে? রজনী বাবুর এই প্রকার বিপদের সময় বিন্দুর হৃদয় মন অস্থির হইল; সংসারে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ইচ্ছা হইল না; কি করেন, সাধক বলিয়াছেন,—"আত্মহত্যা মহাপাপ" সেই কথা হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। এতদিন মালতীর সহিত সদালাপে মন সুস্থ ছিল, এই ঘটনায় উভয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মালতীদেবী বিন্ধ্যাবাসিনীকে মনের সাধ ভরিয়া তিরস্কার করেন, বিন্দু ঘাড় পাতিয়া সকল দোষ নিজের মাথায় লয়, একটুও কুণ্ঠিত হয় না; তবু মালতীর মন সুস্থ হয় না; বিন্দু আবার দিন গণে। এই রকম করিতে করিতে এক বৎসর পূর্ণ হইল। এই এক বৎসরের মধ্যে রজনী বাবুর মন এক দিনের জন্যও বিরক্ত হয় নাই; মস্তক পাতিয়া সকল নিন্দা, তিরস্কার মাথায় লইয়াছেন। এক বৎসর পূর্ণ হইল, বিন্ধ্যবাসিনী এবং মালতী সাধকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; মনে মনে ভাবেন, সাধক আসিলে রজনী বাবুর এই কলঙ্ক অপনীত হইবে। এক বৎসর পূর্ণ হইয়া সপ্তাহ হইল, তবুও সাধক আসিলেন না; বিন্ধ্যবাসিনী আবার উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন; রজনী বাবু একটু বিস্মিত হইলেন।

সাধকের আসিতে বিলম্ব হইল, কিন্তু দিন বসিয়া থাকিল না, পৃথিবী অনবরত আবর্ত্তিত হইয়া দিনের উপর দিনের লীলাখেলা দেখিতে লাগিল।

এই রূপে এক মাস গত হইলে, সাধক আসিয়া সহসা উপস্থিত হইলেন। যখন সাধক আসিলেন, তখন ঘোরতর বিপদ-সাগরের এক ভীষণ তরঙ্গ উঠিয়া রজনী বাবুকে, মালতীদেবীকে এবং বিন্ধ্যবাসিনীকে সংসারের বিভিন্ন প্রণালীতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। সাধক মহাচেষ্টা করিয়াও, তরঙ্গের বেগ থামাইয়া, আবার সকলকে একত্রিত করিতে সমর্থ হইলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রণয় নহে! প্রেম।

চিরদুঃখিনী নীরদার জীবনের দুই অধ্যায় পর্য্যালোচনা করিয়াছি, তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁহার মনের অবস্থা কি প্রকার?

সংসারে ফুল ফুটে কেন? জড়-প্রকৃতি পরমাণু সংঘটনে সৃষ্ট, পরমাণু-সম্মিলনে মৃত্তিকার আভ্যন্তরীণ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইল, সেই বৃক্ষে ফুল ফুটিল; কোন ফুলে আবার বীজ অঙ্কুরিত হইল, কোন ফুল অসময়ে ফুটিয়া মলিন হইয়া মাটীতে মিশাইল। মানবের সুকোমল করস্পর্শে অসময়ে যে ফুল প্রস্ফুটিত হয়, সে ফুলের কথা বলিতেছি না। যে ফুলে করের স্পর্শ হয় নাই, যে পুষ্পে ভ্রমর গুঞ্জরিয়া মধুচয়ন করে নাই, সেই ফুল পরীক্ষা করিয়া দেখ, বুঝিবে—সকল ফুলে ফল উৎপন্ন হয় না; একটী শুকায়, একটীতে ফল হয়, একটী ভূতে মিশায়, একটী স্থায়ী হইলে বীজ উৎপন্ন করে। এই যে দুই রকমের ফুল আমরা দেখিতে পাই;—ইহারা ফুটে কেন? আমরা বলি, একটী ফুটে সংসারের উপকারের জন্য; একটী ফুটে স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য, এ দুইটী ফুলেরই সুখ আছে, দুইটীরই বাসনা পূর্ণ হয়। যে ফুলটী অকালে শুকায়, সেটী দেবার্চ্চনায় লাগে, আর যেটী ফল উৎপন্ন করে, সে কখনও দেব-অঙ্গে শোভা পায় না। কোন ফুলটীর জন্ম সার্থক, আমরা জানি না।

হংসে ডিম পাড়ে। কিন্তু সকল ডিমে বাচ্ছা হয় না, কতকগুলিন নষ্ট হইয়া যায়, মানুষে খায়; কতকগুলি ফুটিলে বাচ্ছা বাহির হয়। এই দুই প্রকার ডিমের মধ্যে কোন গুলিকের জন্ম সার্থক, আমরা জানি না।

জড়জগৎ ছাড়িয়া জীবজগতে প্রবেশ করিলেও দেখা যায়, এখানে ফুল ফুটিলে ইতর প্রাণীগণের সম্মিলিত হইবার রীতি আছে, কিন্তু সে নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত সময়ে। অসময়ে রিপু চরিতার্থ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ইতর জন্তুগণের মধ্যে নাই।

মানব-চরিত্রে সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। মানব জীবশ্রেষ্ঠ, উচ্চ প্রবৃত্তি এবং সদ্‌গুণে ভূষিত, ফুল ফুটিবার বিলম্ব ইহাদের সহ্য হয় না; অসময়ে ফুটাইয়া যথারীত্যনুসারে রিপু চরিতার্থ করাই যেন ইহাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

ফুল ফুটে, উপযুক্ত সময় হইতে অস্ফুট থাকে না, কিন্তু ফুটে কি জন্য? অন্যের সেবার জন্য, না ফল উৎপন্ন করিবার জন্য? ফল উৎপন্নের পরমাণু সমষ্টি মিলিত হইবার নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত আছে; সেই সময়ে যাহা হইবার হউক, আপত্তি নাই। উপযুক্ত সময়ে স্ত্রী পুরুষের মিলনকে আমরা দোষের বলিতেছি না; কিন্তু যখন তখন মানুষ কেন রিপুর অপব্যবহার করিবে, আমরা বুঝি না। প্রকৃতির অপরিহার্য্য নিয়মের দোহাই আমরা বিশ্বাস করি না; অযথা পরমাণু পরিচালনার জন্য ঈশ্বর মানবের রিপুকে সৃজন করেন নাই। অভ্যাস প্রযুক্ত মানব স্বীয় বেগ সম্বরণ করিতে পারে না; সে দোষ কি ঈশ্বরের?

দুর্ব্বল মনের ধারণা অনুসারে, আধুনিক লোকের বিশ্বাস এই, প্রস্ফুটিত ফুলে পরমাণু না মিশাইলে ফুল অসময়ে মলিন হইয়া, অস্তিত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে। না—বিশ্বাস এ প্রকার নহে। এ প্রকার বিশ্বাস হইলে আমরা বলিতাম, মলিন হয় হউক, অযথা পরমাণু মিলনের প্রয়োজন কি? সমাজ-বিজ্ঞানের দাসদিগের বিশ্বাস—ফুল ফুটিলেই পরমাণু মিশিবে। চির-অভ্যাস প্রযুক্ত দুর্ব্বল মনের অসার কথা, আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বলি, অভ্যাস যদি এই স্থানে ক্রীড়া না করে, তবে ফুল ফুটিয়া বায়ুতে মিশাইবে, পরমাণু গ্রহণ করিবে না। কিম্বা পরমাণু দূরে রাখিয়া দেখ, সে ফুল অন্যান্য গুণ হইতে বঞ্চিত না হইয়া, অনায়াসে পূর্ণ সৌরভ বিস্তার করিয়া চলিয়া যাইবে, পরমাণু মিশাইবার জন্য ফুলের একটুও চেষ্টা হইবে না। সংসারে শুনিতে পাই, মানবের যৌবন কাল অতি ভয়ানক; পুস্তকে পাঠ করিয়া থাকি, এই সময়ে হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ইহার এক মাত্র কারণ, অভ্যাস। এই অভ্যাস প্রযুক্তই লোক

মত্ত হইয়া দিক্-শূন্য হয়। যে যুবক কখনও সংসারের চিত্র দেখে নাই, সে যুবকের স্বভাব পরীক্ষা কর, দেখিবে, তাহার মত্ততা নাই, তাহার প্রস্ফুটিত যৌবন উজ্জ্বল শোভা বিতরণ করে, কিন্তু মানুষকে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য করে না।

মানব মনে যে সকল বৃত্তি সৃজিত হইয়াছে, সে সকলের উপযুক্ত পরিচালনা হওয়া আবশ্যক, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু অবস্থাভেদে, সকল জীবনে সকল বৃত্তির সমপরিচালনা না হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে বৃত্তি বিশেষের পরিচালনা অধিক পরিমাণে হইলে, অন্য বৃত্তির পরিচালনা আদৌ না হইলেও কোন কষ্ট হয় না। বৃত্তির সহিত রিপুদিগের সংশ্লিষ্ট মিলন; সুতরাং রিপু সম্বন্ধেও ঐ এক কথা।

বিবাহের উদ্দেশ্য দুইটী—প্রথমত, একটী বৃত্তির পরিচালনা, দ্বিতীয়ত, রিপুর চরিতার্থ সাধন। এই দুইটীর মধ্যে একটী প্রধানতর হইলে অন্যটীর অস্তিত্ব লোপ পায়। কামুক প্রেমের ধার ধারে না, প্রেমিক কামের নির্যাতন কি, বুঝেন না। প্রেম যে বিবাহের উদ্দেশ্য, সেই বিবাহই বিবাহ। আবার অন্যদিকে, পুরুষ স্ত্রীর নিকটে প্রেম শিক্ষা করে; যে মানবের এই প্রেম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তৃত হয়, সে মানব প্রেম-বিহ্বল, রিপু-শূন্য—মহাদেব। কামরিপু যাহাদের উপর একাধিপত্য প্রভুতা বিস্তার করিয়াছে, আমরা তাহাদের উদাহরণ গ্রহণ করিব না, কারণ তাহারা প্রায়ই প্রেম-শূন্য; যাহাকে বিশুদ্ধ প্রেম বলে, তাহা কামুক লোকদিগের মধ্যে নাই। যাঁহারা, প্রেমিক, তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—দেখিবে, প্রেমের বিমল জ্যোতিতে তাঁহারা চিরকাল কাম-শূন্য হইয়া থাকিতে পারেন। আমাদের কথার প্রমাণ চাও—যিশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য এবং ম্যাট্‌সিনির জীবন অধ্যয়ন কর। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেমিক জীবনে রিপুর অতি অল্পই বিকাশ হয়।

প্রেম শূন্য-জীবন পাশব জীবনে তুলনীয়। ইতর প্রাণীগণ এবং জীবশ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে প্রভেদ এই, পূর্ব্বোক্ত জীব সকল প্রেমশূন্য, বৃত্তিশূন্য; মানব প্রেমের জন্য লালায়িত, বৃত্তি সকলের সম্যক বিকাশ ইহাদের অঙ্গের ভূষণ। যদি কম্‌টীর মত অনুসরণ করিয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিকে ছাড়িয়া, স্ত্রীর নিকট প্রেম শিক্ষা করিবার জন্য, এই মানব জন্ম অন্যের করে সমর্পণ করিয়া থাক, তাহা হইলে অপ্রশংসা করি না, নব্যপাঠক, বিবাহ কর, সুখী হও। কিন্তু যদি কেবল পাশব রিপুর দাস হইয়া তাহাই চরি-

তার্থ করিবার জন্য; অর্দ্ধ পরিস্ফুট রমণীর সহিত মিলিত হইয়া থাক,—তবে সাবধান,—তোমাদের বিবাহের আবশ্যক নাই; দেশ হইতে সতীত্ব উঠাইয়া দেও, পশুর ন্যায় বিচরণ করিয়া রিপু চরিতার্থ কর। জাতীয়জীবন অন্ধকারে ডুবে, ডুবুক, কি আছে? সমাজ উশৃঙ্খল হয়, তাতে তোমাদের কি? তোমাদের কি সে চিন্তা আছে? রিপুর উত্তেজনার পরিণাম যে বিবাহ, সে বিবাহ বিবাহই নহে, তাহা পশুবৃত্তি। আর যদি মনুষ্যত্ব চাও, তবে প্রেম-শিক্ষাকে জীবনের ব্রত—প্রেম শিক্ষাকে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কর, অর্দ্ধ মানবী এবং অর্দ্ধ পুরুষের সম্মিলনে পূর্ণ মানবের অবয়ব সৃজন কর, উপযুক্ত সময়ে পরমাণুতে পরমাণু মিশিয়া যাইবে; জগতের ভাবী বংশ ধ্বংশ হইবে না। আর না হয়, তুমি সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা বুঝিয়াছ—সংসারের অপরিহার্য্য বিষময় রীতিনীতি শিক্ষা করিয়াছ, বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা নাই? পৃথিবী ভরিয়া অনুসন্ধান কর, প্রেমশিক্ষার স্থান সীমাবদ্ধ নহে। আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী, বৃক্ষে ফল ফুল,—অরণ্যে পশুপক্ষী, জলে জলজন্তুগণ, জগৎময় প্রেমের বাজার। আর যদি তাহাও ইচ্ছা না থাকে, জগৎশ্রেষ্ঠ প্রেমময় ঈশ্বরকে দৃঢ়প্রেমে আবদ্ধ — রিপুর যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

আমরা নীরদার জীবনের তৃতীয় অধ্যায় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সামান্য ফুলের দৃষ্টান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মানব জীবনের প্রধান উৎকৃষ্ট সাধন, প্রেমশিক্ষায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এইক্ষণ নীরদার প্রেম-প্রধান জীবন কুটিল পথগামী সংসারের প্রণয় হইতে বঞ্চিত থাকিয়াও কি প্রকার সুখ উপভোগ করিয়াছিল, তাহাই দেখাইব। নীরদার এই যৌবন, যৌবনে সৎপ্রবৃত্তি যত প্রবলবেগে ধাবমান হয়, এত আর কোন সময়ে নহে। বৃদ্ধ সাধক এবং যুবক সাধকের জীবন ঘোরতর বৈষম্যময়। যুবক সাধক, যাহার জন্য সাধনা করে, তাহার শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড়ে না। আমরা সাধকশ্রেণীকে কেবল ধর্ম্মজীবনে আবদ্ধ করি না; সাধক অনেক প্রকার। কেহ রূপের সাধক, কেহ প্রেমের সাধক, কেহ ঐশ্বর্য্যের সাধক, কেহ বিদ্যার সাধক, কেহ সমাজের সাধক, কেহ রাজনীতির সাধক; অবস্থা ভেদে, রুচিভেদে, সংসারে নানা প্রকার সাধক দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই সকল প্রকার সাধক সম্বন্ধেই এই কথা বলিতেছি;—যুবক সাধক সাধনার ফল পাইবার জন্য অতলস্পর্শ বারিপুঞ্জ ভেদ করিয়া পাতালগামী হইতেও

কুণ্ঠিত হয় না, সাধনার ফল-লাভের জন্ত জীবন্ত অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিতেও ভয় করে না। বুদ্ধের সাধনা, যেমন আছে, তেমনি চলিতেছে; যে পর্য্যন্ত অনন্ত কালসমুদ্রে জীবনস্রোত না মিশাইবে, তাবৎ তাহাদের সাধনার শেষ নাই; ফলপ্রাপ্তি জীবনে ঘটুক বা না ঘটুক, তাহাতে তাঁহাদের অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় না। যাহা বলিতেছিলাম,। নীরদার যৌবন—ফুল ফুটিবার কথা বলিতে চাও, বল, ক্ষতি নাই, পবিত্র ফুল ফুটিয়াছে,—কিন্তু ভ্রমর নাই, গুঞ্জরণ নাই, সংসার পোকার এ অস্পৃশ্য ফুলকে স্পর্শ করিবারও ক্ষমতা নাই। নীবদার মন অটল, হিমাদ্রিশেখর স্থানচ্যুত হইতে পারে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের পলায়নের পর মুহূর্ত্ত হইতে যে মন দৃঢ় হইয়াছে, নীরদার সেই মন বিচলিত হইবার নহে। যখন হইত তখন হইত, তখন নীরদা বালিকা ছিল, তখন মন কোমল ছিল। পূর্ব্বে নীরদার মন কোমল ছিল, তাই শরৎচন্দ্রের অদর্শনে তাহার হৃদয় একবার আন্দোলিত হইয়াছিল; হৃদয়ে একবার তরঙ্গ উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ আর সে ভাব নাই। বিন্ধ্যবাসিনীর পলায়নের বার্ত্তা নীরদা অটলভাবে শুনিল; মনের একটুও বৈলক্ষণ্য দেখা [illegible], প্রবল ঝড় বহিয়া বহিয়া নীরদার যোগ ভঙ্গ করিতে পারিল না। [illegible] র মন পূর্ব্বে সংসারে ছিল, সংসারের বিপদ, সংসারের যন্ত্রণায় মন তখন অ[illegible]স্থির হইত, এইক্ষণ মন-পাখী সংসার ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছে; যে লক্ষ্য পানে দৃষ্টি রাখিয়া চৈতন্ত বিশ্ববিস্তৃত প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই লক্ষ্য নীরদার অবলম্বন। নীরদা সংসারের কিছুই চায় না; খাইতে দাও খাইবে, না দেও অনাহারে স্বীয় জীবনের সাধনায় অনবরত রত থাকিবে।

সম্প্রতি অবিনাশচন্দ্র নলিনীকে লইয়া বাড়ীতে আসিয়াছেন, নীরদার হৃদয়-সরসীতে একবার একটী হর্ষ-তরঙ্গ উঠিল, আবার ক্ষণকাল পরেই তাহা বিলীন হইয়া গেল। নীরদা করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—ছোটদাদা! দাদার কোন সংবাদ পাইয়াছ কি? যাইবার সময় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল? যাইবার সময় তিনি কি বলিয়া গেলেন?

অবিনাশচন্দ্র বলিলেন,—ভগ্নি! দাদা বলিলেন, "নীর[illegible] এবং বিন্ধ্যবাসিনীর জীবনের ভার তোমার উপরে রহিল। তাহাদিগকে দেখিও।"

নীরদা পুন বলিল,—তিনি কি আর আসিবেন না? এখন তিনি কোথায় আছেন?

অবিনাশ।—আসিবেন কি না, তাহা বলিয়া যান নাই। সম্প্রতি তিনি কানপুরে আছেন। তিনি তোমার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

নীরদা পত্র দেখিতে তত উৎসুক হইল না, বলিল, বিন্দু যে সংসারে ঝাঁপ দিয়াছে, তাহা কি তুমি শুনিয়াছ?

অবিনাশ।—শুনিয়াছি। কি করিব কিছুই ঠিক পাই না। বিন্ধ্যবাসিনী যাইবার সময় তোমার নিকট কোন পত্র লিখিয়াছিল!

নীরদা কিছু না বলিয়া বিন্দুর পত্রখানি অবিনাশচন্দ্রের হাতে দিল। অবিনাশচন্দ্র পড়িয়া একটু চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, ভগ্নি! দাদার পত্র যে দেখিতে চাহিলে না?

নীরদা বলিল, কই দাদার পত্র দেও।

অবিনাশচন্দ্র পত্র বাহির করিয়া দিলে নীরদা পড়িতে লাগিল;—

—"স্নেহের ভগিনি! হৃদয় পাষাণ দিয়া বাঁধিয়া আমি তোমাকে সংসার-সমুদ্রে ভাসাইয়া আসিয়াছি; আমার হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠিন। কিন্তু দেশে থাকিয়াই বা কি করিতাম? যদি বুঝিতাম, তোমার মন সংসারে ভ্রমণ করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহা হইলে প্রাণপণ করিয়া সমাজবন্ধনে পদ-নিক্ষেপ করত তোমাকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিতাম; কিন্তু দেখিলাম, তোমার মন সংসার ছাড়িয়া যাইতে উৎসুক, তোমাকে সে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিব কেন? সংসারে কি সুখ? তুমি অচিরাৎ যে বিমল সুখের অধি-কারিনী হইবে, সংসারে সে সুখ পাওয়া যায় না। সংসারে পাপ-পোকা অনবরত মানবের সৎবৃত্তিনিচয়কে ছেদন করিতে উদ্যত। তোমাকে যে পথ দেখাইয়া দিয়াছি, নৈরাশ হইও না, সে পথে কীটের ভয় নাই, অনবরত অগ্রসর হও, অচিরাৎ বিমল আনন্দের অধিকারিনী হইবে। আর আমি? আমি সংসার ছাড়িয়াছি; সংসারে আর যাইব কি না, কে জানে? এ শরীর যদি দেশের জন্য পাত করিতে না পারিলাম, তবে আমার জীবনে কি হইবে? এই ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ যদি চিরস্থায়ী কল্যাণের জন্য পাত করিতে না পারিলাম, তবে আর কি জন্য মানুষ হইয়াছি? আমি সংসার ছাড়িয়াছি, ঈশ্বর করুন, আমাকে যেন আর ফিরিতে না হয়, ঈশ্বর করুন, তুমি প্রেমময়ীর প্রেম-নিকেতনে বিমল আনন্দ ভোগ কর। আমার আশা করিও না, আমার মনে যে আগুন অহর্নিশি জ্বলিতেছে, আমি সেই আগুনে আত্ম বিসর্জন দিব। আমার আশা করিও না; অবিনাশ-

চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাক, যে আমার অভাব দূর করিবে। সংসারে বসিতে চাও, তাহাকে বলিও, সমাজ-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া তোমাকে সংসারে বসাইবে। কিন্তু আমার কথা শুন—"সংসারে সুখ অন্বেষণ করিও না; যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, এই পথেই তুমি অনন্তকাল সুখভোগ করিতে পারিবে। আমি বিদায় হই। মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিব। আজ যেখানে আছি, এখানে চিরদিন থাকিব না।" তোমার অকৃত্রিম স্নেহের—শরৎচন্দ্র।

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে, নীরদা অটল ভাবে বসিয়া রহিল, মন বিচলিত হইল না। অবিনাশচন্দ্র বলিলেন, ভগ্নি! নলিনীর সহিত তোমার আলাপ হয় নাই; আইস, তাহার সহিত তোমার পবিচয় করিয়া দিতেছি।

নীরদা গম্ভীর ভাবে একটী নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাতে।

যাহা দেখিতে ভালবাসি, যাহা দেখিলে নয়ন তৃপ্ত হয়, আমরা তাহাই দেখিতে বসিয়াছি। যাহা সর্ব্বক্ষণ নয়ন মনকে জ্বালাতন করিয়াছে, যে চিত্র রাস্তায়, অরণ্যে, ঘাটে, পুকুরে, বাজারে, বৃক্ষের অন্তরালে, শয়নে, স্বপনে, উপবেশনে, দেখিয়া দেখিয়া এক প্রকার তৃপ্ত (ই বল কি বিরক্তই বল) হইয়াছি, সে চিত্র আর দেখিতে বাসনা নাই, তাহা আর ভাল লাগে না। এক বস্তু কতকাল মধুর থাকে? অন্ধকার রজনীর শিব-মন্দিরের দর্শন, বাতায়ন-পথে সুন্দর ছবি, ভীমা পুষ্করণীর জলক্রীড়া, কুন্দনন্দিনীর অপরূপ, জন্মান্ধ রজনীর মন, বিধবা কুমুদিনীর অনুরাগ চিহ্ন, স্বর্ণলতার স্নেহ, এ সকল দেখিয়া দেখিয়া মন তৃপ্ত হইয়াছে, আর দেখিতে ভাল লাগে না। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর সুন্দর ছায়ায় কোমল করস্পর্শে লোকের মন কি প্রকারে ভুলিয়া যায়; তাহা দেখিবার জন্য আমরা আসন পাতি নাই। একবার, দুইবার, তিনবার দেখিলে মন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এ চিত্র দেখিতে আমরা

আর চঞ্চল হই নাই। আমাদের কঠিন মন অনুরাগের চিহ্ন দেখিলে বিগলিত হয় না, আমরা অনুরাগের সুন্দর বর্ণনা করিতে অক্ষম। আমরা যাহা দেখিতে বসিয়াছি,—শরৎচন্দ্রের জীবন। শরৎচন্দ্রের জীবনী ভাল হউক মন্দ হউক, আমাদের স্বার্থ থাকুক বা না থাকুক, আমরা এ প্রকার রসশূন্য জীবনের অভিনয় দেখিতে সর্ব্বদাই উৎসুক, তাই সংক্ষেপে অন্যান্য অধ্যায় সমাধা করিয়া, আবার শরৎচন্দ্রের জীবনের আর এক পরিচ্ছেদ দেখিতে আসিলাম।

কলিকাতায় শরৎচন্দ্রের যত আত্মীয় বন্ধু ছিল, ধনপৎ সিংহ নামক জনৈক পাঞ্জাবী সিপাহি তাহার মধ্যে এক জন। ধনপৎ সিংহের সহিত শরৎচন্দ্রের কি সূত্রে আলাপ হইয়াছিল, তাহা আমরা এইক্ষণ বলিব না, বলিবার সময় হয় বলিব, না হয় মনের কথা মনেই থাকিবে! ধনপৎ সিংহ প্রথমে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিতেন, প্রায় একবৎসর হইল, ইচ্ছা করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র ধনপৎ সিংহের সহিত একত্রিত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ তাঁহারা বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহাদিগের একটু স্বার্থ ছিল। প্রবল পরাক্রমশালী মহারাজ রণজিৎ সিংহের বিধবা মহিষী ঝিন্দন ইংরাজ চক্রান্তে রাজ্য-চ্যুত হইয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হন। তাঁহার নাবালক পুত্র তখন ইংরাজগণের হাতের ক্রীড়া পুত্তুল স্বরূপ জনৈক ইংরাজের তত্ত্বাধীনে ছিলেন। ইংরাজ চক্রান্তের এ সকল গূঢ়তত্ত্বের মর্ম্মভেদ করিতে তিনি তখন সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিলেন; নচেৎ কে ইচ্ছা করিয়া স্বীয় গর্ভধারিণীর নির্ব্বাসন-পত্রে স্বাক্ষর করিতে পারে? সে যাহা হউক, ইংরাজ রাজত্বের কূটনীতি সমালোচনায় কোন ফল নাই, বিশেষত সে সকল বিষয় আমাদের অবলম্বনীয় পথ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধনপৎ সিংহ মহারাণী ঝিন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, ঝিন্দন যে সকল মর্ম্মভেদী কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে ধনপৎ সিংহের বিরক্তি-যুক্ত মন উগ্রতর হইয়া উঠে, তাঁহার সহিত ঝিন্দনের যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, তাহা আমরা উল্লেখ করিব না। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের সেটী একটী অন্যতর কারণ। ঝিন্দনের সহিত সাক্ষাতের পর ধনপৎ সিংহ শরৎচন্দ্রকে লইয়া পঞ্জাব, দিল্লি, কানপুর, মুলতান প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন। শরৎচন্দ্র অনেক

দিন পর্য্যন্ত কানপুরে ছিলেন, ঐ সময়ে গুপ্তভাবে তিনি ইংরাজ সৈন্যগণের যুদ্ধ প্রণালী অতি অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষা করেন। ধনপৎসিংহ শরৎচন্দ্রকে কানপুরে রাখিয়া আরো অন্যান্য স্থানে গমন করেন। শরৎচন্দ্র এক বৎসর কাল কানপুরে থাকিয়া ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে পাটনায় জগদীশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। শরৎচন্দ্র জগদীশবাবুর নিকট স্বীয় জীবন সম্বন্ধে বিশেষ ঋণী ছিলেন, সেই ঋণ পরিশোধ করিবার মানসে তিনি পাটনায় উপস্থিত হইলেন; আসিবার সময় জনৈক সিপাহির নিকট বলিয়াছিলেন, ধনপৎ সিংহ আসিলে, আমার কথা বলিও; তাঁহার পত্র পাইলেই আমি ফিরিয়া আসিব।'

পাট্‌নার নিম্নে কলধৌতবাহিনী, দিগন্তব্যাপিনী, স্মৃতিময়ী গঙ্গা মৃদু মৃদু কল কল রব করিতে করিতে, নগর, প্রান্তর, গিরি, বন অতিক্রম করিয়া অনন্ত সাগরে মিশিতে যাইতেছে! সন্ধ্যার প্রক্‌কালীয় সূর্য্যের রক্তিম রশ্মি জলের উপর যদৃচ্ছাক্রমে হেমাভরণে শোভা পাইতেছে, একটু একটু বাতাস বহিয়া ক্ষুদ্রবীচিমালা তুলিতেছে, সেই বীচিমালায় সেই রশ্মি মুক্তার ন্যায় ঝল মল করিতেছে। জগদীশ বাবু একাকী তীরে সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিতেছেন। দূর হইতে একজন লোক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, জগদীশ বাবুকে দেখাইয়া দিয়া, চলিয়া গেল। ইঙ্গিত মতে পথিক নিকটে উপস্থিত হইলে, জগদীশ বাবু চিনিলেন, পথিক—'শরৎচন্দ্র।'

অনেকদিন পরে আজ সাক্ষাৎ হইল, আনন্দ এবং নিরানন্দের স্রোত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। জগদীশ বাবুর চক্ষু হইতে নীরবে প্রেম-অশ্রু বিন্দু বিন্দু পড়িতে লাগিল; শরৎচন্দ্রও সমভাবে অজ্ঞাতসারে নয়ন-প্রান্ত হইতে সহানুভূতি-সম্ভূত-অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ভক্তির মালা গাথিয়া তাঁহার পায়ে উপহার দিতে লাগিলেন, পা শিশিরসিক্ত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনেক দিনের পর আজ সাক্ষাৎ, অনেক কষ্টের পর আজ মিলন,—অনেক দুঃখের পর আজ সুখ, জগদীশবাবু কথা কহিতে অক্ষম হইলেন না। ইচ্ছার পর ইচ্ছা হৃদয়ে জলবিম্বের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। অতীত ঘটনা সকল একে একে মনে উঠিয়া স্মরণ-পথকে অবরুদ্ধ করিল,—সেই নৌকা, সেই দস্যু, সেই অত্যাচার, সেই শরৎচন্দ্রের জলে ঝাঁপ, একে একে সকল মনে পড়িতে লাগিল। বর্ত্তমান সাক্ষাতে বিগত শোকসিন্ধু

সহসা উথলিয়া উঠিল,—মালতী কোথায় ? বিলুপ্তপ্রায় আশা জগদীশ বাবুকে প্রশ্ন দেখাইতে লাগিল—মালতী কোথায় ? অনেক অনুসন্ধানের পর যখন আর কাহাকেও পাইলেন না, তখন সেই নদীস্রোতে জীবনের আশা ভরসা বিসর্জন দিয়া আসিয়াছিলেম, আজ এতদিন পরে শরৎচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল ; বিলুপ্ত-আশা আবার হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলিল। মালতী কোথায় ?—এই প্রশ্ন মনে সহসা জাগিল। শরৎচন্দ্র নীরবে রহিলেন।

এই আনন্দ, এই নিরানন্দ, দুইয়েরই শক্তি সমান। জগদীশ বাবু কথা বলিবার জন্য উৎসুক হন, আর নিরানন্দ আসিয়া বাধা দেয় ; নীরবে থাকেন, আনন্দ বলিয়া দেয়, 'বর্ত্তমানে যে সুখ আছে, তাহাই ভোগ কর।'

অনেকক্ষণ পরে আনন্দ এবং নিরানন্দের মিল হইল, উভয়ে সম্মত হইয়া জগদীশবাবুর মুখ খুলিয়া দিল, বলিলেন—'শরৎ ! তোমাকে দেখে—।' আর বাক্য ফুটিল না, দুঃখ আসিয়া আবার বাদী হইল, মুখ বন্ধ হইল ; চক্ষের জলে বস্ত্র আর্দ্র হইতে লাগিল। জগদীশ বাবু শরৎচন্দ্রের অকৃত্রিম ভক্তির বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন ; কোমল নয়ন স্নেহবারি ঝরাইয়া শরৎচন্দ্রের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

ক্ষণকাল পরে জগদীশবাবু আবার চঞ্চল হইয়া বলিলেন, 'শরৎ ! তোমাকে দেখে আমার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল ! মনের কথা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। তুমি আমার জন্য প্রাণ দিতেও উদ্যত হইয়াছিলে, তোমার এ ঋণ আমি এ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। আমার হৃদয় কি কঠিন ! যখন তুমি আমার জন্য প্রাণের আশা পরিত্যাগ করে জলে ঝাঁপ দিলে, তখন তোমার সহিত আবার দেখা হবে, এ আশা মাত্রেই ছিল না, কিন্তু তবুও আমি জীবিত ছিলাম ! আমার ন্যায় পাষাণ-হৃদয় আর কে ? দেখ শরৎ, আমার জীবনের আশা, ভরসা,—মালতীকে হারাইয়াও জীবিত রহিয়াছি ? জগদীশ বাবু রোদন করিতে লাগিলেন।

শরৎচন্দ্র বলিলেন, ক্রন্দনে ফল কি ? কাঁদিলে যদি অভাব পূর্ণ হইত, তাহলেও দিন রাত্রি বসিয়া কাঁদিতাম, কিন্তু তাত হয় না ! তবে বৃথা রোদনে ফল কি ? সহ্য করা লোকের মহৎগুণ, ইহা ভাবিয়া সকলই সহ্য

করিতে শিখেছি। আমি দুঃখী—আমার দুঃখ অসীম, আজীবন অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেও সে দুঃখ প্রকাশ হয়না; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, সব অকারণ। আপনি আর কাঁদিবেন না।

জগদীশ।—আমার হৃদয়ে যে শেল বিদ্ধ হয়েছে, আমার মন কঠিন বলিয়াই সে শোক-যন্ত্রনা সহ্য করিতেছি। আমার জীবনের কর্ত্তব্য-কার্য্য কি করেছি? তবে একটু কাঁদি; এটুক আমার না থাকিলে, আমি মনুষ্যনামের উপযোগী হতেম না। আমাকে ওকথা আর বলো না। শরৎ! ভেবে দেখত আমার কত কষ্ট। এদেহ দুঃখের অস্পৃশ্য ছিল। শৈশবে পিতা মাতার আশীর্ব্বাদে কোন কষ্টই ভোগ করি নাই; তারপর যখন বড় হইলাম, তখনি এই চাকুরি পাইলাম, মালতী আমার সুখের ভাগী হলো। মালতীর কথা মনে উঠিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। মালতীর পিতামাতা, শৈশবে মালতীকে আমার হাতে অর্পণ করে, স্বর্গবাসী হয়েছেন, এ পৃথিবীতে আমি ভিন্ন মালতীর আর কেহই নাই; এইক্ষণ মালতী গর্ভাবতী! হায়! তাহার এখন কি দশা হয়েছে, কে জানে? হয়ত দস্যুদিগের পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া মালতী প্রাণত্যাগ করেছে! শরৎ! মালতীর মৃত্যুতে আমি তত দুঃখী নহি, কিন্তু সে আমারি জন্য প্রাণ হারালো। আমি মালতীর পরম শত্রু ছিলেম। আমার মন একেবারে অস্থির হয়েছে। এতদিন সব ভুলে ছিলাম, আজ তোমাকে দেখে, আবার একে একে সকল মনে উঠে, মনকে অস্থির করে তুলিতেছে। আচ্ছা বলত! মন এত অস্থির হয় কেন? পরের জন্য মন এত চঞ্চল হয় কেন?

শরৎচন্দ্র।—দুর্ব্বল মন চঞ্চল হয় কেন, কি প্রকারে বুঝিব? যাহার সহিত পূর্ব্বজীবনে আলাপ পর্য্যন্ত ছিল না, বিবাহের পর সেই জীবন সর্ব্বস্ব হইল?

জগদীশ।—শরৎ! তোমার কি বিবাহ হয় নাই!

শরৎচন্দ্র বিনম্রভাবে মস্তক নত করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, সেকথা আপনি শুনে কি করিবেন? যদি অজানিত সময়ের অপরিচিত বন্ধনের নাম বিবাহ হয়, তবে আমি বিবাহ করিয়াছি।

জগদীশ্বর বাবুর হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইল—'যদি অজানিত সময়ের অপরিচিত বন্ধনের নাম বিবাহ হয়! বলিলেন, সে কি প্রকার?

শরৎচন্দ্র আর কথা বলিলেন না; হৃদয়ে যে উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, তাহা ভেদ করিয়া বাক্য স্ফুটিল না।

অনেকক্ষণ পর জগদীশবাবু বলিলেন—'শরৎ! তুমি কি করিবে?'

শরৎচন্দ্র মনের কথা গোপন করিয়া বলিলেন, আপনি কি করিতে বলেন?

জগদীশ বাবু।—আমি বলি, চাকুরি কর। সম্প্রতি আমার হাতে একটী কর্ম্ম খালি আছে, বেতন ৮০টাকা, আপাতত এই কর্ম্মে নিযুক্ত হও; তারপর ক্রমে আরো উন্নতি হইবে।

শরৎচন্দ্র কোন উত্তর করিলেন না।

জগদীশ বাবু মৌনভাব সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়া সেই কার্য্যেই শরৎচন্দ্রকে নিযুক্ত করিবেন, ঠিক করিলেন। রজনী গাঢ়তর হইয়া আসিল; জগদীশ বাবু শরৎচন্দ্রের হাত ধরিয়া বাসায় লইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অপরিবর্ত্তনীয় মত।

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যাঁহাদিগের মত পরিবর্ত্তিত হয়, আমরা তাঁহাদিগের মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। মানসিক শক্তির পূর্ণ-বিকাশে মন উন্নত হয়, বয়স-আধিক্যে জ্ঞানের জ্যোতি বিকীর্ণ হয়, বিজ্ঞতা বালির বাঁধের ন্যায় চঞ্চল মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া অটলভাব ধারণ করিতে থাকে, এ সকল কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু মত পরিবর্ত্তিত হইবে কেন? যে জীবনক্ষেত্রে যে বৃক্ষের বীজ রোপিত হয়, সময়ের পরিবর্ত্তনে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে কেন? এক সময়ে একবীজে অন্য বীজের ফল ফলে, তাহা জানি, কিন্তু সে কোন্ সময়ের কথা? বালক এই হাসে, এই কাঁদে, এই খেলা করে, এই অধ্যয়ন করে, এই আকাশে উঠে, এই পাতালে পড়িয়া গড়াগড়ি যায়; তাহাদিগের মনের চাঞ্চল্য-হেতু, তাহাদের মন স্থির থাকে না, এক বীজ রোপিত হইতে না হইতে সে বীজ তুলিয়া অন্য বীজ বপন করে, আবার অন্য সময়ে সে বীজ তুলিয়া ফেলিয়া দেয়। এ সকল ক্রীড়া বালকের চরিত্রেই শোভা পায়। বালকের মত

ঠিক থাকে না, তাহা জানি, কিন্তু মনুষ্যের মত পরিবর্ত্তিত হইবে কেন? পোকায় বীজ কাটে, জল বায়ুর দোষে বীজ পচে, নৈরাশ্য বীজের অস্তিত্ব ভূতে মিশায়; এ সকল অসার কথা। ক্ষেত্রের দোষে এ সকল ফল ফলিয়া থাকে। ক্ষেত্র ভাল হইলে এ সকল কথা, প্রবঞ্চনার কথা।'

নৈরাশ্যে হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, এ কথা আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। সংসারের আপদ, বিপদ,—নৈরাশ্য-পবন প্রবলবেগে বহিয়া যখন আশার বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া ফেলে, তখন কাহার সাধ্য, মত ঠিক রাখিয়া অটলভাবে জীবন অতিবাহিত করিবে? নৈরাশ্যের কিছু স্বাভাবিক ক্ষমতা মানব হৃদয়ের উপর স্বতই আধিপত্য স্থাপন করে, আমরা জানি, কিন্তু জানি বলিয়া ইহার হাত এড়ান যায় না, তাহা বলি না। যিনি কার্য্য-ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করিয়া, ফল-প্রাপ্তির-আশা-নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে, ধৈর্য্য সহকারে জল সিঞ্চন করিতে থাকেন, তাঁহার মন কথনই পরিবর্ত্তিত হয় না। যাঁহার এই প্রকার অটল মন আছে, যাঁহার জ্ঞান অর্জ্জিত হইলেও মত পরিবর্ত্তিত হয় না, সেই প্রকৃত মনুষ্য; তাঁহার মনই বালকত্ব-শূন্য। যে দিন বালকত্ব-শূন্য মনের কথা আবার শুনিব, সেই দিন বঙ্গের উন্নতির আশার স্বপ্ন আবার হৃদয়কে ভুলাইবে।

শরৎচন্দ্র সহসা জগদীশ বাবুর কথা অমান্য করিতে পারিলেন না, চাকুরি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! তাঁহার জীবনের প্রশস্থ ক্ষেত্র কি চাকুরি—দাসত্ব? কে বলিবে? তবে শরৎচন্দ্র মত-বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? শরৎচন্দ্র কি নৈরাশ-পবনে বিলোড়িত হইয়াছেন? যদি হইয়া থাকেন, তবে তিনি বালক, মনুষ্যনামের উপযোগী নহেন। যিনি অল্প সময়ে ফল লাভ না হইলে হতাশ হইয়া পড়েন, তাঁহার পক্ষে অনন্তকাল-সাপেক্ষ ফলের আশা করা বিড়ম্বণা মাত্র। শরৎচন্দ্র কি বালক? দাসত্ব তাঁহার জীবনের পথ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তবে তিনি এ পথ অবলম্বন করিলেন কেন? কৃতজ্ঞতা স্বীকার? কৃতজ্ঞতা-স্বীকারে একেবারে মত পরি-বর্ত্তিত হয়, বলিতে পারি না; কিন্তু ক্ষণকালের জন্য সময়-ভস্মে আবরিত হইয়া অন্তরে ধীকি ধীকি জ্বলিতে থাকে। শরৎচন্দ্রেরও তাহাই হইল, তিনি একটী কথা প্রতিপালন করাকে, কৃতজ্ঞতা স্বীকারের এক মাত্র উপায় মনে করিলেন; তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইল না। এক দিন, দশ দিন, এক মাস, দুই মাস, তিন মাস পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল, তবুও মত পরিবর্ত্তিত হইল না,

পরিবর্ত্তিত হওয়া দূরে থাকুক,তিন মাস পরে অন্তরের আগুন আবার প্রকাশ পাইল; শরৎচন্দ্র কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য অস্থির হইলেন। এক দিন জগদীশবাবুর নিকটে বলিলেন—'আপনার কথা প্রতিপালন করিবার জন্য আমি দাসত্ব-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম; তখনও জানিতাম, অন্যের চাকুরি করিতে গেলেই স্বীয় মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয়, কিন্তু জানিয়াও আপ-নার কথা অমান্য করিতে পারি নাই। যাহা কল্পনায় ভাবিতাম, তাহার ফল হাতে হাতে পাইয়াছি; আমি আর চাকুরি করিব না। আপনার নিকট আমি ঋণী আছি, চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিব, যতদিন পর্য্যন্ত এ শরীরে শেষ রক্তবিন্দু মৃদু মৃদু বহিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আপনার ঋণের কথা বিস্মৃত হইব না; আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার অর্থে প্রয়োজন কি? যে অর্থ মনের আশাভরসা, জীবনের অবলম্বনীয়-পথ,—সাধের বিপণিকে ভা-ঙ্গিয়া উপার্জ্জন করিতে হয়, সে অর্থ চাইনা, আমি কাঙ্গালী, আমার সে অর্থে প্রয়োজন কি? তবে কেন একার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম? জিজ্ঞাসা করিলে যথার্থ উত্তর পাইবেন; উত্তর পাইবেন,—সে কেবল আপনার কথা প্রতি-পালন করিবার জন্য; আমার মন তখনও যেমন ছিল, এখনও সেই প্রকারই আছে। যাঁহাদিগের জীবন চাকুরির জন্য, অর্থের উপর অর্থ ঢালি-বার জন্য, হংসপুচ্ছ পরিচালন করিবার জন্য, তাঁহারা তাহাই করিতেছেন, চিরকাল করুন। আমি কেন করিব? আমি আর চাকুরি করিব না।

জগদীশ বাবু।—শরৎ! তোমার রক্ত আজও গরম; তুমি এইক্ষণও বালক। চাকুরি ভিন্ন আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের আর কি উপায় আছে?

শরৎচন্দ্র।—জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নাই, মরিব। আমাদের ন্যায় লোকের থাকিয়া কি ফল? যে জীবনে সংসারের কোন উপকার নাই, সে জীবন রাখিব কেন? আবার সেই জীবন রাখিব, পরের চাকুরি করিয়া? যে দিন ভারতবর্ষের শস্যক্ষেত্র ভস্মাবশেষে পরিণত হইবে, যে দিন বাণিজ্য ব্যবসায়ের শেষ নামও আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিবে না, যে দিন এ দীনের ন্যায় শরীর-ধারী মানব আর ভারতে উৎপন্ন হইবে না, সেই দিন মরিতে হয়, মরিব। এইক্ষণও লোক উৎপন্ন হইতেছে; এ সংসারে কেহ অনা-হারে মরিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই; যদি চাকুরি ভিন্ন আর অন্য উপায় না থাকে? মনে করুন, আজ হইতে সমস্ত চাকুরির পথ রুদ্ধ হইল; কাল কি সমস্ত ভারতবাসী অনাহারে মরিবে? আপনি বিশ্বাস করেন, করুন; আমি

বিশ্বাস করি না; বিশ্বাস করি না—চাকুরি ভিন্ন ভারতবাসীর জীবিকা-নির্ব্বাহের আর উপায় নাই। ঐ দূরবর্ত্তী-বিস্তীর্ণ শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্র কাহার জন্য? আর ঐ যে শ্মশান, উহাই বা কাহার জন্য? হয় ঐ ক্ষেত্রে ভারতবাসীর জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় সংস্থান করিয়া দিবে, না হয় ঐ শ্মশান আহ্বান করিয়া ভারতবাসীদিগকে অনন্ত ভস্মরাশিতে মিশাইবে! হয় মরিব—না হয় বাঁচিব। পরের চাকুরি করিয়া বাঁচিতে হইলে, বাঁচিব না—এ দেহ বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইব; চিহ্নও রাখিয়া যাইব না। কিন্তু কিছু কাল অপেক্ষা করিব—একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, ভারতবাসীর আর উপায় আছে কি না? যখন উত্তর পাইব,—'আর উপায় নাই' যখন ভারত উত্তর করিবে, 'ভারতের পূর্ব্ব স্মৃতি বিস্মৃত হও, সে দিন আর আসিবে না' তখন প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতে যেমন পতঙ্গ ইচ্ছা করিয়া পুড়িয়া মরে, আমিও সেই প্রকার এই দেহ, এই শরীর, এই মন অতল জলে বিসর্জ্জন দিব; কাহারও মুখের প্রতি তাকাইব না; কেহ সঙ্গে আসিল না বলিয়া সামান্য নিশ্বাসও ফেলিব না।

জগদীশ বাবুর শরীর বিকম্পিত হইল, বলিলেন, শরৎ! কল্পনার কথা ছাড়িয়া দাও; বল ত, আজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, কল্য তুমি কি করিবে?

শরৎচন্দ্র পুনরায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'কল্যই ভারতকে জিজ্ঞাসা করিব; কল্যই যদি যথার্থ মর্ম্মভেদী উত্তর পাই, তবে কল্যই এই শরীরকে ডুবাইব, কেহ চিহ্নও দেখিবে না; আর যদি দেখি, এখনও উপায় আছে, এখনও শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, এখনও লোক বাঁচিতে পারে, তবে কল্যই চেষ্টা করিব, যাহাতে ভূমিতে চাষ পড়ে; কল্যই জীবন ক্ষেত্রে কর্ষণী চালাইয়া সুফল উৎপন্ন করিয়া লইব; যদি ক্ষেত্র থাকিতে চাষ করিতে না পারি, তবে আর আশা কি, ভরসা কি? তবে আর মানুষ কি,—মনুষ্যত্ব কি? তবে আর জ্ঞান কি? শিক্ষা কি? তবে আর বিদ্যা বুদ্ধি কি? যখন চাষেও কিছু হইল না, দেখিব, তখন এ রাজ্য ছাড়িয়া যেখানে ক্ষেত্রে বীজ পড়িলে নষ্ট হয় না, সেইখানে যাইয়া বীজ বপন করিব; সময়ে সেই শস্য আনিয়া ভারতের প্রাণ বাঁচাইব।

জগদীশ বাবু শরৎচন্দ্রের কথার বক্রভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে অক্ষম হইলেন; সবিস্ময়ে বলিলেন,—তুমি আশ্চর্য্য লোক, দেখিতেছি, চাষ করিয়া

থাকিতে, তবু চাকুরি করিবে না? এ বুদ্ধি তোমাকে কোন্ বিধাতা দিয়াছেন? বাপু! ও সকল পাগলের মত ছেড়ে দেও।

শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে দেব গর্জ্জন হইল; বলিলেন,—'স্বাধীন মত পরিত্যাগ করিব কি জন্য? আপনি আমার অবলম্বনীয় পথের দোষ দেখাইয়া দিন, এইক্ষণেই নত শিরে আপনার কথা পালন করিব। যদি দোষ দেখাইতে না পারেন, তবে স্বাধীন মতের বিরুদ্ধ-কথা বলিবার আপনার কি ক্ষমতা? আপনি কি জানেন না যে, প্রত্যেকের মত ভিন্ন ভিন্ন? প্রত্যেক মনুষ্য আপনার মতে চলিবে, কি প্রকারে আশা করেন? বিশেষত অন্যের মতে কি দোষ, তাহা আপনি দেখাইতে পারেন না; যে ব্যক্তি অন্যের অবলম্ব্য মতের বিরুদ্ধে দোষ দেখাইতে না পারে, তাহার স্বাধীন মত সম্বন্ধে বাধা দিবার কি অধিকার? আপনি আমার মত পরিত্যাগ করিতে বলিলেন? আমার কথায় অগ্রে আপনার মত পরিত্যাগ করুন; তারপর আমার মত পরিত্যাগ করিব। আপনি চাকুরি ছাড়িয়া দিন, আমি চাষ করিবার মত ছাড়িয়া চাকুরির মধ্যে মাথা ঢুকাইব। কিন্তু আমি জ্ঞান থাকিতে আপনার মতের বিরুদ্ধে কথা বলিতে চাহি না; আপনার নিকট চাকুরি ভাল, আপনি করুন, আমার ভাল লাগে না, আমি করিব না। আমার স্বাধীনমত সম্বন্ধে আপনার কথা কহিবার কি অধিকার? চাকুরি ভিন্ন আপনি জীবন ধারণের আর উপায় দেখেন না, আপনি করুন; আমার নিকটে শত সহস্র পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, আমি কেন আপনার মতে চলিব?

জগদীশ বাবু এ সকল কথা উত্তমরূপে বুঝিলেন, বুঝিয়া একটু লজ্জিত ভাবে বলিলেন,—আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তোমাকে প্রাণের মত ভালবাসি, তোমার উন্নতিতে আমোদ হয়, অবনতিতে দুঃখ পাই, তাই ঐ প্রকার বলিতে সাহসী হইয়াছিলাম; আমাকে ক্ষমা কর। আমার কথা না শুন, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। অবাধ্য হইলে কাহারও হাত নাই। শরৎ! তোমার মনের বাসনা কি, আমি বুঝিতে পারি নাই; তোমার কথা শুনিয়া যদি আমি সন্তুষ্ট হই, তবে সে সকল আমাকে ভাল করিয়া বল।

শরৎচন্দ্র এবার নম্রভাবে বলিলেন,—আমার জীবনের কথা শুনিয়া আপনি সন্তুষ্ট হইবেন না, আমার ইচ্ছা, দেশের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই একটী কথা, (যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি) জিজ্ঞাসা করিব; যদি নৈরাশ হই, তবে এদেশ ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইব।

জগদীশ বাবু।—যতই তোমার কথা শুনি ততই যেন আরো গোলযোগে জড়িত হই। দেশের দ্বারে দ্বারে কাঁদিবে, তাহাতে কি হইবে? আর কি বলিয়াই বা কাঁদিবে? শুনিতে হৃদয় বড়ই উৎসুক। আবার তুমি বলিলে সে কথা শুনিলে আমি সুখী হইব না। তবে সে কি তোমার দুঃখের কথা? শরৎ! যদি বাধা না থাকে, তবে বল, শুনি।

শরৎচন্দ্র।—আমার জীবনের দুঃখের কথা নহে, সে সুখের স্বপ্ন। আমার সুখ আমার মনে। তবে আপনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না কেন? তাহার অনেক কারণ আছে; শুনিতে চান, বলিতে পারি; কিন্তু সে কথা কাহাকেও বলিতে পারিবেন না; মনের কথা মনেই রাখিতে হইবে।

জগদীশ।—তবে বল; প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সে সকল কথা আর কাহাকেও বলিব না, তোমার জীবনের সুখের কথা শুনিয়াও যদি সন্তুষ্ট না হই, সে দোষ তোমার নহে, সে দোষ আমার; শরৎ! তোমার মনের কথা বল, শুনিয়া সন্দেহপূর্ণ মনকে সুস্থির করি।

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, কি কথা বলিব? হৃদয়ের দুঃখ উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর বলিবার কি আছে? ইচ্ছা হয় শুনুন। এই বলিয়া শরৎচন্দ্র ধীরভাবে প্রাণের কথা বলিলেন। ভারতের অবনতি—অধীনতা না ঘুচিলে আর দেশের মঙ্গল নাই, এ কথা বলিলেন। ভারতকে ইংরেজের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন, বলিলেন। দ্বারে দ্বারে দেশের শোচনীয় কাহিনী, ইংরাজ-অত্যাচার প্রচার করিয়া সমবেত মত গঠন করিতে চেষ্টা করিবেন, বলিলেন। আবশ্যক হইলে, ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন, বলিলেন।

জগদীশবাবু চমকিত হইলেন; বলিলেন শরৎ! তোমার কথা শুনে আমার হৃদয় কাঁপ্‌চে। কঠোর বৃটীশ রাজ্য-শাসন, তোমার পরিণাম যে কি হইবে, তা বুঝিতে পারি না। আমি তোমাকে এখনও নিষেধ করি, এ কণ্টকিত পথ ছেড়ে দাও। ইচ্ছা করে কেন বৃথা জেলে প্রাণ হারাবে!

শরৎচন্দ্র।—জেলের ভয় করি না এ জীবনে যদি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি, তাহা হইলে জেলে যাইব, ভয় করি না? আপনার মন যে এত নিস্তেজ, ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, আমাকে আর বাধা দিবেন না; আমি আর পরের চাকুরি করিব না।

জগদীশবাবু।—চাকুরি করিতে না চাও, না কর, ভালই; কিন্তু তোমাকে

একটী কথা বলি ? আর পাগলামি করো না ; আমার এখানে থাক ; আমিই তোমায় ভরণ পোষণ করিব। শেষকালটা জেলে প্রাণ হারাবে, তা আমার সহ্য হবে না ; বৃটিশ শাসন অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছে ; একটু সাবধান্ হও।

শরৎচন্দ্র।—বৃটিশ-শাসন ভয়ানক হয়েছে বলেই আমার আর সহ্য হয় না ; কিন্তু কি করি অসহায়, সম্পত্তিহীন ; যাহা হউক, চেষ্টা করেও যদি কিছু করিতে না পারি, সে দোষ কাহার ?

জগদীশবাবু।—তুমি বালক, কি চেষ্টা করিবে ? তোমার আমার চেষ্টায় কি হবে ? তোমার আমার মত নির্জ্জীব শৃগাল বৃটিশ সিংহের কি করিতে পারে ? কেবল ক্ষুধা নিবারণ হয়, তাহাও সকল সময়ে নহে ; বাঙ্গালী-শৃগালে ইংরাজ-সিংহের ক্ষুধাও সকল সময়ে নিবারিত হয় না। তুমি আর পাগলামি ক'র না।

শরৎচন্দ্র।—আমার চেষ্টায় হবে কি ? কি হবে, তা কে জানে ? কিছু হউক না হউক, সে জন্য আমি ভাবি না, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে প্রাণপণ যত্ন করেও যদি কিছু উপকার না হয়, সে জন্য আমি কুণ্ঠিত নহি। চেষ্টা করি—আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে যত্নশীল হই, তাতেও যদি কিছু না হয়, নাচার ! আপনি আপনার নিকটে থাকিতে বলিলেন, আপাততঃ দিন কয়েক থাকিব, কিন্তু যখন বুঝিব সময় হইয়াছে, তখনই আমার পথ আমি পরিষ্কার করিব।

জগদীশ বাবু বিস্ময়ে বলিলেন,—কিসের সময় শরৎ ?

শরৎচন্দ্র।—কিসের সময়, তা বলিব না, আপনি আর কথা পাড়িবার জন্য চেষ্টা করিবেন না। যখন সময় হইবে, তখন দেখিবেন, দেখিয়া বুঝিবেন, কিসের সময়ের কথা বলিতেছি। এখন প্রাণান্তেও বলিব না।

জগদীশবাবু উত্তর না পাইয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংক্ষিপ্ত অবতারণিকা।

কুশলময়, পক্ষপাতী, অত্যাচার-শূন্য খ্রীষ্টীয় রাজত্বের বিরুদ্ধে ভারত-বাসীর অকৃতজ্ঞ হৃদয় হইতে বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, লর্ড ক্যানিংয়ের সময়ে

ধর্ম্মপরায়ণ শ্বেত-মহাপুরুষগণকে অসময়ে ভস্মীভূত করিয়া, রাজভক্তি-প্রসিদ্ধ ভারতের কপোল-প্রদেশে যে একটী কলঙ্ক-রেখা ভস্মাবশেষ স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে, আমরা সে কলঙ্ক-রেখা চিত্রিত করিতে আসিলাম কেন? পরোপকার রত, ধর্ম্মপরায়ণ ইংলণ্ডবাসী সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভারতবাসীদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন; সে সকল স্মরণ হইলে চিরকাল ইংরাজ রাজত্বের জন্য মন তৃষিত হয়। ধনভারে ক্লান্ত ও নিস্তেজ হইয়া ভারত নিদ্রা যাইতেছিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ ইংরাজ সে ভার হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে শূন্যগর্ভ করিতেছেন! মণি মুক্তা রত্নরাজি সকল এইক্ষণ ইংলণ্ডকে কষ্ট দিতেছে। পূর্ব্বে ভারতে কখনও দুর্ভিক্ষ হইত না, ইংরাজ অনেক সাধনা করিয়া এইক্ষণ বৎসরের মধ্যে দুইবার করিয়া দুর্ভিক্ষ আনিয়া লোকসংখ্যা কমাইয়া, স্বভাবের সাম্য রক্ষা করিতেছেন! পূর্ব্বে ভারতসন্তানেরা অন্ধকারে চক্ষে দেখিত না, এইক্ষণ তাহাদের জন্মান্ধ নয়ন ফুটাইয়া, চতুর্দ্দিক রাজনীতির শৃঙ্খল দ্বারা রুদ্ধ করিয়া 'সংসারে লোভ পরবশ হওয়া অন্যায়' এই নীতি শিক্ষা দিতেছেন! উচ্চ উচ্চ পদসকল গ্রহণ করিলে অসহ্য কষ্ট-ভার সহিতে হয় বলিয়া, দয়া করিয়া সে সকল কঠিন কার্য্যের ভার, শ্বেত-ভল্লুকদিগের মস্তকে চাপাইয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন! দেশীয় রাজ্য সকল ইংরাজাধীনে না আসিলে সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হয়, তাই কষ্ট করিয়া সে সকলকে স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। এ সকল ভাবিতে বসিলে আমাদের কঠিন মনও একেবারে গলিয়া ইংরাজরাজের পদতলে লুণ্ঠিত হয়, ভাবি, যতকাল ইংরাজ ততকাল ভারতে দুর্ভিক্ষ,—যত কাল ইংরাজ ততকাল হাহাকার, যতকাল ইংরাজ তত কাল আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি! আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি, তাহাত আছেই!—ভারত যাহা দেখে নাই, তাহা দেখিল,—ভারত যাহা কখনও শুনে নাই, তাহা শুনিল,—ধর্ম্মপ্রসিদ্ধ ভারত যাহা কল্পনা করে নাই, তাহা ঘটিল! তাহা ঘটিল,—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ইংরাজ রাজত্বের সুখ-সমৃদ্ধির দৃষ্টান্ত,—ইংরাজ রাজত্বের অপক্ষপাতী, অত্যাচার-শূন্য ন্যায়বিচারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ!!—পৃথিবী এই কথা বিস্মৃত হইবে না, যাবৎ ইতিহাস থাকিবে, তাবৎ এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে।

আমরা নির্জ্জীব বাঙ্গালী—চিরদাসত্বে একেবারে উৎসাহহীন হইয়া

পড়িয়াছি, আমাদিগকে ভয় দেখাও, আমরা ভুলিয়া যাইব। এই সকল ন্যায়-বিচারের কথা বলিলে, আমরা ঐ চতুর্দ্দিক-বেষ্টিত স্থানে আবদ্ধ হইব; ভয় দেখাও,—আমরা আর দুদিন পরে সকল কথা ভুলিয়া যাইব; আবার তোমরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া ধর্ম্মের কথা লইয়া পৃথিবীকে ভুলাইতে যাইও; বলিও, তোমাদের শাসনে 'ভারত যার পর নাই সুখে অবস্থিতি করিতেছে!' কিন্তু স্মৃতিময়ী কাহিনীর হাত এড়াইবে কি প্রকারে? ইতিহাসের পৃষ্ঠা ঢাকিয়া রাখিবে কি প্রকারে? পৃথিবী তোমাদের কথায় ভুলিবে কেন? অন্তর-যুদ্ধ কি কারণে দেশমধ্যে প্রজ্জ্বলিত হয়,তাহা সকল ইতিহাসে শোণিতাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে; তোমাদের চেষ্টায় সেই সকল কথা ধৌত হইবে না। ধৌত হইবে না—১৮৫৭ সালে যে ঘটনা ভারত-কপালে একবার ঘটিয়াছে, তাহা আর অপনীত হইবে না।

যাঁহারা রাজভক্ত, এইবার তাঁহাদিগের সহিত আমাদের মতের বিরোধ উপস্থিত। তাঁহারা বলেন, ইংরাজের দ্বারা যাহা পাইয়াছি, তাহা কখনও আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। পরিষ্কার পথ ঘাট, তাড়িতবার্ত্তাবহ, রেল-গাড়ী, কলের জাহাজ, বিদেশীয় বাণিজ্য, সুশাসন, সুপ্রণালী, উচ্চ-শিক্ষা,—যে শিক্ষায় আমাদের মন সতেজ হইয়াছে, সেই শিক্ষা, পুরাণ-উদ্ধার, এই প্রকার শত সহস্র উন্নতি-সূচক কথার প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁহারা বলিবেন,—বৃটন যাহা ভারতকে দিয়াছে, তজ্জন্য চিরকাল ভারতের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত! আমরা বলি—বৃটন আজ পর্য্যন্তও নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদিগকে কিছুই দেয় নাই,—আমরা প্রত্যেক বিষয় লইয়া তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি। যেখানে স্বার্থ,সেই খানেই দ্রুত পদনিক্ষেপে ইংরাজ অগ্রসর হইয়া বাহাবা লইতেছেন, কিন্তু যেদিকে স্বার্থ-নাশ, সেদিকে ফিরিয়াও চাহিয়া দেখেন না; শত শত বার স্মরণ করাইয়া দিলেও, ইংরাজের কর্ণে তাহা প্রবেশ করে না। সেই সকল বলিব কি? রাজভক্ত বাঙ্গালি! যে পথে ইংরাজের স্বার্থনাশ, সে পথ যে চিরকাল তোমাদের নিকট রুদ্ধ, তাহা কি তোমরা দেখিতেছ না? আমরা দেখাইব না; ইংরাজ আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ বলিবে, তোমরা আমাদিগকে গালি দিবে। আমরাও এইবার হইতে সকল ভুলিয়া যাইব,—এইবার হইতে আমরাও 'জলমিশ্রিত দুগ্ধ' হইতে দুগ্ধপান করিব, জল পরিত্যাগ করিব। এইবার হইতে আমরা ডেলহাউসির রাজত্ব বিস্মৃত হইব,—এইবার হইতে ক্লাইবকে স্মৃতি-পথ হইতে অপসৃত করিয়া

দিব ; এইবার হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা ভুলিয়া যাইব, এইবার হইতে ইংরাজ রাজত্বের অত্যাচার-শূন্য ন্যায় বিচারের আড়ম্বরময় কাহিনী গুলিয়া গুইকুমারের সহিত বনে যাইব। যাইব—বিলম্ব করিব না। যে শিক্ষার বলে আমরা আজ মুখ খুলিয়া কথা বলিতে পারিতেছি, এই শিক্ষার গুণগান করিব ; যে বাষ্পীয়-বথ স্থাপিত হওয়াতে স্বদেশীর টাকা বিদেশীর তাহে দিয়া অনায়াসে দশ মাসের পথ দশ দিনে যাইতেছি, এই রেল গাড়ীর প্রশংসা করিব;—প্রশংসা করিব,—একটীকেও ছাড়িয়া দিব না ; সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া একত্র করিব, করিয়া সেই গুণরাশির উপরে বসিয়া চিরকাল ইংরাজের গুণগান করিতে করিতে অনন্ত-কাল-সাগবে এই মানব দেহকে ভাসাইব! কিন্তু একটী কথা! ভাবী বংশ? ভাবী বংশও কি আমাদের ন্যায় ইংরাজের পদলেহন করিবে? ইহা আমরা সহ্য করিতে পারি না। আমাদিগের জীবনকে বিক্রয় করিয়াও ভাবী বংশকে যদি পরঋণ হইতে মুক্ত করিয়া রাখিয়া যাইতে না পারিলাম, তবে আর আমরা মানুষ হইয়াছিলাম কেন? আমাদের জীবন বিক্রয় করিযাছি, যাহাতে ভাবীবংশকে আর ইংরাজের নিকট আত্মবিক্রয় কবিতে না হয়, তাহা যদি করিয়া যাইতে না পারি ; তবে আমাদের মন একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে! ভারতবাসি! বর্ত্তমান জীবন বিক্রয় করিয়া ভাবী ঋণ হইতে ভারতকে মুক্ত করিয়া যাও দেখি!!

কি কথা বলিতে বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম! আমরা অঙ্কিত করিতে বসিয়াছি,—ভারতের কলঙ্কের সূত্রপাত—১৮৫৭ সালের সিপাহি-বিদ্রোহের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত। ডেলহাউসির সুবিস্তীর্ণ রাজত্ব-কালে ভারত যে সকল রত্ন স্বীয় অঙ্গ হইতে খুলিয়া বৃটনের অঙ্গে অর্পণ করিয়াছিলেন, সে সকল রত্নরাজির কথা এইক্ষণও স্মৃতির পথ অতিক্রম করে নাই। অযোধ্যা, পঞ্জাব, মুলতান,সাতাবা,ঝান্সি,ব্রহ্ম প্রভৃতি রত্নকে অঙ্গ হইতে খুলিবার সময় ভারত যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই নিশ্বাসের সম্মুখে একটু অগ্নিকণা পড়িয়াছিল, সেই অগ্নিকণা প্রজ্বলিত হইতে হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতকে বিকম্পিত করে। সেই অগ্নিকণা দিল্লির রাজত্বের মধ্যে ধীকি ধীকি জ্বলিতেছিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর সাহার মৃত্যুর পর বাহাদুর সা সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার রাজত্বকালীন উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাঁহার মহিষী জেনাৎমেহাল একটী সন্তান প্রসব করেন, তাঁহার নাম জেয়ানবক্ত। ইংরাজ-রাজগণ অনেক দিন

পর্য্যন্ত চক্রান্ত করিয়াও দিল্লীশ্বরকে একেবারে ক্ষমতাশূন্য করিতে পারেন নাই, এই সময়ে তাঁহারা মোগল সম্রাটদিগকে দিল্লি হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য নূতন অভিসন্ধি করিলেন; কিন্তু সহসা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সমস্ত দিল্লি নগর ক্ষেপিয়া উঠিবে, এই আশঙ্কায়, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সম্প্রতি ফকিরউদ্দিনের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবেন, এই অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য, দিল্লিনগরীতে ফকিরউদ্দিনের উত্তরাধিকারিত্বের ক্ষমতা ঘোষণা করা হইল। জেনাৎমেহাল অন্তঃপুরে থাকিয়া তাঁহার ঔরসজাত পুত্রের ভাবী অন্ধকারময় পথ কল্পনা করিতে করিতে অস্থির হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ফকিরউদ্দিন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই সময়ে জেলাৎমোহলের আনন্দের সীমা রহিল না। লর্ড ক্যানিং একটু ক্ষুণ্ণ-চিত্ত হইয়া এই রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য মূর্জামাহম্মদ ফরাসের সহিত আবার চক্রান্ত করিলেন; এবং কিছুদিন পরে তত্রস্থ এজেণ্টকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র লিখিলেন,—

১।—রাজার পত্রের উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইলে, তুমি এই বলিবে যে, মূর্জা জেয়ানবক্ত সিংহাসন পাইবে না।

২।—রাজার মৃত্যুর পর মূর্জামাহম্মদ ফরাস দিল্লির সিংহাসন পাইবে।

৩।—ফকিরউদ্দিনের সহিত যে প্রকার বন্দোবস্ত ছিল, মূর্জামাহম্মদ ফরাসের সহিতও সেই সেই বন্দোবস্ত, কিন্তু রাজ উপাধির পরিবর্ত্তে তাঁহাকে সাহাজাদা উপাধি গ্রহণ করিতে হইবে।

৪।—* * * *

৫।—পূর্ব্ব-স্বীকৃত এক লক্ষ টাকার স্থানে ভবিষ্যতে মাসিক ৫০০০০ সহস্র টাকা মাত্র দেওয়া যাইবে।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া জেনাৎমেহাল ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; বৃদ্ধরাজা মহিষীর মনতুষ্টার্থ তাঁহার কথায় সম্মতি দিলেন; তিনি প্রাণপণ করিয়া অন্তরে, বাহিরে স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। জেলাৎমেহালের ধারণা ছিল, যদি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাৎ জন্মায়, তাহা হইলে বিদেশীর সাহায্য লইয়াও ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিবেন। এই সকল ঘটনার পর জেয়ানবক্ত একদিন বলিয়াছিলেন, 'অল্প সময়ের মধ্যেই ইংরাজরাজত্ব তাঁহার চরণে

মর্দ্দিত হইবে।’ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বহ্নি, সে অগ্নিকণা হইতে প্রজ্জলিত হইয়াছিল, সে বহ্নি জেনাৎমেহালের হৃদয়ে ছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিলেন যে, দিল্লীশ্বর পারস্য এবং অন্যান্য রাজন্য সহিত চক্রান্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে মনস্থ করিয়াছেন; কিন্তু দাম্ভিক ইংরাজ-মনে সহসা এসকল আশঙ্কার কথা বিশ্বাসযোগ্য বোধ হইল না। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই বিদ্রোহের কথা সমস্ত দিল্লিময় ছড়াইয়া পড়িল। পতিত দেশকে জাগরিত করিবার জন্য যে উৎসাহযুক্ত কথার আবশ্যক, তাহা যথাসময়ে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ‘ইংরাজ-রাজত্ব উচ্ছন্ন যাইবার সময় আসিয়াছে’ এই কথা জনৈক ধার্ম্মিক মুসলমান দেশময় রাষ্ট্র করিল; ইংরাজগণ হিন্দুর নাম লোপ করিবে, যাঁহারা খ্রীষ্টীয়ান হইতে অস্বীকার করিবে, তাঁহাদিগের মৃত্যু নিশ্চয়’ ইত্যাদি প্রকার নানা কথা নানা ছন্দে সমস্ত দেশবাসীদিগকে উৎসাহিত করিয়া দিল। সমস্ত দেশ সমরের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। আমাদিগের পরিচিত ধনপৎসিংহ এই সময়ে দিল্লিতে ছিলেন; তিনি দিল্লি হইতে শরৎচন্দ্রের নিকট নিম্নলিখিত পত্র খানি লিখিয়াছিলেন,—

“যে বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, সে বাসনা ফলবতী হয়েছে। দিল্লীশ্বর নানা কারণে উত্তেজিত হইয়াছেন। অযোধ্যার বেগম এবং নাগপুরের মাহারাষ্ট্রীয়গণ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া, দিল্লীশ্বরের সহিত যোগ দিয়াছেন। পারস্য দেশের রাজা দিল্লীশ্বরকে সাহয্য করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বিথোর রাজা নানাসাহেব একান্ত মনে, সকল স্থানের সংবাদ লইতেছেন; অল্প দিন মধ্যেই বিদ্রোহ আরম্ভ হইবে। তুমি আর বিলম্ব করিবে না। নানাসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া তোমাকে কানপুরে থাকিতে হইবে; আমি কোথায় থাকিব, তাহা ঠিক হয় নাই। নানা সাহেবকে তোমার কথা বলিয়াছি; তাঁহার অধীনের ২০ নম্বর অশ্বারোহীর তুমি কর্ত্তা হইবে; শীঘ্র আসিও, তুমি কানপুরে ছাড়িয়া পাটনায় গিয়াছ কেন? আমি ইতিমধ্যে একবার কানপুরে যাইয়া শুনিলাম, ‘তুমি পাটনা গিয়াছ। আমার ইচ্ছা আছে, আমিও কানপুরে যাইব। যাওয়া ঠিক হইলে আগামী শনিবারের পর শনিবার কানপুরে যাইব; তুমি ঐ রোজ আমার সহিত কানপুরে সক্ষাৎ করিও। মোট কথা ১৫ই মৈর পূর্ব্বে কানপুরে আসিবেই আসিবে।” তোমার—ধনপৎসিংহ।

পুরাকালীন কোন ঘটনা-পরম্পরায় কানপুর ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে প্রসিদ্ধ

[illegible] পৌরাণিক সময়ের গৌরবের কোন চিহ্ন এখানে পাওয়া যায় না। কানপুরের উত্তরদিকে অনন্ত-বাহিনী গঙ্গা হিমালয় শেখর হইতে অবতরণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; দক্ষিণদিকে মানবের হস্ত-রচিত প্রসিদ্ধ প্রশস্ত পথ, এলাহাবাদ হইতে দিল্লি পর্য্যন্ত স্বর্ণরেখার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। উত্তর পূর্ব্বদিকে আর একটী প্রশস্ত পথ লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে আর একটী পথ বিঠোর পর্য্যন্ত গিয়াছে। কানপুরের ভৌগলিক বিবরণে ইহা অপেক্ষা আর কিছুই নাই; কোন বিখ্যাত ঘটনার জন্য কানপুর বিখ্যাত নহে। বাণিজ্য সম্বন্ধে—কেবল মাত্র চর্ম্মের কারবার প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সৈন্য স্থাপনের জন্য কানপুর প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সমস্ত কানপুর ছয় মাইল মাত্র প্রশস্ত, এই ছয় মাইলের অধিকাংশই ইংরাজদিগের আবাসস্থান। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কানপুরে ইংরাজ বেতন-ভোগী পদাতিক তিন সহস্রেরও অধিক ছিল, ইউরোপীয় পদাতিক প্রায় ৩০০ তিন শত এবং অশ্বারোহীও কম নহে। হুইলার সাহেব এই সময়ে কানপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। হুইলার দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে অদ্বিতীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়া স্বীয় নাম বিখ্যাত করেন। মিরাটে এবং দিল্লিতে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন কুটিল রাজনীতিজ্ঞ এই হুইলার সাহেব, স্বীয় অধীনস্থ সৈন্যর মধ্যে কোন অসন্তোষের চিহ্ন দেখিতে সক্ষম হয়েন নাই, পরন্তু দর্পসহকারে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট লিখিয়াছিলেন,—'কানপুরের কোন আশঙ্কা নাই।' অন্তরে অন্তরে সৈন্যগণের মধ্যে যাহা জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহার বিষয় তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু মে মাস যেমন অতীত হইতে লাগিল, অমনি তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে একটু একটু গোলযোগ উপস্থিত হইল। সৈন্যগণের মধ্যে এই কথা একেবারে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, 'হিন্দু এবং মুসলমান সৈনগণকে পৃথিবীর নিম্নে কোন স্থানে একত্রিত করিয়া প্রোথিত করা হইবে।' দেশীয় সিপাহি সৈন্যগণ এই কথা বিশ্বস্ত সূত্রে শ্রবণ করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। হুইলার সাহেব বৃথা চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের মনের এই ভাব যখন অপনয়ন করিতে অক্ষম হইলেন, তখন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। কানপুরের উত্তর পশ্চিম দিকে "ম্যাগাজিন" ভিন্ন উৎকৃষ্ট আশ্রয় স্থান আর ছিল না, কিন্তু সহসা সিপাহীদিগেকে দূরীভূত করিয়া তাহাতে আশ্রয় লইলে, সিপাহীগণ পূর্ব্বেই হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবে, এই সকল

ভাবিয়া হুইলার সাহেব কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে সাহায্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কানপুরে এই সময়ে এই প্রকার জনরব উঠিল যে, বিদ্রোহী সৈন্যগণ একেবারে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিবে। দুই এক দিনের মধ্যেই, হুইলার সাহেব কলিকাতার সাহায্যের আশা পরিত্যাগ করিয়া, এলাহাবাদে পলায়নের প্রস্তাব ঠিক করিলেন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌ হইতে সাহায্যার্থে হে সাহেব সহসা উপস্থিত হইল। লরেন্স সাহেবের নিকট হইতে সাহায্য আসিবার পর, হুইলার সাহেব বিথোর-রাজ নানা সাহেবের নিকট সাহায্যের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ অত্যাচারে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অন্তরে এইক্ষণ যে বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট পাইবেন, কি সাধ্য? নানা সাহেব চিরকাল রাজভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, সহসা সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, ইংরাজ মহলে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। ডেলহাউসি যদিও নানা সাহেবের সৈন্য-বল বৃদ্ধি করিবার পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছিলেন; তথাপি বর্তমান সময়ে যাহা ছিল, তাহা কানপুরস্থ ইংরাজদিগের সৈন্য অপেক্ষা নিতান্ত সামান্য নহে। বিথোর পথের সম্মুখে রাজকোষ স্থাপিত, সহসা সেই স্থান হইতে দুইমাইল অন্তরে নানা সাহেবের দুই শত সৈন্য, কামান প্রভৃতি সংগ্রাম সজ্জা সহ নবাবগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল। ২২শে মে তারিখে এই ঘটনা ঘটে, উক্ত দিন কানপুরের সমস্ত দোকান প্রভৃতি বন্ধ ছিল। ২৩শে মে দ্বিতীয় অশ্বারোহী দল মাতিয়া উঠিলে, ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া নানা স্থানে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মে মাসের শেষ সপ্তাহে (২৪শে হইতে ৩১শে পর্য্যন্ত) অন্তরে যতই থাকুক না কেন, বাহিরে আর কিছুই প্রকাশ পায় নাই। মে মাস এই ভাবে অতীত হইল।

জুন মাসের প্রথমে কার্য্যারম্ভ হইবার কথা ছিল; কিন্তু সিপাহীগণের মধ্যে কার্য্যারম্ভ সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ বাধিয়া গেল। কাহার ইচ্ছা, হঠাৎ আক্রমণ করা, কাহার ইচ্ছা বিলম্বে, ধীরে ধীরে। অশ্বারোহীগণ অল্প সময়ের মধ্যেই অস্থির হইয়া উঠিল। নানা সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ম্যাগাজিন এবং রাজকোষের প্রতি কটাক্ষ করিয়া নবাবগঞ্জে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, ভাবিতেছেন,—এক মুহূর্ত্ত মধ্যে এ সকল তাহার হস্তগত হইবে। অন্য দিকে, সিপাহী অশ্বারোহীগণ উৎসাহিত চিত্তে ইংরাজ-শোনিতে দেশকে প্লাবিত করি-

যার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সময়ে দ্বিতীয় অশ্বারোহী দলের সুবাদার টিকা সিংহ নানাসাহেবের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য একদিন একত্রিত হইয়াছিলেন। টিকাসিংহ বলিলেন—"তুমি ম্যাগাজিন এবং রাজকোষের ভার লও, আমি সমস্ত হিন্দু এবং মুসলমান সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া, ইংরাজ শোণিতে দেশকে প্লাবিত করিব।" নানা সাহেব উত্তর করেন—"আমি দুই দিকেই আছি।" দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য সৈন্যগণ অস্থির হইয়া পড়িল। তাহারা ম্যাগাজিন এবং রাজকোষের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, আর সর্ব্বত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে লাগিল। নবাবগঞ্জের কয়েদীদিগকে ৪ ঠা জুন তাহারা মুক্ত করিয়া দিল; এবং সবকারী দ্রব্যাদি সকল নিমেষের মধ্যে ভস্মাবশেষে পরিণত করিল। ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ গর্ত্তে আশ্রয় লইল। এই প্রকারে স্থানে স্থানে প্রকাশ্য বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।

এপর্য্যন্তও দিল্লি যাত্রার কথা সৈন্যগণের মন হইতে অপসৃত হয় নাই। দিল্লির রাজাকে সাহায্য করিবার জন্য, সৈন্যগণ একমত হইয়া নানা সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু মুসলমানদিগকে সাহায্য করিতে নানাসাহেবের বড় ইচ্ছা ছিল না, আপনি বিখ্যাত হইবার জন্য তৃষিত; তিনি সমস্ত সৈন্য লইয়া ৫ই জুন কলিয়ানপুরে আড্ডা স্থাপন করিলেন।

নানাসাহেব এইক্ষণ বিপুল ক্ষমতাশালী, সমস্ত সিপাহীগণ তাঁহার অধীন, ভাবিলেন—দিল্লির জয়ে আমার কোন লাভ নাই। জয়ের পরে যদি সমস্ত সৈন্যগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন কি করিব? দিল্লীশ্বর হয়ত আমাকে সম্মান নাও করিতে পারেন? আর কানপুরে থাকিলে, আমিই এই স্থানের রাজা হইব,—মুহূর্ত্তমধ্যে ইংরাজ-রাজত্ব ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আমার অধীনে যে সৈন্য—যে মহাবল একত্র, মনে করিলে, আমি কি না করিতে পারি? একমুহূর্ত্তমধ্যে মহারাষ্ট্রীয় বিজয় নিশান গগনে উঠাইয়া মনের বাসনা পূর্ণ করি! এই সকল কথা মনে ঠিক করিয়া তিনি কলিয়ানপুরের প্রত্যেক সৈন্যের মত পরিবর্ত্তন করিলেন, এবং সমস্ত সৈন্যবলকে কানপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

ধর্ম্ম-প্রসিদ্ধ ভারতের কলঙ্কই বল, আর যাহাই বল; এই প্রকারে সে কলঙ্কের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যে প্রভুভক্ত নানাসাহেব ইংরাজমহলে

"রাজভক্ত" বলিয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিপত্তি পাইয়াছেন,—ইংরাজগণের নিকট শব্দময় আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি পাইয়াছেন, সেই নানাসাহেব সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া আজ ইংরাজের প্রধান শত্রু,—আজ কানপুরের হত্যাকাণ্ডের প্রধান উদ্যোগী। কে বলিবে, ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ-রাজত্ব অত্যাচারশূন্য? যাঁহার সাহস থাকে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া নানাসাহেবের জীবন অধ্যয়ন করুন, বুঝিবেন, বিনা অত্যাচারে ভক্তের শীতল রক্ত কখনও উষ্ণ হইয়াছিল না। ভারত-সন্তানের রক্ত সে প্রকার কৃতজ্ঞতা-শূন্য নহে। নানাসাহেব সিংহের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া একেবারে ৬ই জুন হুইলার সাহেবের নিকট স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাত করেন! নানাসাহেব নির্জীবের ন্যায় কার্য্য করেন নাই;—গোপনে হঠাৎ ইংরাজের দুর্গ আক্রমন করেন নাই; এটী ভারতবাসীর পক্ষে অল্পগৌরবের বিষয় নহে। এই দিনের পর মুহূর্ত্ত হইতে যদি ইংরাজরাজত্ব উঠিয়া যাইত, তবে আমরা ক্লাইব এবং নানাসাহেবের জীবন সমালোচনা করিয়া বলিতাম, এক জন পরধনে-মুগ্ধ চোরের ন্যায় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সিরাজের সিংহাসন অপহরণ করিয়াছিলেন, আর একজন বীরের ন্যায় আহ্বান করিয়া ইংরাজ পরাক্রমকে পরাজয় করিয়া স্বীয় জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু হতভাগ্য ভারত, গুর্ক্ষা সৈন্যগণের বিশ্বাসঘাতকতায়, মুক্তশৃঙ্খল আবার পায়ে পরিতে বাধ্য হইল!!

নানাসাহেবের অধীনে আরো কয়েকটী ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন; তাহাদিগের মধ্যে সকলেই হিন্দুবংশসম্ভূত। টিকাসিংহের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমাদার দুলগনজন সিংহ এবং সুবাদার গঙ্গাদিন অল্প পরিশ্রম স্বীকার করেন মাই। আর একটী লোক,—সেই লোকটীর ন্যায় পরাক্রমশালী লোকের এই সময়ে নিতান্ত আবশ্যক ছিল; সেই লোকটী আমাদের পরিচিত শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র ধনপৎসিংহের পত্র পাইয়া পাটনা হইতে কানপুরে আসিয়াছেন, তিনি এইক্ষণ একদল অশ্বারোহীর কর্ত্তা। ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা হিন্দুচরিত্রে দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন, কানপুরের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সকলেই হিন্দু ছিল। কিন্তু ইংরাজ অত্যাচার না থাকিলে ভারতের এ পাপচিত্র আজ আমাদিগকে অঙ্কিত করিতে হইত না। অত্যাচার-ভিন্ন অন্তরযুদ্ধ উপস্থিত হয় না। ৫ই জুন নানা সাহেব হুইলার সাহেবের নিকট প্রকাশ্য পত্র লেখেন; ৬ই আক্রমন আরম্ভ হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

———o———

গভীর নিশীথে।

যে আভ্যন্তরীণ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতকে বিলোড়িত করিয়াছিল, কানপুরের হত্যাকাণ্ড, তাহার একটী স্ফুলিঙ্গ মাত্র। ইতিহাস এই বিষয় বিবিধ বর্ণে চিত্রিত করিয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। দুশ্ছেদ্য চিরদাসত্ব-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ভারত মধ্যে মধ্যে যে প্রকার লোমহর্ষণ ঘটনার অবতারণা করিয়া থাকে, তাহা অনন্তকাল ইতিহাসপটে লেখা থাকিবে। কানপুরের হত্যাকাণ্ডের সহিত আমাদের প্রস্তাবের যতটা সংশ্রব আছে, আমরা তাহাই বর্ণনা করিব; সিপাহি-যুদ্ধের ইতিহাসে অন্যান্য ঘটনা লিখিত আছে।

আজ কানপুরের হত্যাকাণ্ডারম্ভের পূর্ব্বদিন। যে অগ্নি ধীকি ধীকি অল্পে অল্পে জ্বলিয়া জ্বলিয়া মহা প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিণত হইয়াছিল, সেই অগ্নি আজ আর জ্বলিতেছে না; সমস্ত দিন ধূম উদ্গীরণ করিয়া এইক্ষণ থামিয়া রহিয়াছে, এই বহ্নি কল্য প্রজ্বলিত হইবে। যাহারা এই কাণ্ডের নায়ক, তাহারা উৎসাহিত মনে অপেক্ষা করিতেছে।

রাত্রি দেখা দিল, সূর্য্যদেব যেন ভয়ে ভয়ে, আপন আলোককে নিবাইয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন; এদিকে চন্দ্রমা প্রফুল্লবদনে ভারতকে হাসাইতে আসিয়া গম্ভীরভাবে বসিলেন, কানপুরের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রজনী গাঢ়তর হইয়া আসিল, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনি, গুপ্ত পরামর্শ, গোপনীয় গমনাগমন ক্রমে ক্রমে সকলই থামিয়া আসিল। কেহ ময়দানে, কেহ ঘরে, কেহ বাহিরে, যে যেস্থানে পাইল, সে, সেস্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সহরের চতুর্দ্দিকই গুপ্ত বিদ্রোহিদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ, অথচ আজ অসময়ে সকলি নীরব হইল। প্রকৃতিদেবী কি ভাবিয়া যেন আজ নীরবের সাজ পরিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্রের চক্ষে নিদ্রা বসিল না, তিনি আস্তে আস্তে শয়ন ঘরের দরজা খুলিয়া বহির্গত হইলেন, সঙ্গে একখানি তরবারি লইলেন, কেন লইলেন তাহা তিনিও বোধ হয় তখন জানিতেন না;

তাঁহার মন চিন্তায় অভিভূত। গৃহ হইতে এক মাইল দূরে তরঙ্গময়ী গঙ্গা তর তর শব্দে লহরী তুলিতে তুলিতে সাগর সন্নিধানে যাইতেছে;—কত গ্রাম, কত পল্লী, এবং কত নগরের পদসেবা করিতে করিতে আস্তে আস্তে যাইয়া সাগরে স্বীয় অস্তিত্ব বিলীন করিতেছিল। নিশানাথ প্রফুল্ল-বদনে জলস্রোতকে দীপ্তিমান করিয়া অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত করিতেছিল। শীতল-বায়ু-বিলোড়িত কল কল তরঙ্গ সমূহ মনের উল্লাসের সহিত চন্দ্রের, আলো হৃদয়ে ধরিয়া, হাসিয়া বেড়াইতেছিল। সহস্র সহস্র বীচিমালা একই সময়ে উত্থিত হইয়া, বাল-সুলভ চঞ্চলতার পরিচয় স্বরূপ. একটার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া অন্যটার প্রফুল্লতা বিনষ্ট করিয়া স্বীয় মনের সুখে হাসিতেছিল। এই প্রকারে কত তরঙ্গ লীন হইল, আবার কত নূতন তরঙ্গ সেই স্থান পূর্ণ করিয়া মনের আনন্দে, মাতার ক্রোড়ে শিশুর ন্যায়, হাসিয়া হাসিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছিল। আকাশের একদিকে হঠাৎ একটু মেঘ উঠিল, পরের আহ্লাদে কাতর হইয়া. পরের হাস্যমুখ মলিন করিবার জন্য উদিত হইল। জলতরঙ্গ চঞ্চল হইয়া মলিন বেশে কলরব করিয়া উঠিল, মাতার নিকটে দুঃখের কথা দুঃখের স্বরে বলিতে লাগিল। মেঘের মধ্য হইতে কোন কোন পরদুঃখ-কাতরা দেবকন্যাগণ, সৌদামিনী বেশে, দণ্ডে দণ্ডে দেখা দিয়া আশ্বাসিত করিতে লাগিল। মেঘ-প্রতিবিম্বিত জলতরঙ্গের নিকটবর্ত্তিনী স্থান সমূহে মিটী মিটী নক্ষত্রগণের আলো জ্বলিতেছিল।

শরৎচন্দ্র এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া অবশেষে এই নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। সেই স্থানের গম্ভীরতায়, নিস্তব্ধতায় তাঁহাকে ঘোরচিন্তায় নিমগ্ন করিল, তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া সেই স্থানের সেই ভাব-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া, তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেন আন্দোলিত হইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে আবার কি ভাবের উদয় হইল তিনি বলিতে লাগিলেন,—"তটাভিঘাতিনী মাত তরঙ্গিনি! তোমার হৃদয়ে আজ কেন এত আনন্দ-লহরী উত্থিত হইয়া বিলোড়িত হইতেছে! অন্য দিন তোমাকে দেখিলে হৃদয় দুঃখে অবসন্ন হইত, আজ তোমাকে দেখিয়া কতভাবের উদয় হইতেছে। তোমার নীল-পরিধান কল্য রক্তিমায় পরিণত হইবে, এই জন্য কি তোমার আজ এত প্রফুল্লতা দেখিতেছি? কল্য তোমার মনের বাসনা

পূর্ণ হইবে বলিয়া কি তোমার মনে হর্ষ-পবন বহিতেছে? আর হৃদয় নাচিতেছে? নীরবে র'লে কেন? তুমি কত জনকে কুল কুল করে কত প্রবোধ দিয়া সুখী করেছ, আমার প্রশ্ন শুনে নীরব হলে কেন? আমি কি তোমার সুখের কণ্টক হলেম,—আমি কি তোমার আহ্লাদের কণ্টক? নচেৎ হঠাৎ এভাব ধারণ করিলে কেন? বল,—সুখদায়িনি, ভাবুকের শক্তিউত্তেজিত-কারিনি, শরৎচন্দ্রের জীবন-তোষিনি, নীরব হলে কেন, বল? বল, আমা হ'তে যদি তোমার দুঃখ অপনয়নের পরিবর্ত্তে আরো দুঃখ বৃদ্ধি হয়, তা হলে বল, আমি চলে যাই!"

হঠাৎ আকাশের দূরস্থিত মেঘ আসিয়া চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল, চতুর্দ্দিক সহসা অন্ধকারে আবৃত হইল; শরৎচন্দ্রের মনে বিষাদ-তরঙ্গ নাচিতে লাগিল, চঞ্চল নয়ন বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, —এ আবার কি? আমার বিষাদ-সমুদ্রে আবার তরঙ্গ উঠিলো কেন? চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত। সে প্রফুল্লতা কোথায়? কে এ সময়ে এমন সুখের বাধা জন্মাইল?" নীলিম আকাশের কোণে মেঘ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, —তোমার এই কাজ? তোমার নিকট আমি কি অপরাধ করেছি যে, তুমি হঠাৎ আমার সুখের বাধা দিলে, প্রকৃতির সুখ হরণ করিলে? তোমাকে সকল সময়েই চঞ্চল দেখি, আজ এভাব ধারণ করিলে কেন? বায়ুভরে স্থানান্তরে চলে যাও, আমার মনে আর কষ্ট দিওনা। এই বিমল চন্দ্রমা উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের সহিত কত আহ্লাদে ক্রীড়া করিতেছিল, তুমি বাধা দিলে কেন? আমি এখানে এসেছি বলে? আমি কি এমনি নরাধম যে, যেখানে যাই, সেইখানেই বিষাদ-তরঙ্গ উত্থিত হয়?" আকাশে চন্দ্রমাকে না দেখিয়া —"জগৎসুখ! হায় তুমিও হাস্যবদন লুকাইলে?

হঠাৎ করস্থিত তরবারির প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "শরৎসুখ! তুমিও মলিন হলে? তোমার সে চাক-চিক্য কোথায়? যাহা দেখিলে হৃদয়মন উৎসাহে মাতিয়া উঠে, কই তোমার সেই উজ্জ্বলতা? এইত কিছু কাল পূর্ব্বে তুমি কত নবভাবে মত্ত হয়ে নাচিতেছিলে, আস্ফালিত হতেছিলে, এর মধ্যে আবার তোমার এ পরিবর্ত্তন কেন? আমার বল, ভরসা, সাহস, সকলি তুমি, তুমি আমার প্রতি বিরক্ত হচ্চো কেন? বাঙ্গালীর জীবন বলে? বাঙ্গালীর হস্তে তোমার পবিত্র অঙ্গ কলুষিত হবে বলে? চির নিস্তেজ বাঙ্গালী—এই জন্য কি তোমার মনে ঘৃণা হইতেছে? শরৎচন্দ্রের প্রতি এত বিরক্ত হলে কেন? আমি

কি এমনি কৃতঘ্ন যে, তোমার নামে কলঙ্ক রটাইব,এ জীবন থাকিতে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করিয়া ক্ষান্ত হবো ? তবে এভাব ধারণ করিলে কেন ? তোমার মনে সন্দেহ হইতেছে, কেন সন্দেহের ত কোন কারণ দেখি না, আমিত সেই শরৎচন্দ্র, আমার কি সাহস নাই ? এই দেখ, তোমাকে সেই ভাবেই চালনা করিতে পারি," এই বলিয়া তরবারি চালনা করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিফল-যত্ন হইয়া বলিলেন,—'একি এ ? হস্ত নিস্তেজ হলো কেন ? এইত দুঘণ্টা পূর্ব্বে কেমন অস্ত্রচালনা করিতেছিলাম, এরি মধ্যে এত পরিবর্ত্তন ! এত পরিবর্ত্তন হলো কেন ? মন ! ভাল জিজ্ঞাসা করি, তুমি এত চঞ্চল হচ্চো কেন ? তোমার সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কোথায় ? রজনী প্রভাত হয়ে আসিল,এমন সময়ে তুমি এত চঞ্চল,অধীর হলে কেন ? তুমি কি ভাবিতেছ ? বাঙ্গালীর মন চঞ্চল, তা তুমি ত বেশ জান্‌তে, তবে কার্য্যের সময় সে কথা ভুলে গিয়া আবার চঞ্চল হচ্চো কেন ? সুখ-ইচ্ছা বাঙ্গালী জীবনের স্পৃহ-নীয়, আদরনীয় বস্তু,—সংসারের বিষফল, তাত তুমি জান, তবে তোমার আবার সুখ ইচ্ছা হইতেছে কেন ? বিলাস-প্রিয়তা বাঙ্গালী জীবনের উন্ন-তির কণ্টক, তা ত তুমি বেশ জান,তবে তোমার আবার সে বিলাস-ইচ্ছা হই-তেছে কেন ? স্বার্থ-প্রণয় বাঙ্গালী জীবনের অধীনতার মূল সূত্র, একথা তুমি অনেক দিন হইতেই জান, তবে তোমার হৃদয়ে আবার সে বিষফল অঙ্কুরিত হইতেছে কেন ? তুমি কি না জান ?—সংসারের বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হওয়া অন্যায়, তবে তুমি আবার মায়ায় জড়িত হইতেছ কেন ? 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'—এ মন্ত্র তোমার চিরসম্বল, একথা আজ বিস্মৃত হইতেছ কেন ? এ প্রশস্ত পৃথিবীর মধ্যে তোমার কে আছে যে,তার জন্য তুমি ব্যাকুল হইতেছ ? সংসারে কে কাহার ? চক্ষু বুজিলে সকলই ফাঁকি, তবে তুমি এত অধীর হইতেছ কেন ? তবে তুমি ভারতের জন্য প্রাণ দিতে কাতর হইতেছ কেন ? এজীবন যাহা হতে পাইয়াছ, সেই ভারতের জন্য এ শরীরের রক্তপাত করিতে কাতর করিতেছ কেন ? কি ভাবিতেছ ? কোন্‌ প্রতিমা তোমাকে অধিকার করিতেছ ? এমন সুখের সময় কে তোমার মনে সন্দেহ-মেঘ উঠাইল ? কে সেই কালফণীর বিষের কথা তোমার স্মৃতি-পটে উঠাইল ? এই জন্য কি তুমি নিদ্রায়িত হইতেছিলে না ? এই জন্য কি তোমার এত বিড়ম্বনা, ধিক মন, এসময়ে কাপুরুষের ন্যায় কাজ করা তোমার উচিত নহে !!'

বিজয়ী একজগতে অতি বিরল, মনুষ্য চরিত্র বিচিত্র! আমরা যাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক, জীতেন্দ্রিয় মনে ভাবিয়া প্রশংসা করি, তিনিও পবিত্র আকর পরমেশ্বরের নিকট অপবিত্র! সম্পূর্ণতা সম্যকরূপে মনুষ্য-জীবনে প্রায় ঘটে না। পক্ষান্তরে দেখিয়া অবাক হই, সংসারে আমরা যাহাকে সম্পূর্ণতা মনে ভাবি, তাহাই অসম্পূর্ণ! একথা শুনিতে তত ভাল নহে বটে, কিন্তু কখন কাহারও চরিত্রে কালিমা উদিত হয় নাই, একথা কেহই বলিতে পারেন না। ধার্ম্মিক তাঁহাকে বলি, যিনি সরল ভাবে স্বীকার করেন, 'সম্পূর্ণতা জগতে লাভ করা যায় না, বিজয়ী হওয়া যায় না', নচেৎ যাঁহারা বিজয়ী বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চক, কপটী, ধর্ম্ম পথের কণ্টক বলিয়া উপেক্ষা করি। মনুষ্যের জীবন চঞ্চলতার কর্ষিতক্ষেত্র, বাঙ্গালী জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেই চঞ্চলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রও বাঙ্গালী, সুতরাং তাঁহাতে এই অসাময়িক চঞ্চলতা অসম্ভব নহে।

রাত্রি অবসান হইয়া আসিল, আঁধারের কোলে অল্প আলোক ভাসিল। ফুটন্ত ঈষৎরক্তাভ আলোকমালা দিক্‌দিগন্তরে ভ্রমণ করিয়া দিনের আগমন-বার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই নদী তীরে ধ্যানে নিযুক্ত রহিলেন, মনুষ্য-জীবনের অসারসুখ কল্পনায় সৃজন করিয়া এত আহ্লাদিত হইলেন যে, সকল বিষয় ভুলিয়া গিয়া একমাত্র সেই বিন্ধ্যবাসিনীকে ধ্যান করিয়া বাঙ্গালী জীবনের অসারত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্র একাগ্রমনে বিন্ধ্যবাসিনীর জীবন-ঘটিত সকল কথা মনে মনে কল্পনা করিয়া চিত্রিত করিতে লাগিলেন। বিন্দুর সেই সরল হাসি,—সেই সরল ব্যবহার, সেই সরল কথাবার্ত্তা একে একে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। এক দিন আলুলায়িতাকেশ বিন্ধ্যবাসিনী মলিন বেশে গবাক্ষ-পথে, হস্তের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া, একাগ্রমনে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহার বদনে দণ্ডে দণ্ডে কতপ্রকার নব নব ভাব প্রকাশ পাইতেছিল; শরৎচন্দ্র এক দিন অন্তরালে থাকিয়া এ সকল দেখিয়া যত সুখ অনুভব করিয়াছিলেন, আজ এই নির্জন প্রদেশে কল্পনায় তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণতর সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

আর একদিন বিন্ধ্যবাসিনী অন্তরালে থাকিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া শরৎচন্দ্রকে দেখিতেছিলেন, শরৎচন্দ্র জানিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে

দেখিতেছ কেন?' বিন্ধ্যবাসিনী মস্তক দোলাইয়া তাহাই উত্তর করিলেন, দুইজনের মধ্যে কত ভালবাসার স্রোত প্রবাহিয়া গেল; এ সকল কথা আজি একে একে শরৎচন্দ্রের মনে উদিত হইতে লাগিল; সুখও দ্বিগুণতর অনুভূত হইতে লাগিল।

অনুভবে ও কল্পনায় যে সুখ পাওয়া যায়, কার্য্যকালীন সে সুখ পাওয়া যায় না, কার্য্য আসে আর যায়। কার্য্যের সময় সুখ আয়ত্ত হয় না। সে সময়ে মন এত নিগূঢ়রূপে নিযুক্ত থাকে যে, সুখ, সুখ বলিয়া হৃদয়ে অঙ্কিত হয় না। কিন্তু বহুদিন পরে যখন সেই কথা কল্পনায় উদিত হয়, তখন দ্বিগুণতর সুখ উপভোগ করা যায়। শরৎচন্দ্র আজ প্রথম তুলি ধরিলেন, জীবনে আর কখনও সুখের আয়ত্ত করেন নাই। আজ তুলি ধরিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর সরল মূর্ত্তি, সরল ভাব, সরল হৃদয়ে চিত্রিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুখ আয়ত্ত হইল না, রজনী প্রভাত হইল, কোলাহল দিক ব্যাপিয়া আকাশে উঠিল। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনিতে দিক্ পূর্ণ হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ জ্বলিয়া উঠিল। শরৎচন্দ্রের হাত হইতে সহসা তুলি খসিয়া পড়িল। বিন্ধ্যবাসিনীর রূপ-চিন্তা হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল।

শরৎচন্দ্রের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, পুন সাহসে মন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি সহসা পূর্ব্ববৎ তরবারি হস্তে লইয়া চালনা করিতে লাগিলেন; পারকতায় তাঁহার অপার আনন্দ হইতে লাগিল। তিনি সেই স্থান হইতে উঠিয়া দলে মিশিতে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হত্যাকাণ্ড।

আর এক পা,—মনে ভয় হইতেছে? ধীরে, ধীরে, ধীরে, বাঙ্গালী পাঠক! আর এক পা অগ্রসর হও। ক্ষণস্থায়ী মানবের জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে কি প্রকারে অনন্তকাল-প্রবাহে মিশায়, তাহা কল্পনা করিলে শরীর বিকম্পিত হয়? কল্পনায় আইসে না? ধীরে, ধীরে, অভ্যাস কর, ফিরিওনা, অগ্রসর হও। এই যা!—তোমরা আসিতেছ না? অতীত-সাক্ষী ইতিহাস তোমাদিগের জ্ঞানের এই অভাব মিটাইবে।

আজিও দিন, আর পূর্ব্বে সময়ের আবর্ত্তনে রজনীর পর মুহূর্ত্তে যে আলোক মস্তকোপরি শোভা পাইত, সেও দিন। দিনের তারতম্য নাই, কিন্তু অদ্যকার দিন শোণিতাক্ষরে চিরদিন, চিরকাল মানব হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে, ইংরাজ-হৃদয় হইতে আর কখনও প্রক্ষালিত হইবেনা। ইংরাজ-হৃদয় হইতে প্রক্ষালিত হইবে না,—সে ভাল না মন্দ? আমাদের মনে যদি ভাবী আশা-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে,—আর আমরা যদি রাজনীতিজ্ঞ হই, তবে বলিতেই হইবে, এ ঘটনায় পরে ভারতবাসীর অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তন দীর্ঘ-স্থান ব্যাপিয়াছে, এই ঘটনায় ইংরাজ চাতুরীবলে ভারতবাসীদিগকে ক্রীড়ার পুত্তুলের ন্যায়, ভবিষ্যতে সতর্ক হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে ঘুরাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইবে। নচেৎ এইক্ষণ যে ভাবে আছি, ইহাতে বলিতেই হইবে, মধ্যে মধ্যে ইংরাজদিগেকে সতর্ক করিয়া দেওয়া ভাল, কারণ আমরা আশা-শূন্য, আমাদের বল, বীর্য্য চির-অস্তমিত; ইংরাজগণ একটু ভয় না পাইলে আমাদের অস্থি মাংস অত্যাচারে পুড়িয়া অঙ্গার হইবে। আর ধার্ম্মিকেরা কি বলিবেন, কে জানে?

নগরবাসি! পলাও,—ঐ দেখ সৈন্য আসিতেছে;—একটী, দুইটী, পাঁচটী, পঞ্চাশটী, শতটী, কি ছাই গণিতেছ? পলাও, পলাও, ঐ দেখ অনন্ত প্রবাহ আসিতেছে! কত গণিবে? পদাতিকের দল চলিয়া যাইতে লাগিল। কোথায় যাইতেছে? এত সৈন্য কোথায় ছিল? এক হাজার, দুই হাজার, চলিতে চলিতে দশহাজার পদাতিক একসারি চলিয়া গেল। তারপর একি? অশ্ব কেন? শিক্ষিত বীরপুরুষগণ সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট,—তরবারি নিষ্কোষিত; অশ্ব চলিতেছে,—তড়াক, তড়াক, তড়াক। নগরবাসি পলাও, পলাও, আজ সুখের বিপণি ভাঙ্গিবে; আজ সুখের মেলা মিলিয়া যাইবে। এখনও দেখিতেছ? পলাও, নচেৎ তোমাদিগকে কে রক্ষা করিবে? একদল অশ্বারোহী চলিয়া গেল, তাহার পশ্চাতে ও কি দেখা যাইতেছে? সকলের সজ্জা এক রকমের, এ দেখি অন্য রকমের; সকলের আকৃতি এক রকমের, এ আকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এ ব্যক্তি কে? এ ব্যক্তি কি বলিতেছে? নিস্তব্ধ হও, শুন, কি বলিতেছে!

নির্ভীক নগরবাসি! এখনও পলাইতেছ না? ঐ দেখ আবার কি আসিতেছে। রণবাদ্য,—বাজিতেছে,—ঝম, ঝম, ঝম। বাজিয়া নিরুৎসাহ চিত্তকেও ক্ষণকালের জন্য উৎসাহিত করিতেছে,—ঝম,-ঝম,-ঝম। রণবাদ্যের

দল টলিয়া গেল। নরনারী সকলে যেন সং দেখিতেছে। আর কতক্ষণ দেখিবে? ঐ দেখ প্রবল ঝড়ের ন্যায় বায়ু বহিয়া আসিতেছে। এ আবার কি, কিসের শব্দ কাণে প্রবেশ করিতেছে? প্রলয়ের ঝড়? যদি তাই হয়,—নগরবাসী পলাও,—পলাও, প্রলয়ের ঝড় আসিতেছে। যখন ঝড় আসিল, তখন নগববাসীগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। অশ্বের দ্রুতগমনে ধূলা বর্ষিত হইতে হইতে দিক্ অন্ধকারময় হইল। একটী অশ্ব? আর না হইলে দশ হাজার; নগরবাসীগণ কেহ পুত্র-হারা, কেহ ভার্য্যা-হারা, কেহ বন্ধু-হারা, কেহ পিতা-মাতা-হারা হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল; তাহাদিগকে বায়ুতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল, গোলমালে দিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন কেহ কেহ বলিতে লাগিল, কোম্পানিকো মল্লুক, কোম্পানিকো জয়;—কোম্পানিকো? মূর্খ নগরবাসি! তোব কোম্পানির সাধের বিপণি আজ ভাঙ্গিয়া যায়; আজ তাহাদের ডাকিতেছিস্ কেন?

ওদিকে দুর্গে কামান গর্জ্জিয়া গগনভেদ করিল,—দুড়ুম—দুম্—বম্; দুড়ুম দুম্ বম্। একটী, দুইটী, তিনটী গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে একেবারে পঞ্চাশটী কামান গর্জ্জিয়া দিক্ সমূহকে অন্ধকারে আবৃত করিয়া ফেলিল। কামান আবার গর্জ্জিতে লাগিল,—দুড়ম দুম্ বম; দুড়ুম দুম্ বম্। কে ভয় করিবে? নির্ব্বোধ ইংরাজ সাহস থাকে, সম্মুখ সমরে আয়, দেখি তোদের বীর-অহঙ্কার চূর্ণ করিতে পারা যায় কি না? নচেৎ গৃহপিঞ্জর হইতে তোর গর্জ্জন—দুড়ম-দুম-বম্‌কে, কে ভয় করিবে? একদিন ভারতে ছিল, যখন তোর গর্জ্জন-দুড়ুম দুম্ বমের ভয়ে শরীর কম্পিত হইত, এখন কে ভয় করিবে? ভয় নাই, সৈন্যগণ অগ্রসর হও! পাঁচজন পদাতিক মরিল, এই দশজন, এই ত্রিশজন? ভয় পাইওনা; সৈন্যগণ দুর্গের দ্বারে যাও। কামান আর কতক্ষণ গর্জ্জন করিবে? ঐ দেখ ক্রমে ক্রমে গর্জ্জনের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। ভয় নাই, সৈন্যগণ! বীরের ন্যায় দুর্গের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হও। নির্ব্বোধ ইংরাজ! আর কতক্ষণ গর্জ্জিবে? ঐ দেখ আর বারুদ নাই; ঐ দেখ গোলার সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে। নির্ভয়ে পদাতিকগণ, অগ্রসর হও, আর ভয় নাই। কামানের গর্জ্জন থামিয়া আসিল। হতভাগ্য বৃটিশ সৈন্যগণ! তোদের দর্প আজ চূর্ণ হইবে। আজ তোদের পতন অনিবার্য্য! নির্ভয়ে সৈন্যগণ অগ্রসর হও! দুর্গ জয় করিলে তোমরা এ দেশের অধিকারী হইবে; ইংরাজের দৌরাত্ম্য, অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে ত, নির্ভয়ে

সৈন্যগণ অগ্রসর হও। দুর্গের দ্বার রুদ্ধ। ভাঙ্গ্ দরজা ভাঙ্গিয়া ফ্যাল, কাহার সাধ্য দরজা ভাঙ্গে? ক্রমে ক্রমে সমস্ত পদাতিক-দল আসিয়া দুর্গ বেষ্টন করিল; পদাতিকের রণবাদ্য বাজিয়া বলিতে লাগিল,—ভাঙ্গ দরজা, ভাঙ্গিয়া ফ্যাল। কাহার সাধ্য দরজা ভাঙ্গে? একেবারে সহস্র সহস্র বন্দুকের গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে দুর্গ কাঁপিয়া উঠিল, তবুও দরজা ভাঙ্গিল না; পদাতিকদল দরজা ভাঙ্গিতে পরাস্ত হইল। প্রথম অশ্বারোহীদল আসিল। অশ্বারোহীর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি বলিলেন,—কামান দাগাও, কামান দাগাও; বন্দুকের কি সাধ্য যে দুর্গের দরজা ভাঙ্গিতে পারে? অমনিই কামানের ভীমরব গর্জ্জিয়া উঠিল, একেবারে কুড়িটী কামানের গভীর হুঙ্কার খাইয়া দরজায় প্রহৃত হইল, দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। সৈন্যগণ তখনি নির্ভয়ে দুর্গে প্রবেশ করিল। রণবাদ্য অমনি বাজিয়া উঠিল, দুর্গ আক্রান্ত হইল। অত্যাচারী ইংরাজগণ কোথায়? কাহার সাধ্য বহ্নির বেগ নিবারণ করিবে? বহ্নি হুহু শব্দে জ্বলিয়া উঠিয়া গৃহ বাড়ী সব ভস্মময় করিতে লাগিল! ইংরাজ-পতঙ্গ উপায়হীন হইয়া বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে লাগিল!! সাবধান! চতুর ইংরাজদিগকে বিশ্বাস নাই, পৃথিবীর আর সকলকে বিশ্বাস করিও, কিন্তু বণিকবেশধারী চতুর ইংরাজদিগকে বিশ্বাস করিও না। সাবধান! অশ্বারোহীগণ, অশ্ব হইতে অবতরণ করিও না; ঐ দিকে অগ্রসর হও! অহঙ্কারী—আত্মাভিমানী—কৃতঘ্ন—বিশ্বাসঘাতক ইংরাজগণ কোথায় লুক্কায়িত হইয়া আছে, অনুসন্ধান কর! ঐ যে, দুইদল ইংরেজ সৈন্য! অগ্রসর হও! হুইলার এবং মুর সাহেবের মস্তক ছেদন না করিতে পারিলে নিস্তার নাই, অশ্বারোহীগণ নির্ভয়ে অগ্রসর হও! চতুর্দ্দিক বেষ্টন কর। দেখ যেন একটী প্রাণীও না পলায়ন করে; সাবধান! সাবধান? রণবাদ্য বাজিয়া বলিতে লাগিল—সবধান, সবধান!! মূর্খ অশ্বারোহীগণ ও কি করিতেছ? লুট করিবার সময় এ নহে। অশ্বারোহীগণ ওকি করিতেছ? শত্রুর বীজ রাখিতেছ কেন? ঐ যে বৃটীশ ললনাগণ সমরে আসিতেছে, ঐ যে বালকগণ, সাবধান কেহ যেন পাশ কাটিয়া না যায়! ঐ যে নৌকায় উঠিল, নির্ব্বোধ সৈন্যগণ চাহিয়া দেখিতেছ? নৌকাকে ছাড়িয়া দিতে কে বলিল? এলাহাবাদে নৌকা যাইবে?—যাইতে দিও না। অগ্রসর হও! মুলতান-সমরের শেষ পরিণাম তোমাদের স্মরণ নাই? ইংরাজ অত্যাচার ভুলিয়াছ? শত্রুর বংশ ধ্বংশ করিবার সময়ে আবার মায়া দয়া

কি ? সৈন্যগণ বীরের ন্যায় অগ্রসর হও! ঝম্-ঝম্-ঝমা-ঝম্ বাজিয়া রণবাদ্য বলিল, আর বিলম্ব করিও না। ধর্ নৌকা, একটীকেও রাখিও না। সমস্তকে অসি-আঘাতে নিপাত কর। সাবধান! প্রধান সিংহদ্বয়কে বধ করিও না! নৌকা নদীজলে ডুবাও, নৌকা নদীজলে ডুবাও।

সহর নিষ্কণ্টক হয় নাই! সাহেবের বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান কর! অশ্বারোহীগণ! নির্ভয়ে বাড়ী বাড়ীতে প্রবেশ কর। কাহাকেও রাখিও না; সমূলে ধ্বংশ কর, ইংরাজ-গৃহে গৃহে আগুন লাগাও। দ্রুত বেগে সৈন্যগণ, দ্রুতবেগে অগ্রসর হও। চিরদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার সময় এই, সৈন্যগণ! কি দেখিতেছ, অগ্রসর হও!—কৃতঘ্ন, কাপুরুষ! তোমার অসি এখনও রক্তে সিক্ত হয় নাই? শীঘ্র যাও, ঐ যে একটী শ্বেত-ভল্লুক পলাইতেছে, যাও নির্ভয়ে, অসিকে রক্ত-সিক্ত কর। দেখিব, কে কতবার অসিকে রক্ত-সিক্ত করিতে পারে। তুমি একবার করিয়াছ, আচ্ছা তুমি কিছু পুরস্কার পাইবে! তুমি দুইবার, তুমি তিনবার, তুমি দশবার, তোমরা উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে। তুমি শতবার, এই ক্ষুদ্র রাজ্য তোমার হইবে। যাও সৈন্যগণ, নির্ভয়ে যাও, যদি রাজ্য পাইবার আশা থাকে, তবে শতবার অসিকে রক্তে সিক্ত কর।

দিবা অবসান হইয়া আসিয়াছে, সৈন্যগণ! অস্ত্র রাখিয়া যাইওনা! কি বিশ্বাস? উন্নত-ফণা বিষম ভুজঙ্গিনীকে গৃহে দেখিয়াও বিশ্বস্ত মনে বিশ্রাম করিও, কিন্তু অস্ত্রধারী ইংরাজ যে নগরে, কি গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, সে গ্রামে কি নগরে স্বাধীনভাবে বাস করিতে, কি বাঁচিয়া থাকিতে অভিলাস থাকিলে, ইংরাজের শোণিত ভূতলে না পড়িলে আর বিশ্বাস করিও না। এখনও স্থানান্তর হইতে ইংরাজ আসিতে পারে। যাও নির্ভয়ে, ইংরাজের বাড়ীতে প্রবেশ কর। লুট করিবার এই সময়, যাও নির্ভয়ে লুট সংগ্রহ কর।

এই প্রকার ক্রমাগত তিন সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত ছিল; ইতিহাসে তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; আমরা এইক্ষণ আমাদিগের আখ্যায়িকার অংশ গ্রহণ করিব। ৬ই জুন হইতে জুলায়ের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইংরাজগণ এক দিনও সুস্থ চিত্তে থাকিতে পারে নাই।

যখন সমস্ত সৈন্যগণ শ্রেণীভঙ্গ করিয়া লুটপাটে নিযুক্ত হইল, তখন শরৎচন্দ্র অশ্বকে দ্রুত চালাইয়া একটী সাহেবের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন;

তখন বেলা অবসানপ্রায়। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাটী নিস্তব্ধ,কোথায়ও লোক আছে, বোধ হইল না; তিনি অশ্ব নিম্নে বাঁধিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিতেছিলেন,আর ভাবিতেছিলেন,—'আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল; কাম্নপুর নিষ্কণ্টক হইল, পূর্ব্বে এবাড়ীতে প্রবেশ করে, কাহার সাধ্য ছিল? পূর্ব্বে এ বাড়ী ইংরাজ-দর্পে ও অহঙ্কারে পূর্ণ ছিল, আজ একেবারে সে দর্প চূর্ণ হইল! ছাদের উপরে এইক্ষণও ইংরাজের নিশান একাধিপত্যের পরিচয় দিতেছে, যাই, অগ্রে ঐ নিশানকে পদতলে মর্দ্দন করি; উহাকে মর্দ্দন করিতে না পারিলে আর সুখ কি?' এই কথা ভাবিতে ভাবিতে, শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহ চিত্তে সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন; উপরে উঠিবার সময় একটী শব্দ হঠাৎ কর্ণে প্রবেশ করিল; ছাদে উঠিয়াই দেখিলেন, তিনি যে দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। আরো দেখিলেন, যেখানে তাঁহার অশ্ব আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে স্থানে অশ্ব নাই। একটু বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ আবার ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। স্থানান্তরে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার অশ্ব একবার শব্দ করিল, তিনি অশ্বের নিকটে যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন; মনে নানা প্রকার সন্দেহ হইতে লাগিল, ভাবিলেন, 'শত্রু গৃহে আমি একা।' ক্ষণকাল পরেই আবার নির্ভয়ে উপরে উঠিলেন; উঠিয়া যেখানে সেই বিজয় নিশান উড়িতেছিল, সেইখানে যাইয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকালমধ্যে তাঁহার মন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; স্বীয় তোরণ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া, বাম হস্তে নিশান-দণ্ডকে ধরিলেন। নিশান হস্তস্পর্শে কম্পিত হইল, তিনি সক্রোধে বলিতে লাগিলেন,—

"বিজয় নিশান! আর কেন? দুরাচারী, পাপিষ্ঠ, ঘোরতর অত্যাচারী ইংরাজ-রাজত্বের তুমি একাধিপত্য প্রচার করিতেছ? আর কেন? এইক্ষণই তোমাকে পদতলে মর্দ্দন করিব! কে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে? এই আমি তোমাকে ধরিয়াছি, কে তোমাকে আমার হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারে? আর এক মুহূর্ত্ত! আর মুহূর্ত্ত পরে তোমার স্থানে স্বদেশীয় নিশান উড়াইয়া মনের বাসনা মিটাইব,—আর মুহূর্ত্ত পরে তোমার অস্তিত্ব ভূতে মিশাইব!"

পতাকা দর্পে কম্পিত হইল! শরৎচন্দ্র স্বীয় অসি উত্তোলন করিবেন,

এমন সময়ে হঠাৎ অসিতে আঘাত লাগিল।—একি! শরৎচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, চারিজন ইংরেজ রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শরৎচন্দ্র যাই কটাক্ষ করিলেন,অমনিই তাহারা চারিজনে গর্জ্জিয়া,ভীমনাদে বলিল, 'অগ্রে যুদ্ধে আমাদিগকে পরাস্ত কর, তারপর বিজয়-নিশান ছিন্ন করিও।' এই বলিয়াই তাহারা ভীম রবে শরৎচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শরৎচন্দ্র আর সময় পাইলেন না, বলিলেন, 'তবে তাহাই হইবে।' এই বলিয়াই স্বীয় নিষ্কাসিত অসি বেগে সঞ্চালন করিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে অসি বিদ্যুৎবেগে বায়ু ভেদ করিয়া শরৎচন্দ্রের বাসনা পূর্ণ করিল, সেই প্রথম সঞ্চালনে সম্মুখ-বর্ত্তী ইংরাজ সহসা স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। দূরবর্ত্তী ইংরাজত্রয় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল; শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পরাজিত ইংরাজের হস্ত হইতে অসি বল-পূর্ব্বক কাড়িয়া লইলেন; দুইহাতে দুইখানি অসি বিদ্যুৎবৎ ক্রীড়া করিতে লাগিল। মূর্খ ইংরেজ! এ কামান নহে, এ ভারতবাসীর অস্ত্রচালনা; শরৎচন্দ্র ভীমনাদে বলিলেন, 'এখনও অস্ত্র রাখিয়া বশ্যতা স্বীকার কর, নচেৎ আর এক মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংসার হইতে বিদায় দিব। 'এদেশীয়ের নিকট ইংরাজ বশ্যতা স্বীকার করিবে? শেষ রক্ত বিন্দু শরীরে নিশ্চল না হইলে নহে,' এই বলিয়া ইংরাজ-পতঙ্গ বহ্নিতে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র অসিদ্বয় সঞ্চালন দ্বারা আবার অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন; যে মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, তার-পর মুহূর্ত্তে আর একটী মাত্র ইংরাজকে দেখা গেল। শরৎচন্দ্র এবার আর বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; অসির বেগ চতুর্থ ব্যক্তির প্রতি সঞ্চালন করিবেন, এমন সময়ে তাহার পায়ে বিষম আঘাৎ লাগিল। পড়িতে পড়িতে তিনি হস্তস্থ অসি, চতুর্থ ব্যক্তির প্রতি সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। ভূতলে পড়িতে পড়িতেই,সেই ইংরাজও ভূতলশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

শরৎচন্দ্র পড়িয়া অচেতন হইলেন। শরৎচন্দ্রের পায়ের আঘাৎ গুরুতর, সহসা সেইখানে একটী লোক আসিয়া শরৎচন্দ্রের পায়ে কি ঔষধ লাগাইয়া দিল; তারপর তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া একটী কামরায় প্রবেশ করিয়া একটী রমণীকে বলিল, "কি ভাবিতেছ, ইহার শুশ্রূষা কর।" স্ত্রীলোকটী বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কে কথা বলিল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না; সেই লোকটী মুহূর্ত্তের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে সেইখানে রাখিয়া অদৃশ্য হইল। কে আসিল? স্ত্রীলোকটী ভাবিলেন, যুবক-সৈন্যকে এইমুমূর্ষ

দশায় কে রাখিয়া গেল? যেই হউক, সাহেবের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি; আর ভয় নাই। স্ত্রীলোকটী এই প্রকার ভাবিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় শরৎচন্দ্রের একটু চেতনা হইল; বেদনায় শরীর অস্থির, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, শরৎচন্দ্র বলিলেন,—'জল, জল'। কিন্তু জল কোথায়! সেই স্ত্রীলোকটী আলোক লইয়া সকল ঘর অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোথাও জল নাই। ছাদের উপরে যাইয়া ইংরাজদিগের মৃত-দেহ দেখিলেন। কিন্তু জল পাইলেন না, সমস্ত বাড়ী অনুসন্ধান করিয়াও জল মিলিল না।

তাহার এক ঘণ্টার পর আর একটী স্ত্রীলোক একটী পাত্রে জল লইয়া সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকটী চিনিয়া বলিলেন, "তুই আসিয়াছিস্, বেশ হইয়াছে, তুই কেমন করিয়া আসিলি।' এই সময়ে শরৎচন্দ্র আবার বলিলেন—"জল।" এবার পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকটী একটী পাত্রে জল লইয়া বলিলেন,—জল আনিয়াছি, আমি যবনী নহি, পান করুন। স্ত্রীলোকটীর পরিধেয়, যবনীর ন্যায় ছিল। শরৎচন্দ্র কথা বুঝিলেন না, আবার বলিলেন, 'জল।' প্রথমোক্ত স্ত্রীলোকটী জল মুখে ঢালিয়া দিলেন। শরৎচন্দ্র একটু জলপান করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজদণ্ড।

ভাল হউক, মন্দ হউক, হতভাগিনী মালতীদেবী যে সন্তান প্রসব করিয়া রজনী বাবুর কলঙ্করাশি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সেই বিষ-স্বরূপ দুগ্ধপোষ্য বালকটী এক মাস যাইতে না যাইতেই স্বীয় অস্তিত্ব অনন্ত কাল-প্রবাহে মিশাইল। মালতীদেবী অটল মনে, দশমাসের সঞ্চিত রত্নকে চিরজীবনের তরে বিসর্জ্জিত হইতে দেখিলেন, একটুও চক্ষের জল ফেলিলেন না। মালতীদেবী,—মণিহারা-ফণিনী, কিন্তু মালতীর মন অটল; ভাবিলেন, এই ঘটনায় যদি পবিত্র রজনীবাবুর কলঙ্করাশি ধৌত হইয়া যায়, তবু ভাল। জীবনের একখানি অমূল্য রত্ন খসাইয়া, মালতীদেবী, রজনীবাবুর কলঙ্ক অপনয়নের আশায় উৎফুল্লচিত্ত হইলেন; কিন্তু, গরল-হৃদয় নরনারী এই ঘটনাকে আরো দোষের করিয়া তুলিল। এই ঘটনায়

রজনীবাবু রাজ-দ্বারে পর্য্যন্ত দণ্ডিত হইলেন। মালতীদেবীর অনুমত্যানুসারে মৃত পুত্রটীকে মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখা হইল।

এই ঘটনার পর, গোবিন্দপুরে রাষ্ট্র হইল যে, রজনী বাবুর ঔরষজাত, মালতী-দাসীর জারজ সন্তানকে মারিয়া মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখা হইয়াছে। রজনীকান্ত ঘোষের নিঃসন্তান মাতুলের মৃত্যুর পর, যখন তিনি গোবিন্দপুরে আসিয়া বিষয় দখল করেন; তখন কয়েকটী সম্ভ্রান্ত লোক, একখানি দলিল জাল করিয়া, একটী বিষয় তাঁহাদের নামে পাট্টা আছে, এই প্রকার সাব্যস্থ করে; কিন্তু হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী অনেকদিনের পুরাতন লোক, তিনি সকলই মিথ্যা প্রমাণ করিয়া তাঁহাদিগকে অপদস্থ করেন। সেই সময় হইতেই রজনী বাবু, তাহাদিগের নয়নের শূল-সম হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহারা ছিদ্র অন্বেষণ করিয়াও হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বিষয়-বুদ্ধির মধ্যে দন্তস্ফুটও করিতে পারে নাই। হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী জমীদারী কার্য্য কর্ম্মের বিচক্ষণতার জন্য গোবিন্দপুরে বিখ্যাত। সিংহ যেমন দুশ্ছেদ্য সুদৃঢ় লৌহফাঁদে আবদ্ধ হইয়া, অন্তরে অন্তরে, গর্জ্জন করে, গোবিন্দপুরের এই কয়েকটী সম্ভ্রান্ত লোকও, হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর দুর্ভেদ্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে পরাজয় করিতে না পারিয়া, সেই প্রকার থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিতেছিল। এইক্ষণ মালতীদেবীর সন্তান প্রসব এবং সেই সন্তানের অসাময়িক মৃত্যু, রজনী বাবুকে জব্দ করিবার তাঁহাদিগের একটী প্রধান অস্ত্র হইল। যে দিন গ্রামের সকলে জানিল যে, মালতী দাসীর জারজ সন্তানকে হত্যা করিয়া গোপনে মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখা হইয়াছে, সেই দিনই তাহারা একত্রিত হইয়া পুলিস কর্ম্মচারীগণের নিকট মিথ্যা জনরব সম্বলিত একখানি পত্র লিখিলেন। সাধক হঠাৎ এই সময়ে গোবিন্দপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আদ্যন্ত সকল ঘটনা শুনিয়া একটু দুঃখিত হইলেন; যাহা হউক, চেষ্টা করা তাহার একটী প্রধান মন্ত্রছিল। তিনি গ্রামস্থ সকল লোকের মনের গতি ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন; চেষ্টায় কতক কৃতকার্য্যও হইলেন। কিন্তু মকর্দ্দমা তখন গবর্ণমেণ্টের হাতে গিয়াছে। সাধক যেদিন আসিলেন; তাহার পরদিন প্রত্যুষেই পুলিস কর্ম্মচারীগণ আসিয়া রজনী বাবুর বাটীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধে মিথ্যা পত্র লিখিয়াছিলেন, এইক্ষণ অস্বীকার করিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে পুলিশ তাঁহাদিগকে লইয়া পীড়াপীড়ি করিবে,

এই আশঙ্কায় তাঁহারা প্রাণপণ করিয়া তাঁহাদিগের পত্রের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। অনুসন্ধানে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মৃত সন্তানের দেহ পাওয়া গেল। মকর্দ্দমার সত্যতা বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না, কারণ গ্রামের সকলেই একমত হইয়া বলিল, মালতী দাসীর জারজ সন্তানকে রজনী বাবু হত্যা করিয়াছে। রজনী বাবুর পক্ষে কেবল মাত্র হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, বিন্ধ্যবাসিনী এবং মালতীদেবী, ইহাঁদিগের কথা পুলিস কর্ম্মচারীগণ তাচ্ছিল্য করিয়া শুনিল না। পুলিস কর্ম্মচারীগণ কি কারণে যেন গ্রাম্য লোকদিগের দিকে গড়াইয়া পড়িল; তাহারা যতদূর পারিল, রিপোর্ট দিবার সময়ে প্রমাণ করিয়া দিল, 'রজনীবাবু কর্ত্তৃকই সন্তানের মৃত্যুক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।' মৃতদেহ পরীক্ষার্থ, গোবিন্দপুর যে জেলার অধীন, সেই জেলার সরকারী ডাক্তারের নিকট প্রেরিত হইল। ডাক্তার শরীর পরীক্ষা করিয়া লিখিলেন যে, সন্তানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর লক্ষণ কিছুই দৃষ্ট হইল না। দুই সপ্তাহ কাল পরে এই মকর্দ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইল। ডাক্তারের রিপোর্টের বিরুদ্ধে পুলিস কর্ম্মচারীগণ, তাহাদিগের মত পোষণার্থ কিছুই বলিলনা, গোবিন্দপুরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি পরাস্ত হইল; কিন্তু সন্তানের মৃত্যুর পর ঐ ঘটনা গোপন করিবার জন্য তাহাকে মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখা হয়; এ কথার বিরুদ্ধে মাজিষ্ট্রেট সাহেব রজনীবাবুর প্রমাণ গ্রহণ করিলেন না। বিচারকগণের চিরপ্রসিদ্ধ রোগের বশবর্ত্তী হইয়া, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮১৭ সালের ২০ আইননের * * ধারানুসারে রজনীবাবুর ৬ মাস কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানার আদেশ করিলেন। যখন রজনীবাবুর কারাবাসের আজ্ঞা হইল, তখন মালতীদেবী শোকে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন।

রজনীবাবুকে যখন কারাগারে লইয়া যায়, তখন তিনি হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে বলিলেন, "আমার যাহা হইল, তাহার আর কি হইবে, শীঘ্রই হাইকোর্টে আপিল করিও। মালতীদেবীর জন্য আমার এই কষ্ট উপস্থিত, ইহা তাঁহার হৃদয়ে শেলস্বরূপ বিদ্ধ হইয়াছে; তাঁহার শোকবিন্দু আবার উথলিয়া উঠিবে; তুমি তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে, যত শীঘ্র পার, পাঠাইয়া দিও; তারপর আমি যখন মুক্ত হইব, তখন আবার যাহা হয় করিব। আর বিন্ধ্যবাসিনীকে সাধকের সহিত যাইতে দিও। মালতীদেবী, বিন্ধ্যবাসিনী এবং সাধককে আর একবার আমার নিকটে লইয়া

আইল।" ক্ষণকাল পরে তাঁহারা তিন জনই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালতীদেবীর আকৃতি ক্ষীণ, মলিন,—মুখে কথা নাই, নয়নে জ্যোতি নাই, শরীরে স্ফূর্ত্তি নাই, দেখিলেই বোধ হয় যেন মনোমধ্যে কোন দুঃসহ কষ্ট হইতেছে, বোধ হয় যেন দারুণ কষ্টে প্রাণ অস্থির হইতেছে। মালতীদেবী কথা বলিলেন না, কথা বলিতে ইচ্ছা হইল না।—বিন্ধ্যবাসিনী অনিমেষ নয়নে রজনীবাবুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, সে দৃষ্টিতে কোমলতাও, পরদুঃখ কাতরতার—জ্বলন্ত ভাব জ্বলিতেছিল। সে দৃষ্টিতে—কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মনোমোহন ভাব জ্বলিতেছিল। বিন্ধ্যবাসিনী আস্তে আস্তে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য যে কষ্ট সহ্য করেছেন, এ জন্মে সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব, সে আশা নাই; তবে ইচ্ছা এই,—যতদিন বাঁচিব, ততদিন আপনাকে মনে রাখিব, আপনি ভুলিবেন না।"—বিন্ধ্যবাসিনীর নয়ন হইতে জল টস্ টস্ করিয়া পড়িতে লাগিল।

সাধক স্থির ভাবে বলিলেন--রজনি,যাও, অত্যাচারী রাজার অত্যাচারে দগ্ধ হও গিয়া; কাঁদিলে কি হইবে?

রজনীবাবু বলিলেন--পিত! আমি যখন বালক ছিলাম, তখন হইতে পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত,—যে দিন পথহারা হইয়া সেই সাগর সন্নিহিত অরণ্য-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর মধ্যে আপনাকে দেখিলাম, সেই দিনই আমার ইচ্ছা হইল, আপনাকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করি, কিন্তু আপনি কি ভাবিবেন, এই আশঙ্কায় তখন মনের বেগ সম্বরণ করিলাম। আপনার সহিত আবারও দেখা হইল, কিন্তু মনের সাধে এবারেও আপনার চরণ পূজা করিতে পারিলাম না; যাহাই হউক, আপনার নিকট আমার প্রার্থনা—সময় মতে আবার যেন আপনার দর্শন পাই।

সাধক বলিলেন—রজনি! কেন আক্ষেপ কর। সকল অবস্থায় যে মনের শান্তি রাখিতে না পারে, সে বালক; যখন যে অবস্থায় থাক, তাহাকেই সুখের বলিয়া জানিও। আমি এইক্ষণ বিন্ধ্যবাসিনীকে লইয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হইব; উপযুক্ত সময় হইলে আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সুখ ও দুঃখে যাঁহাদের মন সমভাবে থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য। তবে কেন বৃথা অস্থির হও?

রজনীবাবু সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন; সাধক হস্তোত্তোলন করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রজনীবাবু মালতীদেবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'দেবি! মনে দুঃখ রাখিবেন না; আমি স্বীয় কর্ম্মার্জ্জিত পাপের ফলভোগ করিতে চলিলাম; আপনার দোষে নহে। আপনি অযথা মনকে কষ্ট দিবেন না। মুক্ত হইলে আপনার শ্রীচরণ আবার দর্শন করিব। হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে বলিয়া দিয়াছি, তিনি সম্প্রতি আপনাকে আপনার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিবেন। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি পাইব, তখন আবার আপনাকে দেখিয়া নয়নকে তৃপ্ত করিব।

মালতীদেবী নীরবে রহিলেন। রজনীবাবু বিন্ধ্যবাসিনীর প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, 'বিন্দু! পিতার সহিত যাও! তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হইলে, আবার আমাকে স্মরণ করিও।

বিন্ধ্যবাসিনী নীরবে রজনীবাবুর চরণে প্রণাম করিলেন।

পেয়াদারা আসিয়া বিলম্বের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিতে লাগিল। রজনীবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—'চল, যাইতেছি।' রজনীবাবুর বদ্ধ-হস্ত ধরিয়া পেয়াদারা লইয়া চলিল। বিন্ধ্যবাসিনী একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, মালতীদেবী ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় সহসা ভূতলশায়িনী হইলেন।

সাধক নীরবে আশীর্ব্বাদ করিয়া হরগোবিন্দকে ডাকিতে গেলেন।

হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, মালতীদেবীকে লইয়া, তাঁহার পিত্রালয়াভিমুখে রওনা হইয়া গেলে পর, সাধক বিন্ধ্যবাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা! তবে তুমি এখন কি করিবে, বল?

বিন্ধ্যবাসিনী।—কি করিব?—আপনি যেখানে যাইবেন, আমিও সেইখানেই যাইব।

সাধক।—তোমার শরৎচন্দ্রের আশা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে ত? না তাঁহার অন্বেষণে যাইবে?

বিন্ধ্যবাসিনী।—আশা পরিত্যাগ করিতে হয় কি প্রকারে, জানি না। আমিই নয় আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু আশা আমাকে ছাড়িবে কেন? শরৎচন্দ্রের আশাকে বুকে বাঁধিয়াই আজও জীবিত আছি; নচেৎ আপনার পবিত্র চরণ আর দর্শন করিতাম না।

সাধক।—মা! এখানি কি জান?

বিন্ধ্যবাসিনী।—সাধন-সঙ্গীত।

সাধক।—পড়িয়া দেখ। তুমি ত গাইতে জান, একটা গান গাও ত।

বিন্ধ্যবাসিনী।--আমি কি গাইতে জানি? তবে আমার স্বর মিষ্ট, এই পর্য্যন্ত; আপনি গান করুন, আমি শুনি।

সাধক একটী সঙ্গীত গাইলেন। গীত সমাপ্ত হইলে সাধক বলিলেন, মা! শুনিলে?

বিন্ধ্যবাসিনী।—শুনিলাম; কিন্তু এখনও ভাব বুঝি নাই; এখনও বুঝিবার উপযুক্ত সময় হয় নাই।

সাধক।—মা! তুমি শরৎচন্দ্রের চিন্তায় কেন মনকে কষ্ট দিতেছ?

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, পিত, শরৎকে মনে ভাবি কেন? তা আমি জানি না। কি বলিব? আপনি কি না বুঝেন? সমস্ত সংসারে আরো কত ভালবাসার পদার্থ রহিয়াছে, তা কি আমি জানি না? কিন্তু মন ত আর কিছুই চায় না। শরতের মুখের সেই হাসি.—কেমনে বলিব,কেন সেই হাসি দেখিবার জন্য এ নয়ন অনিমেষ হইয়া চাহিয়া থাকে। আর কি হাসি নাই? আর কি ফুল ফুটে না? কিন্তু অন্য ফুলে ত আমার মন আকৃষ্ট হয় না। পিত, আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে আর পরীক্ষা করিবেন না।

সাধক।—তবে চল; আর তোমার মন ফিরাইতে চেষ্টা করিব না। মনে মনে ভাবিলেন, সময হইলে অবশ্যই মন ফিরিয়া আসিবে।

বিন্ধ্যবাসিনীকে লইয়া সাধক প্রথমত কলিকাতায় গেলেন, সেখান হইতে সত্যভামাকে সঙ্গে করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত কাশী, বৃন্দাবন, গয়া, প্রয়াগ, অযোধ্যা, আগ্রা, পাটনা, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন, কিন্তু কোথাও শরৎচন্দ্রের খোঁজ পাইলেন না?

যে দেশে যে প্রকার বেশ ভূষা প্রচলিত, তাঁহারাও সেই দেশে সেই প্রকার বেশ ভূষা করিতেন। সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া অবশেষে কানপুরে অবস্থিতি করেন। কানপুরে অবস্থান-কালীন তাঁহারা হিন্দুর বেশ পরিত্যাগ করিয়া, যবনের ন্যায় বেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

যখন কানপুরের হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়, তাহার দুই দিবস পূর্ব্বে বিন্ধ্যবাসিনী এবং সত্যভামাকে রাখিয়া, সাধক এক পক্ষের জন্য স্থানান্তরে লুক্কায়িত ভাবে ছিলেন।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

——o——

জীবনতোষিণী।

সেই প্রকাণ্ড পুরীর মধ্যে শরৎচন্দ্র গুরুতর আঘাতে ক্লান্ত হইয়া দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিলেন। আহত-স্থান চিকিৎসার অভাবে দিন দিন ভয়ানক রূপ ধারণ করিতে লাগিল; ডাক্তার নাই, কবিরাজ নাই, কে চিকিৎসা করিয়া শরৎচন্দ্রকে আরোগ্য করিবে? তাঁহার মনোহর রূপের উজ্জ্বলতা দিন দিন মলিন হইতে লাগিল; বল, উৎসাহ, সাহস, মানসিক শক্তি এবং বৃত্তি সকল ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া আসিল; জীবনের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল, তিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিলেন।

সেই যুবতী অহোরাত্র, একাগ্রমনে. যত্নসহকারে, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া উপকারী রোগীর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। শরৎচন্দ্রের মন অবিচলিত, এক মুহূর্ত্তের জন্যও চঞ্চল হয় নাই; তিনি স্বয়ং ধৈর্য্য ধরিয়া সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে লাগিলেন। দিন বাসয়া থাকিল না। সেই শক্ররক্ত-প্লাবিত, শ্মশান-সদৃশ কানপুরের এই শূন্য পুরীর মধ্যে শরৎচন্দ্র মৃত্যু-শয্যায় শয়ান, সম্মুখে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, যাহার মুখপানে তাকাইলে যন্ত্রণার উপশম হয়; কিন্তু তত্রাচ সময়ের অবিশ্রান্ত গতি ফিরিল না।

রোগের সময় রোগীর দূরস্থিত আত্মীয় স্বজনকে মনে পড়ে; শরৎচন্দ্রের মনে কি বাড়ীর কথা উঠে নাই? চঞ্চল জীবনে এই প্রকার ধৈর্য্য আজ পর্য্যন্তও আমরা প্রত্যক্ষ কবি নাই। শরৎচন্দ্রের মন অস্থির হইল, বাক্য বন্ধ হইল। সেই যুবতী কথা বলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও, শরৎচন্দ্র কথা বলিতেন না।

এই প্রকারে তিন দিবস অতীত হইল, চতুর্থ দিনে স্ত্রীলোকটী পায়ের ধারে বসিয়া শরৎচন্দ্রের ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিতেছিলেন; শরৎচন্দ্র কাতরস্বরে বলিলেন,—'আপনি ক্ষত স্থানে কি দিতেছেন? আমার আর বাঁচিবার আশা নাই। আমি আপনার ঋণে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইলাম।'

যুবতী। 'আপনি এত অস্থির হইবেন না; ক্ষত স্থান দিন দিন পূর্ণ হইতেছে; ঔষধটী আমি অল্প বয়সে শিখেছিলাম; ঈশ্বর করেন ত ইহাতেই আপনি রক্ষা পাইবেন।' শরৎচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; সংসারের মায়া আসিয়া মনকে ভুলাইল, বলিলেন, 'আপনি কে? আপনি এত যত্নসহকারে আমার সেবা করিতেছেন কেন? আমাকে ঋণে আবদ্ধ করিতেছেন কেন?'

পরদুঃখ-কাতর স্ত্রীলোকটী বলিলেন, 'আপনি রোগী, মনের উদ্বেগ বৃদ্ধি হইলে অনেক কষ্ট পাইবেন। আপনার পায়ের আঘাত আরোগ্য হইলে, সকল কথা বলিব। আপনার হাতে আমার জীবন পাইয়াছি, তাই আপনার সেবা করিতেছি।'

শরৎচন্দ্র আর কিছুই বলিলেন না, বেদনায় আবার শরীর অস্থির হইল, মুহূর্ত্ত দণ্ডের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, দণ্ড দিনে পরিণত হইতে লাগিল; শরৎচন্দ্র অচেতন হইলেন, চক্ষু নিমীলিত হইল।

রমণীর কোমল হৃদয়, গলিয়া গেল। ব্যগ্রতা সহকারে মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, সময়ে সময়ে বাতাস দিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্রের সর্ব্বশরীর উষ্ণবোধ হইতে লাগিল। এ কি জ্বর? কে বলিবে! স্ত্রীলোকটী মনে মনে ভাবিলেন, জ্বর হইয়াছে। রমণীপ্রাণ দুর্ভাবনার মন্দির, সেই মন্দিরে কত দুর্ভাবনা আসিয়া স্থান নিতে লাগিল! 'এবার আর রক্ষা নাই' এ কথা রমণীর হৃদয়ে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইতে লাগিল। চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু জল নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব দিন শরৎচন্দ্রের শরীরের যুদ্ধের বেশ খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'এই বেশই মৃত্যুর সহায়।' নয়ন হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল।

অনুরাগের চিহ্ন বল, ক্ষতি নাই, কিন্তু কখনও যদি রোগী হইয়া মৃত্যুশয্যায় শুইয়া থাক, আর কখনও যদি এই প্রকার একটী যুবতীকে শয্যার পার্শ্বে দেখিয়া ভুলিয়া থাক, তবে তোমরা রমণীর মন আজ পর্য্যন্তও বুঝিতে পার নাই। পর-দুঃখে যে মন গলিয়া যায়, সে রমণীর মন, তোমরা ইহাকে না বুঝিয়া অনুরাগের চিহ্ন বলিতে চাও, বল। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরে যাঁহার মৃত্যু নিশ্চয়, তাহার প্রতি মন ধাবিত হয় কাহার? তবে একটী কথা এই—পূর্ব্ব-স্মৃতি-আশায় মৃত্যুকেও আবার সজীব করিয়া, লোকেরা দেখিতে

চায়। রমণীর পূর্ব্ব-স্মৃতি! মধু-স্মৃতি-মাখা সেই হাত, সেই মুখ, সেই অধরপ্রান্ত, সেই ভ্রূ, সেই নাসিকা; স্মৃতির হাত এড়াইয়া সময়ের পরাক্রম এ সকলকে লুকাইতে সমর্থ হয় নাই, বীর পুরুষের ন্যায় শরৎচন্দ্র পড়িয়া আছেন,—মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে,—শরীর ক্ষীণ, আকৃতি ও বর্ণ ম্লান হইয়াছে, কিন্তু তবুও স্মৃতির হাত ছাড়া হয় নাই। স্মৃতি বলিয়া দেয়, এই সেই !!

সমস্ত দিবসের মধ্যে আর শরৎচন্দ্রের চেতনা হইল না, অল্প বেলা থাকিতে বারম্বার মুখ ব্যাদান করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকটী বুঝিয়া মুখে একটু জল ঢালিয়া দিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা শরৎচন্দ্র একটু সুস্থির হইলেন, সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিতে লাগিল, তিনি আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন;—

'মানুষের কি সুখ! ভ্রমবশত লোকে বলে, সংসারে সুখ আছে। আহা! আমি মরিতে বসিয়াছি, আমার মনে যে প্রকার সুখ হইতেছে, এ প্রকার সুখ পৃথিবীতে কোথায়? আমি কি পৃথিবী ছাড়িয়া আসিয়াছি? আমার শরীর কি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে?' শরৎচন্দ্র নিমীলিত-নেত্র, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য, আবার বলিতে লাগিলেন,—'এইত এক রাজ্যে উপনীত হইলাম; এস্থানের সকলেই আনন্দে নিমগ্ন। কোথায়ও নিরানন্দ দেখি না, যেন চিরকালের মত দুঃখ-রাজ্য হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছি! সংসারের কোলাহল কোথায়? প্রবল-পবনাহত মহীরুহচয়ের সে ভীষণ নির্ঘোষ,—জীমূতবৃন্দের সে ভয়ানক গর্জ্জন কোথায়? সংসারের দ্বেষ, হিংসা, প্রতারণা, শঠতা, ধূর্ত্ততা অল্পে অল্পে কোথায় চলিয়া গেল? চির আনন্দ প্রবাহ, চিরকাল ব্যাপিয়া প্রবাহিত, নৈরাশ্যের পরাক্রম এখানে নাই। এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না সত্য সত্যই আমি এ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি? সংসারের পাপ, প্রলোভন ত এখানে মন ভুলায় না; পুণ্যের বিমল জ্যোতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত, এ মধুর জ্যোতি রাত্রি আগমনে তিরোহিত হয় না, রাত্রির আধিপত্য এস্থল হইতে অনেক দূরে। যাহা দেখিতেছি, সকলই যেন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, অবনতির দিকে কাহারও মন নাই। সময়ের গতি এখানে নাই, চন্দ্র সূর্য্য এখানকার সময় বিভিন্ন করে না; কত আনন্দ, কত সুখ প্রবাহ,—বিবাদ, গঞ্জনা, শত্রুতা—রিপুদিগের পরাক্রম এখানে নাই; ঈশ্বর কি আমাকে এই রাজ্যের সুখ ভোগ করিতে দিবেন?'

'তোমার স্থায় লোকের জন্মই এই রাজ্য।' হঠাৎ যেন এই কথা শুনিলেন।

'কে বলিল একথা? কত আত্মা আমার নিকটে উৎসুকচিত্তে আসিতেছে, ইহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, আমাকে কোন কথা বলিবে, কিন্তু নিকটে আসিয়া আসিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। ইহারাই কি বলিল, 'তোমার স্থায় লোকের জন্মই এই রাজ্য?' বুঝিতে পারি না। আমি শরীর হইতে পৃথক হই নাই। শুনিয়াছি, সশরীরে পরলোকে প্রবেশ করা যায় না, তবে আমি অপৃথক অবস্থায় কি প্রকারে এসব দেখিতেছি?'

'মন! ভাবিও না,—আজ্ সময় না হইয়া থাকিলেও অবশ্যই এদিন আবার আসিবে,—যখন সংসার ছাড়িয়া এই স্থানের সুখ সম্ভোগ করিবে। এখানে পার্থিব কিছুই নাই, পাপ নাই, কেবল চির পুণ্য-জ্যোতি বিস্তৃত। পাপ শরীরের, পুণ্য আত্মার; পাপ শরীরের ইন্দ্রিয়গণের বিপর্য্যয়ের ফল; পুণ্য আত্মার উৎকৃষ্ট সঞ্চিত ধন—মনের আদর্শ—অলঙ্কার; তাই এখানে পাপ নাই। আত্মায় আত্মা চিনিতে পারে, মনে মন চিনিতে পারে, তাই এখানে সকলেই সকলের সহিত কথা বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে। আমাকে কেহই চিনিতে পারিতেছে না। তবে কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি।'

'আহা! অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া তাপিত হৃদয় শীতল হইল। তাপিত হৃদয়—এত দিন যেন দগ্ধ হইতেছিল। উঃ আমি কি নিষ্ঠুর—অনায়াসে কত শত সহস্র লোকের প্রাণ বধ করেছি, মনে একটুও দুঃখ হয় নাই। কিসের জন্য করেছি? দেশ উদ্ধারের জন্য। হৃদয়-অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য, এতদিন পরে যেন সেই কার্য্যের পুরস্কার পাইলাম; হৃদয় শীতল হইল। হৃদয় মন পুড়িয়া অঙ্গার হয়, হউক, সে জন্য তত দুঃখিত নহি, অন্তিমে যেন এই সুখ হইতে বঞ্চিত না হই। জগদীশ! আমি এই সুখ হইতে যেন বঞ্চিত না হই।'

"স্বদেশের জন্য তোমার স্থায় যাঁহাদের মন ব্যাকুল, তাঁহাদের জন্মই এই স্থান।" আবার যেন এই কথা শুনিলেন।

"আবার কে কথা বলিল? চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট মানবের স্বর কি এতদূর আসিতে পারে? তবে কোন্ স্থান হইতে শব্দ আসিতেছে? না—আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। একটু স্থির হই।"

ক্ষণকাল পরে শরৎচন্দ্র চক্ষু-উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে অজিন বেশে সেই যুবতী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন, দেখিয়া বলিলেন,

"দেবি! আপনার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি, মানবীর পক্ষে এতাদৃশ নিঃস্বার্থ পরোপকার-সাধন অসম্ভব, আপনি কি স্বর্গীয় দেবকন্যা?"

যুবতী। আপনার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আপনি অন্যদিকে মনকে ফিরাইবেন না, আরোগ্য হইলে আমার পরিচয় পাইবেন।

শরৎচন্দ্রের আবার যাতনা বৃদ্ধি হইল, মুহুর্মুহু শ্বাস বহিতে লাগিল, অতি কষ্টে বলিতে লাগিলেন—"উঃ আর সহ্য হয় না। এই দূরদেশে আমার সমদুঃখী আর কেহই নাই। এসংসারে আমার আপন জনই বা কে? আমি বন্ধু-শূন্য—আত্মীয়-শূন্য—আমি এজগতে একা। এই সংসার সাগরের আমিই একমাত্র ক্ষুদ্রতম বুদ্বুদ্; আমার আর কেহই নাই। উঃ প্রাণ যায়। আর সহ্য হয় না। গলা শুষ্ক হয়ে গেল;—জল—ল—ল।"

যুবতী পাত্র হইতে একটু জল মুখে ঢালিয়া দিলেন। শরৎচন্দ্র আবার হিজি বিজি, যাহা মনে আসিতে লাগিল, তাহাই বলিতে লাগিলেন;—

"আমি এখানে কেন? আমি সংসারের কীট—উড়িব, খেলিব, কোন ভয় নাই; এখানে আমাকে কে আবদ্ধ করিল? আমি এখনি চলিয়া যাই" এই বলিয়াই শরৎচন্দ্র উঠিতে লাগিলেন, যুবতী হস্ত দ্বারা বেগ নিবারণ করিয়া ভাবিলেন—"এ কি বিকারের লক্ষণ?"

শরৎচন্দ্র আবার বলিতে লাগিলেন, "আরো কষ্ট—আরো কষ্ট, উঃ প্রাণ যায়। আমি এই ভব-সাগরের জল বুদ্বুদ, জলে মিশিতে বসিয়াছি। আমি সংসারের পতঙ্গ, পুড়িয়া মরিতে বসিয়াছি, ইহাতে আবার স্বার্থ আছে। আমি যে প্রকারে মরিতে বসিয়াছি, এ প্রকারে কয়জন মরিতে পারে? এপ্রকার মৃত্যুতেও আমার কষ্ট হয় কেন? জন্ম কিসের জন্য? মৃত্যুর জন্য, স্বদেশের হিতের জন্য। তবে মরিব, তাহাতে ক্ষোভ, কষ্ট কি?"

"মন! চঞ্চল হ'চ্চ কেন? উঃ এই আবার প্রাণ যায়—এই আবার বেদনা। মৃত্যু! আর বিলম্ব কেন, এইক্ষণই আমাকে লও।"

শরৎচন্দ্রের শরীর রোমাঞ্চ হইল, মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, অস্ফুট স্বরে আবার বলিলেন;—"আমি মরিব"—আর বাক্য ফুটিল না, চক্ষু হইতে জল ধারাবাহী হইয়া পড়িতে লাগিল। মনকষ্টের সহিত আবার আহত-স্থানের বেদনা বৃদ্ধি হইল, ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

স্ত্রীলোকটী সে কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। প্রলেপ-পাত্র

হইতে শীতল প্রলেপ লইয়া আস্তে আস্তে মালিস করিতে লাগিলেন; অনেকক্ষণ পরে বেদনা আবার একটু থামিয়া আসিল, শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেলা কতক্ষণ হইয়াছে।"

যুবতী। 'আপনার ভ্রম হয়েছে, এইক্ষণ রাত্রি প্রায় ১॥৵প্রহর হইয়াছে, আপনি একটু নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করুন।'

শরৎচন্দ্র অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পর আবার চক্ষু নিমীলিত হইল, দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার সংজ্ঞা চলিয়া গেল, স্ত্রীলোকটী বলিলেন, 'আপনার কেমন বোধ হইতেছে?

শরৎচন্দ্র উত্তর করিলেন না। স্ত্রীলোকটী বসিয়া কতই কি ভাবিতে লাগিলেন; ভাবিতে লাগিলেন,—'যুবকের হাত, মুখ, নাসিকা, ওষ্ঠাধর, ঈষৎ স্ফীত ললাট, সেই ললাটে ঘর্ম্ম—প্রশস্ত বক্ষস্থল; পূর্ব্ব স্মৃতির সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন; দেখিয়া একবার আশা হইল, আবার ক্ষণকাল মধ্যেই সে আশা চলিয়া গেল—'এ দূর দেশ, এখানে পূর্ব্বস্মৃতির সাদৃশ্য অসম্ভব।' আবার ভাবিতে লাগিলেন, যুবককে এত করিয়াও বাঁচাইতে পারিলাম না, মনে এই খেদ রহিল, একবার পরিচয় পাইয়াও যদি মৃত্যু হইত, তাহা হইলে না হয় আজই এ জন্মের সুখের আশা বিসর্জ্জন দিতাম। স্ত্রীলোকটী কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিলেন; 'আমার পরিচয় দিলাম না কেন?' এই কথাটী মনে পড়িয়া তাহার আরো কষ্ট হইতে লাগিল। 'আর দেখিব না? এইবারই সৈনিকের প্রাণ বাহির হইয়াছে, যুবতী এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত হইল, কয়েকটা পাখী কর্কশস্বরে কুডাক ডাকিয়া নীরব হইল, স্ত্রীলোকটী মৃতদেহ কল্পনায় শরৎচন্দ্রের নিকটে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে রজনী তিল তিল করিয়া অবসান হইয়া আসিল; শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, শরৎচন্দ্রের আবার চেতনা হইল; রাত্রি পোহাইল, পরিষ্কার আকাশে ক্রমে ক্রমে নক্ষত্রমণ্ডলী অদৃশ্য হইতে লাগিল, স্ত্রীলোকটীর হৃদয়ে আবার আশার সঞ্চার হইল; মরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকা সঞ্চারিত হইল, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন বোধ হতেছে?" শরৎচন্দ্র এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, উত্তর করিলেন না। মনের মধ্যে কতকগুলি চিন্তা আন্দোলিত হইতেছিল, একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে?'

স্ত্রীলোকটী নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশার ছলনা।

বালুকাময় প্রান্তর, এক সীমা হইতে সীমান্তর দৃষ্টির অতীত; আকাশে মেঘ নাই, জলের আশা নাই; সূর্য্যের প্রখর তাপে বালুকণা অগ্নি সদৃশ, বৃক্ষাদি দৃষ্টিগোচর হয় না, জলাশয় শূন্য, পশু চরে না, পক্ষী উড়ে না, পবন ভীষণ বেগে উত্তপ্ত বালুকণা বক্ষে করিয়া সোঁ সোঁ রবে বহিতেছে। দিক্-শূন্য পথহারা পথিক! তোমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে? মৃত্যুকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া ভয় পাইতেছ? নীরবে মনে প্রবেশ কর, দেখিবে কে যেন মৃদু মধুর স্বরে বলিয়া দিতেছে—ঐ জলাশয়—ঐ—জলাশয়। যাও দৌড়িয়া,—উত্তাপের ভয় করিও না, পা পুড়িয়া অঙ্গার হইতেছে, তাহা চাহিয়া দেখিও না, যাও দৌড়িয়া। কি আশ্চর্য্য! কোথায় জলাশয়? যাহা দেখা গিয়াছিল, তাহা ভ্রম, ঐ জলাশয়। আবার যাও; ভুলিও না, যাও দ্রুত। এবারেও প্রতারণা। আশা পরাস্ত হইল, মৃগ-তৃষ্ণিকায় লোকের মন তৃতীয় বারে আর ভুলিল না, জলাভাবে সেই পথিকের ক্ষুদ্র শরীর অনন্ত বালুকণার পরমাণুতে মিশাইয়া গেল। ভীষণ মরুভূমে শুষ্ক-কণ্ঠ পথিকের মনে যে আশা, মৃগতৃষ্ণিকার স্বপ্ন দেখাইয়া, দূরবর্ত্তী মৃত্যুকে নিকটে আনয়ন করিত, অসময়ে তাহার জীবন নাশের কারণ হইল, সেই আশার ছলনা। যে আশার হাত এড়াইয়া মানব এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না, সময়ে সেই আশাই জীবন-নাশের অবশ্যম্ভাবী কারণ হইয়া পড়ে; এই আশাকে আমরা আশার-ছলনা বলি।

আশা সৃষ্টির গোপন মন্ত্র, ইহা আপনা আপনিই আসিয়া মানব-মনে আধিপত্য স্থাপন করে। এই আশাকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টি আজও আমোদ প্রমোদ, ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত হইয়া সময়ের আবর্ত্তনে আবর্ত্তনে মাস, বৎসর, শতাব্দী অতিবাহিত করিতেছে। সংসার দুঃখময়,—এই দুঃখ-ময় সংসার সাগরের আশাই একমাত্র কাণ্ডারী। ইহার আধিপত্যে বিষাদিত মনেও হর্ষপবন বয়, আনন্দ লহরী নৃত্য করে, দুঃখ তরঙ্গ ক্ষণস্থায়ী সুখ

তরঙ্গের দ্বারা পরাজিত হইয়া সংসারকে আনন্দের বলিয়া পরিচয় দেয়। এই আশা না থাকিলে, নৈরাশ-সাগরে সকলের প্রাণ ডুবিত, চিরকালের জন্য আনন্দ-প্রবাহ পৃথিবী হইতে অবসর লইত।

যে বস্তুর বৈপরীত্য আমাদিগের জ্ঞান চক্ষুর অতীত, তাহার আদর জন-সমাজে অপেক্ষাকৃত অল্প। ধনী অর্থ রাশির মধ্যে বসিয়াও, নির্ধন সহসা ধন পাইলে যে আনন্দ উপভোগ করে, সে আনন্দ প্রাপ্ত হন না, কারণ তাহার বৈপরীত্য তাঁহার শিক্ষা হয় নাই। দুঃখীই জানে, দুঃখের পর সুখ কত সুখদায়ক, চিরসুখী জন কখনও সে সুখ পায় না। নৈরাশ্যের পর যখন আশা, অলক্ষিত ভাবে, মৃদু মৃদু-করিয়া হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে থাকে, তখন সে আশার ঝঙ্কার কত প্রীতিকর! আশার স্থানে আশা তত সুখপ্রদ নহে, নৈরাশ্যের পর আশা যত সুখের; নৈরাশ্যের পর আশা যেমন বিমল আনন্দদায়িনী, আশার পর নৈরাশ্য তেমনি দুঃখদায়ক, জীবন-সংহারক। আশার পর নৈরাশ্য আসিলেই মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, মরুভূমে নিপতিত শুষ্ককণ্ঠ পথিকের ন্যায় মনের সহিত অঙ্গের বাঁধনি ছিঁড়িয়া পড়ে, জীবন-ভার কষ্টদায়ক বোধ হয়। আমরা সৃষ্টির এই মন্ত্রকে আশার ছলনা বলি। আশার ছলনা বড় বিপদজনক ও অহিতকর, যাহার জীবন ইহার আধিপত্যে মস্তক নত করিয়াছে, তাহার মত নিস্তেজ, উৎসাহশূন্য জীবন সংসারে দৃষ্ট হয় না।

এ সকল কথার কেন সূত্রপাত হইতেছে? বাগানে ফুল ফুটে, তোমরা তুলিয়া লইয়া আনন্দে হউক, নিরানন্দে হউক, একবার তাহার গন্ধ লইয়া থাক, কিন্তু কোন্ ফুলে কীট বাস করে, কোন্ ফুলে বিষাক্ত দ্রব্য আছে, তাহা না জানিয়া, আশার ছলনায় জড়িত হইয়া, সকল সুন্দর পুষ্পকে তুলিয়া একেবারে নাসিকার নিকটে ধরিতেছ? ঐ দেখ নাসারন্ধ্র দিয়া কি যেন সম্মুখবর্ত্তী গর্ত্তে চলিয়া গেল। কষ্ট পাইল কে, বল দেখি? কষ্ট কে পাইতেছে, বল দেখি? গোলাপ, মল্লিকা, যুতি, জাতি, চাঁপা, সেফালিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; তোল, নিঃসন্দেহচিত্তে ইহাদিগকে নাসিকায় ধর, নিঃসন্দেহ, ঘ্রাণে বিমল আনন্দ পাইবে। আর এই যে অপরিচিত একটী ফুল মলিন ভাবে মৃদু মৃদু ফুটিতেছে, সাবধান অগ্রে ইহার গুণ জান, তার পর তুলিও; সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পথিকের ন্যায় বাসনা পূর্ণ করিতে যাইও না; কে জানে, ইহার ঘ্রাণেও তোমরা সুখী হইবে? হইতে পারে, এক জন ভাল গন্ধ পাইয়াছে, বিশ্বাস করিও না; এক জনের-

কথার উপর নির্ভর করিয়া আত্মসমর্পণ করিও না। নিজ জীবনে প্রত্যক্ষীভূত না হইলে কিছুই বিশ্বাসযোগ্য নহে; বিশ্বাস কর, নিশ্চয় আশার ছলনে জড়িত হইবে। এই দেখ, একটী নূতন ফুল ফুটিল,—আমরা, আশার ছলনায় জড়িত হইয়া ইহার সুঘ্রাণ পাইতেছি, আর অগ্রসর হইতেছি, আবার ফুল তুলিতেছি, তোমরা ইহার গন্ধ পাওনা, আসিওনা; যতক্ষণ নিঃসন্দেহ রূপে ইহার সুঘ্রাণ নিশ্চিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত তুলিয়া নাসিকায় ধরিওনা।

আমরা ত আশার ছলনে জড়িত হইয়া ফুল তুলিয়া মালা সাজাইতেছি, কিন্তু যাহারা ইহাকে গলায় পরিবেন, তাঁহাদিগের সাবধান হওয়া উচিত। সংসার প্রলোভন-পূর্ণ, প্রলোভন সকল প্রফুল্ল অন্তরে সংসার পথিকের নয়ন সন্নিধানে যাইয়া, তাঁহাদিগের চাক্ষুষ-ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানের বহির্ভূত করিতেছে, সামান্য কীটাণুকীটগণ তাহাকে ভুলিয়া, জীবনকে নিঃসন্দেহ-চিত্তে, অপরের করে অর্পণ করিতেছে। যখন প্রলোভন আসিয়া মনকে প্রবঞ্চনা করে, তখনই অন্তরে অন্তরে, তিল তিল করিয়া, আশা সঞ্চারিত হইতে থাকে। মানবের শক্তি সীমাবিশিষ্ট, মন একবার ভুলিলে, তাহাকে আবার জ্ঞানের অধীনে আনা, সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে! প্রলোভনে মন ভুলিল, আর অপরিমেয় আশা আসিয়া হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল; পথিক অন্ধ হইয়া বাসনা চরিতার্থ করিবার মানসে ধাবিত হইল, কিন্তু হায়! সময়ে সকলই স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইল।

প্রকৃতিগত নিয়মানুসারে জগৎ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পরমাণু সকল সময় ও কালভেদে নূতন নূতন পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া, আশ্চর্য্য-রূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে। আবার অন্যদিকে ঘাত প্রতিঘাত না হইলেও সকল সময়ে সংসার চলে না। কণ্টকবিহীন সংসার বিনাশের মূল। সমস্ত দিবস প্রখর খরতর কিরণ জগৎকে উত্তপ্ত করিয়া, যদি রজনী কণ্টকে আঘাত না পাইত, তবে কে না স্বীকার করিবে, এ জগৎ পুড়িয়া ছারখার হইত? পক্ষান্তরে দুঃখ কণ্টক সুখ কণ্টকে আঘাত না পাইলে, চিরদুঃখ হৃদয়কে মলিন করিয়া রাখিত; এই জন্যই আমরা কণ্টকের আবশ্যকতা স্বীকার করি। দিনের কণ্টক রাত্রি, জোয়ারের কণ্টক ভাঁটা; বৎসরের কণ্টক বৎসর; এই প্রকারে ভৌতিক জগৎ আশ্চর্য্য রূপে পরমাণু সংঘটনে গঠিত না হইয়াও,

পৃথিবীকে সুখের আবাসস্থান করিয়া রাখিয়াছে। ভৌতিক-জগৎ ছাড়িয়া যখন মানব-প্রকৃতির গূঢ় রহস্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখনও এই নিয়মের অন্যথা দেখিতে পাই না। মানবের আত্মা, ঘাত, প্রতিঘাতে, অনবরতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। উন্নতিই মানব আত্মার একমাত্র লক্ষ্য। সুখের অভ্যুদয়ে দুঃখ চলিয়া গেল, পূর্ণস্বাস্থ্যের সময় রোগ অবসর লইল, ধর্ম্মবীজ রোপিত হইলে, পাপতাপ জঞ্জাল হৃদয় হইতে অবসর লইল, শোকী-তাপী আত্মার মন হইতে স্মৃতির শেষ চিহ্নও তিরোহিত করিয়া, আবার সুস্থভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, এ সকল উন্নতির লক্ষণ। কারণ কে না স্বীকার করিবে, শোক-জর্জ্জরিত মন হইতে যদি স্মৃতি অবসর না লইত, তাহা হইলে তাহার পরিণাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। কিন্তু কখন কখন এই উন্নতির পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইতে, আত্মা গম্যপথের পরিবর্ত্তে, প্রলোভনে ভুলিয়া, অগম্যপথে যাইয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং উন্নতির স্থানে অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তিল তিল করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া মানব আত্মার স্বাভাবিক গতি, সময়ে সময়ে প্রলোভনে মন ভুলিয়া অপর্য্যাপ্ত ভ্রম-আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে, আশার মত্ততায় অন্ধবিশ্বাস আসিয়া মনকে আক্রমণ করে; চক্ষু নিমেষ শূন্য হইয়া যাহা দেখে, সকলই উন্নত বলিয়া বোধ হয়। মন, ভুলিয়া এত সুখ অনুভব করিতে থাকে যে, সংসারে যাহা কিছু আছে, সকলই যেন তাহার আয়ত্ত বলিয়া বোধ হয়। এ সকল ক্ষণস্থায়ী সংসারের কণ্টক বিশেষ, উন্নতির পথের বাধা মাত্র। ধৈর্য্যকে সহায় করিয়া মৃদু মৃদু অগ্রসর হও, কোন দিনও কণ্টকের আঘাত পাইবে না। আর অস্থির হও, অস্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর, ঐ কণ্টকের আঘাতে তোমাকে অতল জলধির নিম্নে লইয়া ডুবাইবে। যাহা অস্বাভাবিক তাহা কতক্ষণ থাকে? পৌষ মাসের দেবগর্জ্জন কতক্ষণ গর্জ্জন করে? নিদাঘ কালে আর্দ্রভূমি কতক্ষণ শীতল থাকে? দেখিতে দেখিতেই শুষ্ক হইয়া যায়। বৃষ্টিধারা বসন্ত কালে উত্তপ্ত প্রস্তরে পড়িতে পড়িতেই শুষ্ক হইয়া যায়; দেবগর্জ্জন গর্জ্জিতেই পলক মধ্যে তিরোহিত হয়। মানব আত্মার অন্ধতাই বা কতক্ষণ থাকে? অসাময়িক আশার কুহকজাল কতক্ষণ মনুষ্যের মনে সুখ বিতরণ করিতে পারে? এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা দশদিন, দশমাস, দশবৎসর। তারপর? আবার মনে কাঁটা লাগে, আবার নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। সুখের পরিবর্ত্তে অসহ্য-কষ্ট

উপস্থিত হইয়া মনকে সংসার অস্থৈর্য্যের পরিচয় দিতে থাকে। মন, অপূর্ণ থাকিতে পারে না, কেননা প্রকৃতির নিয়ম তাহা নহে; আশার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়া ভ্রুকুটী দেখাইয়া মৃত্যুর অনুবর্ত্তী অস্তিত্বের পরিচয় দিতে লাগিল; ইহাকে আশার ছলনা বলিব না ত কি বলিব?

আশার ছলনা উন্নতির পথের কণ্টক, ক্ষণকালের জন্য উন্নতির বাধা জন্মাইবার অবলম্বন; আমরা আশার ছলনারূপ কণ্টকের উপকারিতা স্বীকার করি। যাহাদিগের মন সবল, অন্ধকূপে পড়িলে উঠিবার ক্ষমতা আছে, তাহাদের পক্ষে আশার ছলনা প্রশস্ত জীবন-ক্ষেত্রের শিক্ষা। শরৎচন্দ্র কত-বার আশার ছলনায় জড়িত হইয়াও আবার মুক্ত হইয়াছেন! কিন্তু তাঁহার জীবনের ভাবী অঙ্কে কি আছে, কে জানে?

আশার ছলনা আসিয়া কখন যে মনকে ভুলাইতে থাকে, তাহা পূর্ব্বে কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না, কারণ জ্ঞানচক্ষু তখন অন্ধ-বিশ্বাসে অন্ধকার দেখে। শরৎ-জীবন যতবার আশার ছলনায় জড়িত হইয়াছে, তাহা তাহার জীবনের প্রত্যেক অঙ্কেই পরিচয় দেয়। তিনি সর্ব্বদাই ইহার হাত হইতে বিমুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু চেষ্টা করিলে কি হইবে? কখন যে আশার ছলনা মনে উপস্থিত হইয়া প্রতারণা দ্বারা মনকে ভুলাইতে আরম্ভ করিত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না; তাই শত শত বার ভুলিয়াছেন, আমরা সে অংশ সকল দেখাইব কি? না, পাঠকের ইচ্ছা হয়, পড়িয়া দেখিবেন।

আমরা শরৎচন্দ্রের জীবনের যে পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছি, তাহার শেষ অধ্যায় মনে করিলে—শরীর সিহরিয়া উঠে। কানপুরের সেই প্রকাণ্ড পুরীর মধ্যে শরৎচন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শয়ান, পার্শ্বে একটী মাত্র স্ত্রীলোক; সংসারের আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলের সুখ হইতে চিরবঞ্চিত, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী, শরৎচন্দ্র আশার জাল ছিঁড়িয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন; দিন যাইতে লাগিল। দিনে দিনে দিনের তরঙ্গ বিলীন হইয়া আবার নূতন তরঙ্গের দ্বারা সেই স্থান পূর্ণ করিল, ক্ষতস্থান আবার পুরিয়া উঠিল; আশা-প্রদীপে আবার তৈলের ছিটা পড়িল; সেই যুবতী শরৎচন্দ্রের নির্ব্বাণোন্মুখ আশা প্রদীপ আবার উস্কাইয়া দিলেন।

শরৎচন্দ্রের জীবনের এই পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়াছি। আশার শীর্ণ উজ্

রাশ্য এবং নৈরাশ্যের পর আশা, এই দুই ভাবই আমরা অসম্পূর্ণ অবস্থায় তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি, সম্পূর্ণরূপে আজও দেখি নাই। আশার সুখ ও নৈরাশ্যের কষ্ট সম্যকরূপে শরৎচন্দ্রের জীবনে উপলব্ধ হয় নাই; তাই আমরাও এ পর্য্যন্ত প্রতারিত হই নাই। কিন্তু এবার? অন্ধ-বিশ্বাস-জনিত সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের পরও আবার যখন আশা সঞ্চারিত হইল, তখন আবার যে নৈরাশ্যের উদয় হইবে না তাহা কে জানে? ভাবিলে, আমাদের শরীর কম্পিত হয়। যে জীবন মুহুর্মুহু মৃত্যুশয্যায় শুইয়া আবার দিন দিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দ্বারা মনকে সতেজ করিতেছে, এ মনের ভাব, অবস্থা কি প্রকার, ভাবিলে শরীর কম্পিত হয়। এই স্থির-প্রতিজ্ঞ জীবনে আবার নৈরাশ্যের উদয় হইলে, আর রক্ষা নাই; পথিক সাবধান হও। যে পর্য্যন্ত আসিয়াছ, ইহাতেই সন্তুষ্ট হও। শরৎচন্দ্র নৈরাশ্য-জীবনের আদর্শ নৌকা, আমরা নিঃস্বার্থ দাড়ী; তোমরা স্বার্থ সাধনের জন্য সেই নৌকায় উঠিয়াছ; সাবধান! শরৎ-নৌকা ভীষণ তরঙ্গকে ভয় করেনা, মনে বিশ্বাস আছে, ডুবিলে আবার উঠিতে পারিবে; তরঙ্গ ভেদ করিবার ক্ষমতা এ নৌকার বিলক্ষণ আছে। আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে ইহার দাঁড় টানিতেছি, হয় পথিক-দিগকে অপর পারে লইয়া যাইব, না হয় ভীষণ তরঙ্গে ডুবাইব, জলমগ্নের দোষের ভাগী আমরা হইব না। আমাদিগের সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও যদি পথিকদিগকে পারে লইয়া যাইতে না পারি, সে জন্য মনে কষ্ট পাইলেও আমরা দায়ী নহি। বিধিলিপি, আমরা কি করিব? ঈশ্বরের কার্য্য কুশল-ময়, আমরা সন্তুষ্ট থাকিব, আমাদের ভয় কি?

তবে তোমরা পথিক! তোমাদেরই ভয়। তোমরা পয়সা দিয়া এই নৌ-কায় চড়িয়াছ, তোমাদের জীবন আশা-ছলনা সমুদ্রে ডুবিলে, তোমাদেরই কষ্ট; কে ইচ্ছা করিয়া জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? ভীষণ তরঙ্গ উঠিয়াছে, নিঃস্বার্থ-তরঙ্গের ঢেউ গর্জ্জন করিতেছে শরৎ-নৌকা চঞ্চল হইয়া আন্দোলিত হইতেছে, আমরা সঙ্কুচিত মনে সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া অল্পে অল্পে দাড় টানিতেছি; তোমরা ভয় পাইয়া থাক, নৌকা ছাড়িয়া পলায়ন কর। নচেৎ নিঃস্বার্থের ভীষণ তরঙ্গে তোমাদের জীবন প্রতিমা বিসর্জিত হইলে, আমরা দায়ী হইব না; আমাদের নৌকা লইয়া বসিয়া থাকিব, সময় হয়, তখন পার করিব; না হয় অতল বিস্মৃতি-সাগরে এ নৌকাকে ডুবাইয়া, অন্য নৌকা বহিতে চলিয়া যাইব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্মৃতিকল্পনায়।

স্মৃতি আলোচনা, মানব জীবনের ভাবী উন্নতি এবং অবনতির মুল সো-পান। আজ উৎসাহ মনে যে তুমুল আন্দোলন তুলিয়া মানবকে আশার চক্ষে স্বর্গপুরী দেখাইতেছে, যখন উৎসাহ থামিয়া আসিবে, আশা থাকিতেও ভয়ে ও বিষাদে মানব নৈরাশ হইয়া যখন মৃত্যুকে সুখ এবং শান্তি বোধে, তাহার ক্রোড়ে শয়িত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিবে, তখন দণ্ডে দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, যে সুখ স্বপ্ন নয়ন সমীপে নৃত্য করে, সে কি, জান? সে জীবনের পুর্ব্ব-স্মৃতি। স্মৃতির ন্যায় সুখ দুঃখ উদ্দীপক আর কিছুই নাই। পুত্রশোক-কাতরা জননী অহোরাত্র অশ্রুজলে সিক্ত হইতেছেন, মৃত সন্তানের জন্য বিলাপ করিয়া স্বীয় মনকে স্বর্গের উপযোগী করিতেছেন, উঁহার এত দুঃখ কেন? ঐ একমাত্র স্মৃতি। আর ঐ যে ফরাশি-জননী দিন রাত্রি ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতেছেন, আর মনস্তাপে দগ্ধীভূত হইতেছেন, স্মৃতি না থাকিলে উঁহার আবার দুঃখ কি? উঁহার দুঃখের কারণ স্মৃতি; আবার অন্যদিকে ভাবী আশাও স্মৃতি হইতে দিন দিন সঞ্চারিত হইতেছে। স্মৃতিই উদ্দীপন স্মৃতিই বিড়ম্বনা। স্মৃতিই অনন্ত দুঃখ, স্মৃতিই অনন্ত সুখ। স্মৃতি না থাকিলে বিন্ধ্যবাসিনী প্রেমেব দায়ে জীবনকে স্রোতে ভাসাইতেন না; স্মৃতি না থাকিলে, শরৎচন্দ্র মৃত্যু শয্যায় বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য অস্থির হইয়া অসারত্ব প্রকাশ করিতেন না। সেই গৃহে শরৎচন্দ্রের পার্শ্বে মলিন যুবতী, স্মৃতির স্বপ্ন দেখিয়া মোহিত হইতেছেন, 'সেই মুখ সেই হাত, সেই নয়ন, সেই বিশাল বক্ষস্থল, সেই প্রসস্ত ললাট; পরিচয় না পাইয়াও স্ত্রী-লোকটীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে কেন? ঐ একমাত্র স্মৃতি। আর শরৎ-চন্দ্র? তিনি কি করিতেছেন, অমরা এক্ষণে দেখিব।

শরৎচন্দ্রের ক্ষতস্থান পুনরায় শরীরে বিলীন হইয়া গেল। মনে আবার একটু২ আশাপবন বহিতে লাগিল; মৃত্যুর কঠোর অবস্থা তিরোহিত হইল; আবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। শরীর যতই সুস্থ হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; অতীত ঘটনা সকল

একে একে মনে পড়িতে লাগিল। এক দিন স্বপ্নে তিনি এক খানি পত্র দেখিয়াছিলেন, সেই পত্রের কাহিনী হৃদয়ে চিত্রিত হইতে লাগিল, সেরি চিন্তা হৃদয়কে আক্রমণ করিল। সেই যুবতী অধোবদনে তাঁহার নিকটে বসিয়া রহিলেন।

শরৎচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন—"আমার মন বড়ই অস্থির হইতেছে, কি যেন মনে পড়ে, আবার ভুলে যাই, ইহার কারণ কি, কিছুই বুঝিনা। এই স্ত্রীলোকটীর দ্বারা আমি অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি, ইহার ঋণ আর এ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে যেন, বোধ হয় ভদ্র-বংশে জন্ম হইবে। ইহার যবনীর ন্যায় পরিধেয়, কিন্তু বোধহয়, যবনী নহে। মন কি বলে? মনের ভাব তত ভাল নহে। সৌসাদৃশ্যের মায়া ছাড়িতে চাহে না। কি করিব? পরিচয় পাইলে একটু ভাল হইত।"

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি আজ আমাকে কেমন দেখিতে-ছেন?

স্ত্রীলোক।—আর ভয় নাই; আপনার শরীর সুস্থ বোধ হইতেছে।

শরৎচন্দ্র। আপনার বাড়ী কোথায়? আপনি এখানে কেমন করে আসিলেন?

স্ত্রীলোক। 'আমি স্ত্রীলোক' আপনার পরিচয় না পাইলে, আমার পরিচয় কি প্রকারে দিব? যদি বাধা না থাকে, তবে আপনার পরিচয় দিন।

শরৎ! আপনি আমার পরিচয় লইয়া কি করিবেন?

'আপনি আমার পরিচয় লইয়া কি করিবেন, একথা রমণীর হৃদয়ে বাঁধিল। তদ্দণ্ডে সেইখানে বজ্রপাত হইলেও তত আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না, স্ত্রীলোকটী বিস্মৃত হইয়া বলিলেন,—

'আপনার পরিচয় লইয়া কি করিব? হৃদয় থাকে, যেমন দুঃখের ভাগী হইয়াছি, সেই প্রকার আবার আপনার সুখের ভাগী হইব।' আমি অহোরাত্র যত্ন-সহকারে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, আপনার শুশ্রূষা করিয়াছি, আপনি এখন বাঁচিয়াছেন; আপনার জীবনের পরিচয়ে আমার স্বার্থ না থাকিলেও, তাহা জানিতে আমার ইচ্ছা হইতে পারে। আমি আর কিছুই চাই না, কেবল পরিচয়, এই পরিচয়ের আশায়ই আপনাকে বাঁচাইয়া-ছি। আপনি কি প্রকারে ওরূপ কথা মুখে আনিলেন?

শরৎচন্দ্র।—আপনি আমার জীবন দান করিলে আমি বাঁচিতাম না; কে ইচ্ছা করিয়া এই কষ্টের জীবনের জন্য অন্যের দাসত্ব করিতে চায়? মনুষ্যের কি ক্ষমতা যে, এক জনকে বাঁচাইতে পারে? সময় হইলে মরিব, যখন সময় আসিবে, তখন কেহ এ জীবনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। সময় হয় নাই, তাই বাঁচিলাম। তবে আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন, সেজন্য যদি আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করি, তবে আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারেন। পরিচয়ের কথা বলিলেন? আপনি স্ত্রীলোক, পুরুষের পরিচয়ে আপনার অধিকার নাই। আপনি পরিচয় পাইবেন না।

যুবতী অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি স্ত্রীলোক, আমার অন্যের পরিচয়ে কাজ কি? কিন্তু স্মরণে পড়ে কেন, সেই মুখ, সেই হাত? ভাবিতে ভাবিতে শরীর একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে; মন সকল সময়েই চিন্তায় অভিভূত; যাহা দেখি, তাহা যেন দেখিয়াও দেখি না। যাহা শুনি, তাহা যেন শুনেও শুনি না। স্মরণে কেন সেই হাত, সেই মুখ জাগিতেছে? পরিচয় না পাইলে তাহা কি প্রকারে জানিব? হঠাৎ কোন কথা বলিলে, যদি যুবকের অপমান হয়? সেই হাত, সেই মুখ, আর কি কাহারও নাই!" বলিলেন—আমার যদি অপরাধ হইয়া থাকে, তবে ক্ষমা করুন। আপনাকে দেখিয়া মনের কেমন এক প্রকার ভাব হয়েছে! কি যেন স্মরণ পড়ে, পড়ে, পড়ে না; আবার ভয়ে সে কথা বলিতেও সাহস হয় না; আমাকে ক্ষমা করুন।

শরৎ। যতদূর জানি, আপনার কোন অপরাধ হয় নাই, আপনাকে সাবধান করিবার জন্যই ঐপ্রকার বলিয়াছিলাম। আপনার নিকটে আমি চিরঋণে আবদ্ধ আছি, সাধ্যমত প্রত্যুপকার করা আমার উচিত। যাহা হউক, আমার সময় হইয়াছে, আর বিলম্ব করিবার সময় নাই, আমি এখানে আর এপ্রকার অবস্থায় থাকিতে পারি না। আমার জীবনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হইলে আর স্ত্রীলোকের নিকট পরিচয় দিব না; দায়ে পড়িয়া আপনার সাহায্য সাদরে গ্রহণ করিয়াছি; এইক্ষণ আমার আর বিলম্ব করিবার সময় নাই; আপনি কোথায় যাইবেন? বলুন, আপনাকে সেইখানে রাখিয়া আসি।

যুবতী দুঃখের স্বরে বলিলেন—'আমাকে আর আপনি কোথায়

রাখিয়া আসিবেন? আমি এইখানেই থাকিব; জীবনের অবশিষ্ট দিন, এইখানেই অতিবাহিত করিব।'

অতীত জীবন-কাহিনী মনে জাগিয়া উঠিল, জীবন ভার-স্বরূপ বোধ হইল; শরৎচন্দ্র দেখিলেন, যুবতীর দুই চক্ষু হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতেছে; তাঁহার মনে একটু দুঃখের উদ্রেক হইল, বলিলেন—আমি এখনে থাকিলে কি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন?

যুবতী একটু পরে ভাবিয়া একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'না, আপনি এখানে থাকিলে সন্তুষ্ট হই না;—আপনার ক্ষতি করিয়া আমার উপকারের প্রত্যাশা করি না,—তবে একটা কথা—

শরৎ।—বলুন কি কথা। প্রাণপণে পালন করিতে চেষ্টা করিব।

স্ত্রীলোক।—কথা এই,—এতদিন আপনার মলিন মুখ দেখিয়া গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি, আজ আপনাকে একবার সাজাইয়া দেখিতে বড়ই বাসনা হইতেছে।

শরৎ।—আপনার যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহাই করুন।

যুবতীর মনে একটু আহ্লাদ হইল, একখানি পরিষ্কার ধূতি আনিয়া বলিলেন, 'এইখানি পরুন।'

যুবতীর শয়ন-গৃহে পরিষ্কার ধূতি ছিল।

শরৎচন্দ্র তাহাই করিলেন, অনেক দিন পরে আবার রণসজ্জার পরিবর্ত্তে দেশীয় ধূতি পরিধান করিলেন, শরৎচন্দ্রের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, তিনি সহসা একটু হাসিলেন। সেই হাসি রমণীহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইল। শরৎচন্দ্র বলিলেন, তবে এখন যাইতে পারি?

যুবতীর মন, সহসা মলিন হইল। শরৎচন্দ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—'আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন।'

শরৎচন্দ্র 'তবে বিদায়' এই বলিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই নির্জ্জন পুরী পরিত্যাগ করিয়া, বাহির হইলেন।

যুবতী সেইখানে বসিয়া কতই কি ভাবিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিয়তি।

সৌরজগৎ, আবর্ত্তিত হইতে হইতে এক বৎসরে কতদূর যাইবে, জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া তাহা ঠিক বলিতে পারেন। মানব-জগৎ সম্বন্ধেও, যদি কোন মানবতত্ত্ববিদ পণ্ডিত থাকেন, তবে এই প্রকার গণনা অসম্ভব নহে। কালচক্রে পড়িয়া কোন্ মানব কতদিনে কোন্ পথ অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইয়া উপস্থিত হইবে, এ প্রশ্নের উত্তর তাঁহারাই করিতে পারেন, যাঁহারা পরমাণু-সমষ্টির বর্ত্তমান গুণ দেখিয়া ভাবী গুণাগুণ জানিতে পারেন, বর্ত্তমান স্বভাব দেখিয়া ভাবী স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। নতুনা হাত গণিয়া মানবের ভাবী সম্পদের কথা যাঁহারা বলিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চক বলিতে কুণ্ঠিত নই। অদৃষ্ট লইয়া মহা গোলযোগ, সকল সময়েই সর্ব্বদেশে প্রচলিত ছিল। মনের এতটুক বেগ থাকিলে, এতদিনে এই বেগে এতদূর চলিবে; এই দুর্ব্বল মনের এই বেগে এইপ্রকার বিপদ উপস্থিত হইবে; সবল মন এইপ্রকার বিপদ কাটিয়া যাইতে পারিবে; যাঁহারা মানব-চরিত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এ সকল কথার প্রকৃত উত্তর দিতে পারেন। কালচক্রে পড়িয়া মানব ভবিষ্যতে যে সকল পথে আসিয়া উপস্থিত হয়, আমরা সে সমুদয়কে ঘটনাপরম্পরা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি, কিন্তু অদৃষ্টে এই লেখা ছিল বলিয়া ইহা ঘটিল, এ কথা কখনও বিশ্বাস করি নাই, কখনও করিব না। যদি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির লিখিত অদৃষ্টের হাত এড়াইয়া কেহই স্বীয় ক্ষমতায় উন্নতি-সোপানে অধিরোহণ করিতে না পারেন; তবে আর চেষ্টা কি? তবে আর পরিশ্রম করিয়া উন্নতি উন্নতি বলিয়া চিৎকার কেন? অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা ঘটিবেই; চুপ করিয়া বসিয়া থাক, লিখিত সৌভাগ্য, কিম্বা বিপদ আসিবেই আসিবে। ইহা আলস্য-বৃত্তির কথা। তোমরা এই অদৃষ্টের সেবা করিয়া দীর্ঘকাল শুইয়া থাকিতে ভালবাস, তাহাই কর, কিন্তু আর চেষ্টা করিও না, বিপদে পড়িলে তাহা হইতে আর উঠিবার জন্য যত্ন করিও না। যদি কর,—তবে বুঝিব, তোমরা অদৃষ্টের সেবক হইতে

অদ্যাবধিও শিক্ষা কর নাই, অথবা মুখে এক কথা, মনে আর এক কথা রাখিতে ভালবাস। যদি অদৃষ্টের ন্যায় কোন পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে সচেষ্ট মানবকে, চিরকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হইত; আর সেই সর্ব্ব-দর্শী, সর্ব্বমঙ্গলময়, অহিংসাপরায়ণ, অপক্ষপাতী ঈশ্বরকে ঘোরতর অত্যাচারী, ঘোরতর পক্ষপাতী জানিয়া মানব-সন্তান এ সংসার হইতে ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত করিয়া দিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা হয় নাই। নিয়তি বলিলে আমরা বুঝি—কালক্রমে এপথে আসিতেই হইবে; চেষ্টা করিলেও, ঘটনায় যে প্রকার দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে এপথ অপরিহার্য্য হইয়াছে; অদৃষ্ট বলিতে বুঝি—আলস্য-পরায়ণ ব্যক্তির স্বীয় কল্পনার বিড়ম্বনা—অধার্ম্মিকের অসার কথা। এই নিয়তি সম্বন্ধে মানব মনে বিপদের সময় কি প্রকার ভাব উপস্থিত হয়, আমরা বিন্ধ্যবাসিনীর চরিত্রে তাহা দেখাইব।

শরৎচন্দ্র চলিয়া গেলে পর, বিন্ধ্যবাসিনী একাকিনী সেই বাড়ীর মধ্যে বসিয়া জীবনের কণ্টকিত পথের কথা ভাবিতে লাগিলেন। জীবনের চিত্রিত যবনিকা তাঁহার স্মরণ পথ অবরুদ্ধ করিল, তিনি একাগ্রমনে সমস্ত জীবনের দুঃখ গণনা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক ঘটনা, বিন্দুর মনে জাগিল, দেখিলেন, জীবনের প্রত্যেক ঘটনায়ই দুঃখ-কালিমায় চিত্রিত।—তিনি ভাবিতে লাগিলেন;—'আমি সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গ গণিতেছি। ভীষণ তরঙ্গ সমূহ দেখিলে, শরীর কাঁপিয়া উঠে। একদিনও একটী তরঙ্গ দেখিয়া মন শীতল হয় নাই;—কেবলই দুঃখ তরঙ্গ—কেবলই যন্ত্রণার তরঙ্গ। সুখতরঙ্গ তবে বুঝি এ সমুদ্রে খেলা করে না? কতদিন তরঙ্গ গণিতেছি, কৈ, এক দিনও একটী সুখতরঙ্গ গণি নাই। 'এইত আর একটী দিন চলিয়া যাইতেছে,—আজ কি গণিলাম? ঐ একটী—ঐ একটী—ঐ একটী;—হায়, ও সকলই দুঃখের তরঙ্গ! আমি দুঃখিনী, তাই দুঃখের তরঙ্গই গণিতে শিখিয়াছি,—সুখ-তরঙ্গ গণিতে শিখি নাই। শিখি নাই, কেন বলিব? কৈ সুখতরঙ্গ ত একদিনও এ সমুদ্রে নৃত্য করে না; করিলে কি গণিতে পারিতাম না? দেখিনা, তাই পারি না। কিন্তু আমি দেখিই বা না কেন? কতদিন আমার জীবন-পাখীকে দেহ-পিঞ্জরায় আবদ্ধ করিয়া এই সংসার-সমুদ্রের তীরে বসে রয়েছি, কৈ একদিন, একদিন কেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও একটী সুখতরঙ্গ দেখিলাম না। তবে কি আমি সুখতরঙ্গ চিনি না? তাই বা বলি কেন? যদি না চিনিতাম, তবে সকলই কেন না সুখের মনে হইল?

দুঃখ মনে হয় কেন? সুখ, দুঃখের প্রভেদ না জানিলে, সকলই সুখের হলো না কেন? আমি সুখতরঙ্গ দেখি নাই, তাতে কি? সুখ-তরঙ্গের মৃদু মৃদু আন্দোলিত লহরীর কথা অনেকবার শুনেছি; শুনেছি, সে তরঙ্গ দেখিলে চক্ষু পলকশূন্য হয়, সজীব হয়, মন আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে। কই তরঙ্গ ত অনেক দেখেছি, কিন্তু মন ত এক দিনও আহ্লাদে নৃত্য করে নাই?. যাহা দেখিতেছি—সকলই যেন বিষাদ-সাগরের দুঃখ তরঙ্গ উথলিয়া দিতেছে;—মনে কত কত কষ্ট পাই! কষ্ট পাই?—সেত আমার জীবনের সম্বল! আমার জীবনে সুখ নাই, তাই কষ্ট, তা জানি; কিন্তু কেন আমার জীবনে সুখ নাই? আমার ভাগ্যে নিদারুণ বিধি কেন সুখ লিখেন নাই? ষষ্ঠ রাত্রের মধ্যে আমি এমন কি অপরাধ করেছিলেম যে, সেই অপরাধেই আমার কপালে আজন্মের মতন দুঃখরাশি লিখিয়া দিলেন? আমি শৈশবে এমন কি কার্য্য করেছিলাম যে, সেই দোষে আমার ভাগ্যে এত যন্ত্রণা ঘটিল? ভাগ্য কি? অদৃষ্ট। তাই বা কি? আমার জীবনে যাহা ঘটিবে, তাহা সকলই কি লেখা রয়েছে? তবে আর বৃথা চেষ্টা করি কেন? যাহা হবে, তাত হবেই; তবে আমি আবার কষ্টকে কষ্ট বোধ করি কেন? বিধি কি এমনি নিদারুণ যে, পূর্ব্বেই তিনি সুখ, দুঃখ কপালে লিখে রেখেছেন? আর যদি তাই হয়, তবে আমার কপালে সুখ নাই কেন; আমার ভাগ্যে কেন এত দুঃখ? কে বলিবে? অবলাজাতি, কিছুই বুঝি না। বিধির দোষ কি? তাঁহার যাহা ইচ্ছা,তাহাই করেছেন; তবে মা আমাকে বলিলেন না কেন? আমার জীবনে এত দুঃখ জেনেও, কেন আমাকে রাখিলেন?" বিন্দুর চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া চলিল, আবার ভাবিতে লাগিলেন,—"আমার কপালে এই লেখা ছিল, তাত স্বপ্নেও জানিতাম না; জানিলে তখনই প্রাণত্যাগ করিতাম। তখন যদি বিধির লিখিত দুঃখ-বিষাদময় চিত্রপট আমার নয়ন সমীপে পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পাইত, তা হলে তখনই মরিতাম! তখন দেখি নাই, কিন্তু—এখন ত দেখিতেছি! যা দেখিতেছি, সকলই দুঃখের; তবে এখন মরি না কেন? কি জন্য মরিব? যা দেখিতেছি, এ সকলই অতীত ঘটনা, ভাবী জীবনের ও অংশ তুষারে আবৃত, কিছুই দেখা যায় না; উহার ভিতরে কি আছে, কেমন করিয়া জানিব? যদি সুখ থাকে? এত দুঃখের পর যদি সুখ পাই, তবে অধৈর্য্য হয়ে মরিব কেন? মানুষের মুখে শুনেছি, দুঃখের পর সুখ হয়। আমার জীবনে

কি তা হবে না? এত দুঃখ সহ্য করেও কি সুখের মুখ দেখতে পাব না? কে জানে? ভবিষ্যতের কথা কে বলিতে পারে? যদি সুখ নাই থাকে, যদি বিধি সুখ না লিখে থাকেন? তবে মরি না কেন? মন! আইস তবে মরি।” আবার ভাবিতে লাগিলেন—“এই দূরদেশে, কোথায় ছিলাম, কোথায় ভাসিয়া আসিয়াছি; কষ্ট-তরণি বহিয়া বহিয়া, অকূল-সাগরের দুঃখ তরঙ্গের লহরী গণিতে গণিতে কতদূর এসে পড়েছি? এই নির্জন বাটীর মধ্যে আমি একাকিনী দীপ জ্বলিতেছি! আমি আর জ্বলিব কেন? কার জন্য আমি এখানে আসিলাম? কার জন্য কষ্ট-তরি বহিলাম? কার জন্য দুঃখ তরঙ্গ গণিলাম?—আর কার জন্যই বা এই নির্জন বাটীর মধ্যে একাকিনী জ্বলিতেছি? আমার নিজের জন্য? আমার কি সাধ মিটে নাই? কত দেখিলাম—কত শুনিলাম, তবু আমার পোড়া সাধ মিটিল না? আমি জ্বলিতেছি,—ক্রমে ক্রমে আয়ুতৈল নিঃশেষিত হয়ে আসিতেছে, আর কত দিন বাঁচিব? তবে সাধ মিটে না কেন? পোড়া স্মৃতি আজও মনে জাগে কেন? মন হইতে সকল রূপ-চিহ্ন অন্তর্হিত হয় না কেন? স্মৃতি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আশা ত যায় না?—আশা ত ছাড়িতে পারি না? আশা ছাড়িতে পারি না, যাহা দেখিলাম, তাহা আবার না দেখিয়া মনকে ঠিক করিতে পারি না? এও কি অদৃষ্ট? এও কি আমার কপালে লেখা ছিল? আমি এপ্রদেশে কেন আসিলাম? আমার কপালে লেখা ছিল। আমার জীবনের সুখ, অসময়ে অস্তমিত হলো কেন? আমার কপালে লেখা ছিল। স্মৃতিতে সেই মুখছবি আজও জাগে কেন? আমার কপালে লেখা ছিল? যাহা দেখিলাম, তাহা পাইলাম না কেন? আমার কপালে লেখাছিল? আমি পিতৃ মাতৃ স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলাম কেন? আমার কপালে লেখা ছিল। সকলি আমার কপালে লেখা ছিল;—কেবল একটী নাই; একটী নাই—আমার জীবনে সুখ নাই। তবে মরিনা কেন? না—এ শরীর যাহার, তাহার নিকটে মরিতে হয়, মরিব। তবে যাই,—যেখানে স্মৃতি যায়, যেখানে স্মৃতিতে সাদৃশ্য আছে, সেইখানে যাই। যাইয়া যদি না পাই, তবে কি মরিব?” ‘এ বেশে যাইব না। যবনীর বেশ পরিত্যাগ করি। স্বদেশে যে বেশে থাকিতাম, সেই বেশে যাই,—হয় ত এই জন্মের মত চলিলাম; না হয় আবার ফিরিব। সত্যভামা দেখিলে কি বলিবে? যাই বলুক, আমার আর লজ্জা কি?

তবে এইকথাই থাক।" মনে মনে এই প্রকার ভাবিয়া বিন্দু কষ্টজীবন বর্ম্মিকে লইয়া চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আবার সেই ছবি!

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শরৎচন্দ্র! তুমি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়। যে অবলার একমাত্র সাহায্যে তুমি মৃত্যুর কঠোর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলে, কোন্ প্রাণে তুমি সেই স্মৃতির-বিমোহিত অবলাকে, একাকিনী, ফেলিয়া আসিলে। মানিলাম, স্ত্রীজাতি স্বার্থপর; মানিলাম, রমণীর মন চঞ্চল; মানিলাম, পুরুষের মন যুবতী-ফাঁদে ধরা পড়িয়া থাকে; মানিলাম, রমণী-কটাক্ষ পাপের প্রলোভন; কিন্তু সে কোন্ মনের কথা? যে মন, পাপের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া আত্মশুদ্ধি, আত্মপবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারে, সে মন আবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কি? তুমি কোন্ হৃদয়ে, তোমার জীবনতোষিণীকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিলে?

রমণীর বাসনা ছিল, তোমাকে দেখিয়া স্মৃতির অনন্ত জ্বালা নিবারণ করিবে; তাঁহার পরিশ্রম এবং যত্নের পুরস্কার তুলিয়া লইবে। তুমি সে পথে কণ্টক পুতিলে, তোমাকে নিষ্ঠুর বলিব না ত কি বলিব? স্ত্রীলোকের নিকট পরিচয় দিলে না কেন। একজনের উপকারের জন্য কি না করা যাইতে পারে? সামান্য পরিচয় দেওয়া ত তুচ্ছ কথা, প্রাণ পর্য্যন্ত পরোপকারের জন্য পরিহার্য্য। তুমি রমণীর বাসনা পূর্ণ করিলে না, স্বীয় মত বজায় রাখিবার জন্য, মনের সৎপ্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিলে? তুমি নিষ্ঠুর! নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখিয়া,স্মৃতির দুর্ব্বিষহ জ্বালা হইতে মুক্ত হইতে যাঁহার ইচ্ছা, তুমি তাঁহাকে দেখা দিতে না দিতে চলিয়া আসিলে। তুমি নির্দ্দয়; তোমার হৃদয় পাষাণময়। দ্রুতবেগে বহিষ্কৃত হইয়াছ? চলিয়া যাও। বিলম্বের প্রয়োজন নাই। ছি, আবার মৃদু মৃদু পদ সঞ্চারে অগ্রসর হইতেছ? আহত স্থানে বেদনা বোধ হইতেছে? অগ্রে ভাবিয়া দেখ নাই কেন? —এখন বিলম্ব করিও না;—আবার ফাঁদে পড়িবে!

শরৎচন্দ্র ধীরে, ধীরে, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটু চলিতে না

চলিতেই পা নিস্তেজ হয়ে আসিতে লাগিল; স্থানে স্থানে আবার বেদনা বোধ হইতে লাগিল। আর চলিতে পারিলেন না। কোথায় যাইবেন? বসিবার স্থান কোথায়? অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে একটী স্থান পাইলেন, সেই স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

অল্পে অল্পে দিবা অবসান হইয়া আসিল; প্রখর সূর্য্যের তেজ আবার পড়িয়া আসিতে লাগিল; বাল-সূর্য্য যৌবন অতিবাহিত করিয়া আবার বৃদ্ধের সাজে সাজিল, ক্ষীণরশ্মি মৃদু উষ্ণতা এবং উজ্জ্বলতার সহিত সেই স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র যে স্থানে উপবিষ্ট, তাহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র খাল। খালের তীরে তীরে অসংখ্য পত্র পুষ্প বৃক্ষ সুশোভিত, জলে সেই বৃক্ষের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছিল,—অল্প অল্প কম্পিত পত্রপুঞ্জের প্রতিকৃতি জলের নিম্নে ডুবিতেছিল। কখন কখনও উড্ডীয়মান পক্ষীর ছায়া জলের মৎস্যের ন্যায় ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটী বৃক্ষের ফল স্থানভ্রষ্ট হইয়া, ঈষৎ শব্দে জল-কম্পিত করিয়া জলে পড়িতেছিল, কম্পিত জলের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের প্রতিকৃতি সমূহও কম্পিত হইতেছিল।

সূর্য্য ত্রস্ত হইয়া, স্বীয় কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া অস্তাচলচূড়ে আরোহণ করিলেন; তাঁহার রক্তিম ভীম মূর্ত্তি জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া শত শত শোভা বিতরণ করিতে লাগিল। কম্পিত জলের সহিত সেই রশ্মি ঝিকিমিকি করিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। কাননের পক্ষী সকল সহসা ডাকিয়া উঠিল, এক ডাল হইতে উড়িয়া অন্য ডালে যাইয়া পড়িতে লাগিল, অন্য ডালের পক্ষীরা আবার ডাক ছাড়িল। দূরস্থ জন্তুগণ স্ব স্ব আবাস স্থানে সমাগত হইতে লাগিল। বৃক্ষ দেখিয়া কত কীট বৃক্ষে আশ্রয় অন্বেষণ করিতে লাগিল। দুই একটী কোকিল অস্বাভাবিক রবে ডাকিয়া নীরব হইল। ভ্রমরগণ গুণ গুণ রব করিতে করিতে আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিল। বৃক্ষের উপরে এবং শূন্য স্থান সমূহে জলীয় ধূম্রবৎ পদার্থ সকল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল, দিক্ সমূহ দেখিতে দেখিতে ঈষৎ তুষারে আবৃত হইল। পশ্চিম-গগন রক্তময় সে দৃশ্য দেখিলে মনে ভয় হয়। দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষ সকল ভয়ে মস্তক উত্তোলন করিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল, বায়ু থামিয়া থাকিল না, কানন ভরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, পিপীলিকা সকল নবপালকে ভূষিত হইয়া, মাটী ছাড়িয়া উঠিল, বাদুলগণ

আহ্লাদে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদিগকে উদরস্থ করিয়া পাকস্থলী পূর্ণ করিতে লাগিল। ভেকগণ নীরবে স্ব স্ব স্থানে গিয়া ডাকিতে লাগিল। আর এক প্রকার কীট ঝি ঝি করিয়া তীব্র স্বরে ডাকিতে লাগিল। দুরন্ত নবদূর্ব্বাদলোপরি কখনও কখনও সর্প দ্রুতবেগে পথ কাটিয়া যাইতেছিল; কোমল স্বভাবসম্পন্ন দূর্ব্বাদল সমূহ ভয়ে মস্তক নত করিয়া, পথ ছাড়িয়া দিতেছিল।

ক্রমে ক্রমে দুই একটী নক্ষত্র আকাশে দেখা দিল; পঞ্চমীর চাঁদ, পশ্চিম গগনে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল; কুমুদগণ মুখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল। শরৎ-চন্দ্রের পশ্চাতে অনেকগুলি বেল ফুলের ঝাড় ছিল, সময় বুঝিয়া বেল ফুল ফুটিয়া গন্ধ বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল, বায়ু সেই গন্ধ বহন করিয়া শরৎ-চন্দ্রের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইতে লাগিল। দূরে দুই একটী গাছের ভিতর দিয়া পবন একটু দ্রুত যাইতেছিল, তাহাতে সোঁ সোঁ শব্দ হইতে-ছিল। আকাশের এক দিকে একটু একটু মেঘ উড়িয়া বেড়াইতেছিল।

রজনী আসিল, চন্দ্র সময় বুঝিয়া অর্দ্ধ-বিকসিত হাসি হাসিল; নক্ষত্র সহচরীর বেশ পরিল, উদ্যান নির্জ্জন হইল; পাখীর কলরব থামিয়া আসিল, শীতল বায়ু বহিতে লাগিল; শরৎচন্দ্র বসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতেছেন। কে হঠাৎ মধু-মাখা স্বরে একটী গান গাইয়া উঠিল।

কে গান গাইল? না বুঝিতে পারিয়া, শরৎচন্দ্র বিস্মিত হইলেন। স্বর শুনিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হইল, স্বর রমণীর, কিন্তু কে গাইল? নির্জ্জন কাননে এই সময়ে কে আসিয়া গান গাইল? শরৎচন্দ্র সে স্থান হইতে উঠিয়া অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র কাহাকেও দেখিলেন না; অথচ আবার শুনিলেন, দূর হইতে কে যেন মধুর স্বরে আকাশ ভাসাইয়া গাইতেছে —"নারীর শরীর বিধি—কোমল করিল কেন?"

যে দিক হইতে স্বর আসিতেছিল, সেই দিকে দ্রুত পদনিক্ষেপে চলি-লেন, কিন্তু কোথাও কিছু না দেখিয়া, আবার আসিয়া পূর্ব্ব স্থানে বসিলেন। প্রকৃতির শোভা দেখিতে আর ইচ্ছা হইল না; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন;—'কানপুরের মধ্যে কেবলমাত্র এই স্থানটীতে একটু শ্রী আছে। এ স্থানটীর ভাব বড় ভাল বোধ হয় না; কে এমনি করিয়া মন-ভাঙ্গা স্বরে গান গাইয়া আমাকে বিরক্ত করিতে আসিল? যে কথা ভাবিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি, তাহাই আবার উদ্দীপ্ত করিয়া মনকে অস্থির করিয়া দেয়

কেন ? স্বর কি মিষ্ট !! মন একেবারে মোহিত হয় ! সঙ্গীতের কি অপূর্ব্ব শক্তি !! অঙ্গ শীতল করিয়া দেয়, এক সময়ে বিন্ধ্যবাসিনী এই প্রকার গান করিয়া আমাকে মজায়া ছিল। বিন্দুর কথা এখন আবার ভাবি কেন ? যখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তখন আমার তাহাকে এ স্মৃতি-পটে রাখিব কেন ? বিন্দুর সরল মন ! ভাবিলে মন অস্থির হয় ! তাহাকে আমি বিনা অপধাধে পরিত্যাগ করিলাম ; আমার মনে একটুও দয়া হলো না ? বিন্দু কি এখনও জীবিত আছে ? কে বলিবে ? ইচ্ছা হয়, বিন্দুকে একবার দেখি। মন ! সে কি ? এই যদি বাসনা ছিল, তবে তাহাকে ছাড়িয়া আসিলে কেন ? দুর্ব্বল মন, সহসাই চঞ্চল হইয়া উঠে।' শরৎচন্দ্র স্থির হইয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন ;—'আমার জীবন-তুল্য বিন্ধ্যবাসিনীকে আমি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে আসিয়াছি। বিন্দুর জীবনের আর কি আছে ? আমাকে ভিন্ন; বিন্দু আর কি জানে ? ইচ্ছা হয়, এই দণ্ডে বিন্দুর নিকটে যাই। হায় ! আজি কেন মানুষ হইলাম ? পাখী হইলাম না কেন ? আমি উড়িতে শিখি নাই কেন ? কেন আমি এই মুহূর্ত্তে বিন্দুকে দেখিয়া তাপিত হৃদয়কে শীতল করিতে পারিলাম না ?' 'হৃদয় দর্পণ ! তুমি কাহার প্রতিবিম্ব অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছ ? স্মৃতি-পটে এই ত সেই সরল হাসি, এই ত বিন্দুর সেই সরল স্বভাব,—এই ত বিন্দুর কেশ এলায়িত হইয়া পড়িয়াছে, এই ত বিন্দুর সেই ভ্রূ ঈষৎ বক্রভাবে শোভা পাইতেছে, এই ত বিন্দুর সেই মুখ—সেই মলিন মুখ; কে এ সকল আঁকিল ? স্মৃতি ! তুমিই একমাত্র সর্ব্বত্র সুখকরী। যাহা দেখিতে বাসনা, তাহা তুমি যেমন দেখাইতে পার, এমন আর কে পারে ? হৃদয় তৃপ্ত হইল, বিন্দুর প্রতিকৃতি দেখিয়া অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ হইল !' আবার কি শুনা যাইতেছে ? আবার গান ? মন দিয়া শুনি, এই বলিয়া শরৎচন্দ্র নিস্তব্ধভাবে গান শুনিতে লাগিলেন ;—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

আমি করি কি উপায় ?
সে মনোমোহন বিনে মরি প্রাণ যায়।
আসিলাম দেশ ছেড়ে, পিতামাতা রেখে ঘরে,
নিবাতে মন আগুন, ঢেলে প্রেম জল,—
কিন্তু সে অনল হায়, নিবে না যে এসময়,

অবলার প্রাণ যায়, ছাড়িয়া হৃদয়।
একাকিনী এ নির্জ্জনে, আত্মীয় বান্ধব-হীনে,
দিবানিশি ভাসিতেছি, নয়ন-সলিলে ;
কত আর সহে প্রাণে—যন্ত্রণায় হৃদহানে,
করুণা নয়নে প্রাণে দেখে না আমায়।

গীত সমাপ্ত হইল। শরৎচন্দ্র এবার স্থান ছাড়িয়া উঠিলেন না। ক্ষণকাল পরে সহসা যেন দুইটী প্রস্ফুটিত কোমল পুষ্প আসিয়া শরৎচন্দ্রের চক্ষুকে দৃষ্টি শক্তি হইতে বঞ্চিত করিল। কোথা হইতে এ আসিয়া নয়নকে আবরিত করিল? স্মৃতি সহসা যেন প্রেম-নিকেতন হইতে বলিয়া দিল, 'জীবনের সেই একদিন।' শরৎচন্দ্র মুগ্ধ হইলেন; পাষাণ আদ্র হইল; বীর পুরুষের মনের যে লুক্কায়িত স্থানে কঠিন আবরণে প্রেমবৃন্ত বিকসিত হয়, সেই আবরণ যেন সহসা অপসৃত হইল, সহসা সেই প্রেমফুল হইতে একটী পাপ্ড়ী খসিয়া পড়িল;—শরৎচন্দ্র বিগলিত চিত্তে আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন—'আপনি কে?'

নিমেষ মধ্যে উত্তর হইল—'আপনি কে? অগ্রে পরিচয় দিন।'

স্বর শুনিয়া শরৎচন্দ্র বুঝিলেন—'নির্জ্জন পুরীর সেই জীবনদায়িনী।' বলিলেন—'আপনি আমার নয়ন আবরিত করিলেন কেন?'

'আপনি আমাকে চিনিতে পারেন কি না, তাই জানিবার জন্য।'

'আপনাকে পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন।'

"অন্ধকারে কি প্রকাবে চিনিবেন?'

"আপনি এখানে আসিলেন কেন?"

"আপনাকে দেখিবার জন্য, আর আমাকে দেখাইবার জন্য।"

"আপনাকে ত দেখিয়াছি? যাইবার সময় আবার আসিলেন কেন?"

"আপনাকে পরিচয় দিব।" এই বলিয়া নয়ন ছাড়িয়া যুবতী শরৎচন্দ্রের সম্মুখে দাড়াইলেন। স্বীয় অঞ্চল হইতে বাতি বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থানে আলোকময় করিলেন।

শরৎচন্দ্র দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন, 'আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না কুহকিনীর দ্বারা প্রতারিত হইতেছি?' বলিলেন, 'আমার নাম বিন্ধ্যবাসিনী।

শরৎচন্দ্র বলিলেন, তোমাকে চিনিয়াছি। কয়েকদিন পর্য্যন্ত তোমাকে

দেখিয়া মনটা একটু চঞ্চল হয়েছিল, কিন্তু সহসা তোমাকে কিছু বলিতে সাহস পাই নাই ; তুমি আমাকে পূর্ব্বে পরিচয় দিলে না কেন ?

"তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই, ইহা বুঝিয়া কোন্ সাহসে পরিচয় দিব ?"

'তুমি এই দূরদেশে কি প্রকারে আসিলে ?'

'কি প্রকারে আসিলাম ?—মন যেখানে, সেখানে যাইব, ভাবনা কি ?"

এই কথা শুনিয়া সহসা শরৎ উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "সাবাস মেয়ে ! তুমি সমান্য স্ত্রী নয়। তোমাকে আমি আর দেখিব না। যেখানে ইচ্ছা যাও। আমি চলিলাম।" এই বলিয়া শরৎচন্দ্র উঠিলেন।

'কার জন্য এই দূরদেশে আসিলাম, শরৎ ? তোমার জন্য পৃথিবীর সমস্ত সুখের আশা ছেড়ে আমি কাঙ্গালিনীর বেশে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে তোমার নিকটে আসিলাম কেন ? তুমি যে হস্তদ্বারা বলবীর্য্যশালী ইংরাজদিগকে বধ করিয়া আমাকে বাঁচাইলে, সেই হস্তদ্বারা আমাকে বধ কর, আমার জীবন সার্থক হউক।'

শরৎচন্দ্র বলিলেন—'পাপীয়সি ! তাহাও করিতাম ! কিন্তু তাহাতে পুরুষত্ব কি ? তুই কুলটা—আমার হস্ত তোর রক্তে কলুষিত করিব কেন ? তোর যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যা। এই বলিয়া বিন্ধ্যবাসিনীকে হস্ত দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী ভূতলে পড়িয়া গেলেন। আর শরৎচন্দ্র ? বিন্দুর মস্তকে দুই এক স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইল দেখিয়াও, দ্রুত পদসঞ্চালনে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

হৃদয় আবার পাষাণে বাঁধিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পৃথিবীর সব যায়, দুঃখ যায় না।

আজ বিন্ধ্যবাসিনীর সব ফুরাইল। যে আশ্বাসে বিন্দুর আশাপ্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা আজ নিঃশেষিত হইল ! আজ বিন্দুর মৃত্যু হইলেও কোন দুঃখ থাকিত না। আশা না থাকিলে লোক বাঁচিতে পারে না, বিন্ধ্যবাসিনীর আর কি আশা আছে ? আজ বিন্দুর সব ফুরাইল, আর বাঁচিয়া সুখ কি ? সুখ নাই, কিন্তু কে ইচ্ছা করিয়া মরিতে পারে ? দুর্লঙ্ঘ্য অপার সমুদ্রে নিপতিত

হইলে, কাহার না ইচ্ছা হয়, প্রাণ বাহির হইয়া যাউক? এই ভব-সংসারের কষ্টজালে আবদ্ধ হইলে, কাহার মরিতে না ইচ্ছা হয়? অনেক সময়ে অনেকেরই মরিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই মৃত্যু আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয় না। ইচ্ছায় জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিতে পরিলে, এই সংসারের কষ্ট যন্ত্রণার ভয়ানক ভ্রূকুটী উঠিয়া যাইত, সংসারে কষ্টের তরণী আর কাহাকেও বহিতে হইত না। কিন্তু কালের ভাব কে বুঝিবে? আজ বিন্ধ্যবাসিনীর মৃত্যু হইলে, সকল কষ্ট নিবারিত হইত; কিন্তু তাহা হইলে কে কষ্ট ভোগ করিবে? পৃথিবীর সব যায়, কিন্তু কষ্ট যায় না; দুঃখ কোমল হৃদয়কে ছাড়ে না।

তিমিরময় রজনীর ভয়ানক ভ্রূকুটী দণ্ডে দণ্ডে প্রকাশিত হইতে লাগিল, বিন্ধ্যবাসিনী জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া সেইখানে মৃত্যু-কামনায় অচেতন হইয়া রহিলেন! অচেতন হইতে হইতেই সংসারে সমস্ত কথা স্মৃতি-পথ হইতে পলায়ন করিল, তিনি স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন;—

"এক আশ্চর্য্য রূপসম্পন্না, বিদ্যাধরী যেন তাঁহার শিরস্থানে বসিয়া বলিতেছে, 'ভগ্নি! এই দেখ এ রাজ্য কেমন মনোহর, দুঃখ যন্ত্রণা, শোক তাপ, কিছুই নাই। সংসারের মায়ায় ভুলিয়া কেন বৃথা এত যন্ত্রণার ভাগ বৃদ্ধি করিতেছ? বিচ্ছেদ-অনলে পুড়িয়া কেন ছারখার হইতেছ? সংসারে যাহাকে আপনার ভাবিতেছ, বাস্তবিক সে আপনার নহে, তাঁহা হইতেই তোমার এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা! তা কি বুঝিতে পারিতেছ না? তবে ভুলি-তেছ কেন? আইস, আমার ক্রোড়ে পূরিয়া তোমাকে এই রাজ্যে লইয়া যাইব। চিরকালের মত তোমার কষ্ট যন্ত্রণা দূর হইয়া যাইবে! তোমার দেহের আশা করিওনা, এই দেখ তোমার জন্য স্বর্গের দ্বার মুক্ত রহি-য়াছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী দেখিতে লাগিলেন,—"বিবাদ-বিসম্বাদ-শূন্য, স্বর্ণ-মণ্ডিত পুরী। তাহার ভিতরে দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কোপরি শত শত কুল-কামিনীগণ বিরাজ করিতেছেন! সকলের মুখ প্রফুল্ল, যন্ত্রণার চিহ্নমাত্রও তথায় নাই। নয়ন তৃপ্ত হইল! দেখিতে দেখিতে সেই রমণী যেন বিন্ধ্যবাসিনীকে গোপনে কি বলিলেন, বিন্ধ্যবাসিনীও মস্তক নত করিয়া তাঁহার কথায় সায় দিলেন। রমণী একখানি স্বর্ণ-নির্ম্মিত আসন দেখাইয়া বলিলেন, "ভগ্নি! স্বর্গে যাইবে ত এই আসনে উপবিষ্ট হও।"

"বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, আসনে বসিবার পূর্ব্বে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই ;—ওখানে গেলে আমার শরৎকে দেখিতে পাইব ত ?

রমণী বলিলেন, আবার সেই পামরের কথা ? মুখে আনিতে একটুও লজ্জা বোধ হলো না ? কার জন্য তুমি এত কষ্ট পাইতেছ ? কার জন্য তোমার এত যন্ত্রণা ? শরৎ তোমাকে গ্রহণ করিবেন না, তা কি তোমার এখনও বিশ্বাস হয় না ? ছি ! কোন্ মুখে তুমি সেই পামরের কথা আবার বলিলে ?"

'বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, তিনি আমারই। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করুন্, আমি তাঁহাকে ধ্যান করিতেং জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইব। তিনি আমাকে ভাবুন আর না ভাবুন ; তিনি আমাকে গ্রহণ করুন্ আর না করুন, আমি কোন্ প্রাণে তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিব ? আমার কষ্ট হইতেছে, এ আমার স্বীয় কর্ম্মের ফল ! শরতের দোষ কি ?'

'রমণী বলিলেন, সংসারের মত্ততায় তুমি আজও অন্ধ রহিয়াছ, নচেৎ যে নিষ্ঠুর শরৎ তোমাকে এই পাষাণের উপর ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার কথা তুমি এইক্ষণও ভাবিতেছ ? তাঁহার আশা তুমি এইক্ষণও ছাড়িতে পারিতেছনা ? সেত তোমাকে একবারও ভাবে না।

'বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন,আমাকে ক্ষমা করুন ! শরৎচন্দ্রকে ধ্যান করিলেও মনে যে বিমল সুখ পাই, সে সুখ হইতে আমি বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা রাখি না। শরতের আশা ছাড়িয়া আমি সুখ পাইব, আমার মনে ইহা স্থান পায় না।'

এই কথা শুনিতে শুনিতে সেই রমণী অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন ; সেই স্বর্ণ-মণ্ডিতপুরী ক্ষণকালের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল ; সেই স্বর্ণাসন নিমিষের মধ্যে কোথায় গৃহীত হইল, তাহা আর বিন্ধ্যবাসিনী দেখিতে পাইলেন না ; তাঁহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তবুও চেতনা হইল না।

রজনী গাঢ়তর হইল ; আকাশের মেঘ কোথায়ও নীলবর্ণ, কোথায়ও ঈষৎ রক্তিম, কোথায়ও একেবারে গাঢ়তর কালিম, সময়ে সময়ে বিদ্যুতের আলোকে দেখা যাইতে লাগিল। নীরব কানন, আকাশে মেঘ, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, শীতল বায়ু ছাড়িল ; এক একটী পাখী কলরব করিয়া নীরব হইল। বিন্দু কিছুই জানেন না। আকাশের মেঘ জলে প্রতিবিম্বিত হইল, বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে জলের ভিতরে সকলই দেখা যাইতে লাগিল, ঘোরতর অন্ধকার

যন্ত্রণা হইতে আরম্ভ হইল, তবুও বিন্দুর চেতনা হইল না। অচেতন অবস্থায় কত কি চক্ষের সম্মুখে পড়িতে লাগিল, কষ্টের কথা সকল একবার একবার মনে পড়িতে লাগিল, কিন্তু কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না; এক চিন্তা দণ্ডে দণ্ডে অন্য চিন্তার স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিল; মনে দুঃখ হইল, স্বর্গের কথা মনে হইল, ভাবিলেন, 'কেন গেলাম না?' সংসারের কষ্টের হাত কেন ইচ্ছা করিয়া এড়াইলাম না? আবার সম্পূর্ণরূপে সকল বিস্মৃত হইলেন, আবার অচেতন হইলেন; আবার ক্ষণকাল পরে একটু চৈতন্য হইল, ভাবিলেন—'কেন গেলাম না? ভাবিতে ভাবিতে আবার ক্ষণকালের মধ্যে সকল ভুলিয়া অচেতন হইলেন।

এই প্রকারে বিন্ধ্যবাসিনীর দুঃখের নিশি তিল তিল করিয়া গত হইতে লাগিল, ক্ষণকাল পরে আবার শরৎচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিন্ধ্যবাসিনী মলিন মুখ ধরিয়া বলিলেন—'বিন্দু।'

বিন্ধ্যবাসিনী সিহরিয়া উঠিলেন; মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, সহসা মুখ তুলিয়া বলিলেন—'কে, শরৎ?

শরৎচন্দ্র বলিলেন, হাঁ আমি। তুমি অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছ বুঝি?

বিন্ধ্যবাসিনী।—তুমি কি সেই পর্য্যন্ত এখানে বসিয়া রহিয়াছ? এতক্ষণ কথা না বলিয়া চুপ করিয়া ছিলে কেন?

এই সময়ে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল, হঠাৎ একবার বিদ্যুতের আলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া শরীরকে বিকম্পিত করিল; জলের উপরে যে সকল মৎস্য ভাসিতেছিল, তাহারা শব্দ করিয়া ভীত মনে জলের ভিতরে আশ্রয় লইল।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—বিন্দু?

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন—কি, প্রাণের শরৎ!

শরৎচন্দ্র পুনরায় বলিলেন—'বিন্দু! তুমি গুরুতররূপে আহত হয়েছ?'

বিন্ধ্যবাসিনী আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন—'কই? আমিত কখনও আঘাত পাই নাই; তুমি কি স্বপ্ন দেখিতেছ?'

শরৎচন্দ্র বলিলেন,—'আমি তোমাকে এই পাষাণের উপর সজোরে ফেলিয়া দিয়াছিলাম; তুমি আঘাত পাও নাই?'

বিন্দু। কই? তাত আমার স্মরণ হয় না। তুমি কখন আমাকে ফেলিয়া গিয়াছিলে?

শরৎচন্দ্র। তোমার মনে নাই। অনেক কষ্টের সময় সকল কথা মনে থাকে না। আমি তোমাকে ফেলিয়া গিয়াছিলাম।

বিন্দু। গিয়েছিলে, আবার আসিলে কেন ?

শরৎ। তোমাকে দেখিতে আবার ইচ্ছা হইল।

বিন্ধ্যবাসিনীর নয়নপ্রান্ত হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিল, বলিলেন, 'শরৎ! আমি অপরাধিনী, আমাকে দেখিতে তোমার ইচ্ছা হইল কেন ?

এই সময় বৃষ্টি জোরে পড়িতে লাগিল, শরৎচন্দ্র বিন্ধ্যবাসিনীর হাত ধরিয়া নিকটস্থ একটী পর্ণকুটীরে আশ্রয় লইলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, শরৎ! এতদিন পর তোমার হস্তস্পর্শ করে, আমার তাপিত হৃদয় শীতল হইল, তুমি কি প্রকারে এতদিন ভুলে ছিলে ?

শরৎচন্দ্র বলিলেন, বিন্দু! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার মন বড়ই উৎসুক হইতেছে ; অনুমতি পাইলে বলিতে পারি।

বিন্দু। আমার আবার অনুমতি কি, তোমার ইচ্ছা হলেই ত বলিতে পার।

শরৎচন্দ্রের মুখ গম্ভীর হইল, বলিলেন,—বিন্দু! যে পর্য্যন্ত আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর না পাইব, সে.পর্য্যন্ত তুমি আমার নও। আমার প্রশ্ন— 'তুমি একাকিনী কেমন করে এই দূরদেশে আসিলে ?'

বিন্ধ্যবাসিনীর মন চঞ্চল হইল, বলিলেন, নাথ! সে সকল কথায় প্রয়োজন কি ? আমার অপরাধ কি তুমি ক্ষমা করিবে না ?

শরৎচন্দ্রের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বলিলেন, বিন্দু! আমাকে প্রবঞ্চনা করিও না ; তোমাকে দেখে আমি কত সুখী হইয়াছি, তা ঈশ্বরই জানেন, তুমি আমার সেই সুখ হরণ করিও না ; যথার্থ উত্তর দাও।

সহসা কাক ডাকিল ; আকাশ ঘন অন্ধকারে আবৃত ; বৃষ্টি অনবরতই পড়িতেছে। বিন্ধ্যবাসিনীর হৃদয় অস্থির হইল ; কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাক্য নির্গত হইল না, চক্ষু প্লাবিত হইয়া জল পড়িতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, অনেক কষ্টে বিন্দু শরৎচন্দ্রের গলা ধরিয়া বলিলেন,—'নাথ! আমি কি—আর বাক্য ফুটিল না। শরৎচন্দ্রের মনে সন্দেহ দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইল, বলিলেন, বিন্দু! আমাকে আর কষ্ট দিওনা। তুমি কি প্রকারে এই দূরদেশে আসিলে, যতক্ষণ না জানিব, ততক্ষণ আর আমার মন সুস্থ হইবে না। আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে ; আর বিলম্ব করিও না।

বিন্ধ্যবাসিনী কাতর-স্বরে বলিলেন,—"শরৎ, এই কি তোমার পরীক্ষার সময় ? এতদিন পরে কোথায় তোমার সহিত ভালভাবে দুট কথা বলিব, না তুমি আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইলে ? শরৎ! আমাকে ক্ষমা কর, সকল কথা পরে বলিব।

শরৎচন্দ্র নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, 'বলিলে না ? তবে আমার গলদেশ হইতে হস্ত অপসৃত করিয়া লও। অপরাধিনি! আমার নিকট সকল কথা বলিতে কুণ্ঠিত হও ?'

বিন্ধ্যবাসিনী নীরবে রহিলেন, কথা বলিতে চেষ্টা করিলেও বাক্য ফুটিল না।

শরৎচন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার মন কেন অস্থির হয় ? বিন্দুর সুখে সুখী হইব, সে আশা অনেক দিন হইল পরিত্যাগ করেছি, তবে আজ আবার মন অস্থির হইতেছে কেন ? 'বিন্দুর আত্মশুদ্ধি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইতেছে! বিন্দু যথার্থ উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হয় কেন ? আমি তখনইত ভাবিয়াছিলাম—'বিন্দুর চরিত্রে কলঙ্ক পড়িয়াছে,' জানিয়াও আবার আসিলাম কেন ? আর আসিলাম যদি, তবে উত্তর পাইলাম না কেন ? উত্তর পাইলাম না, তাতেই বা মন অস্থির হয় কেন ? বিড়ম্বনা আর কি ? আমি কি স্ত্রীলোকের ফাঁদে ইচ্ছা করিয়া প্রবেশ করিতেছি ? না হইলে কেন আসিলাম ? তবে যাই ; এখনই যাইব—বিন্দু আমার কে ?' বলিলেন,—বিন্দু, তুমি আমার কথার উত্তর দিলেনা, তবে আমি চলিলাম।

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, যাইও না, বলিতেছি।

শরৎ।—বল।

বিন্ধ্য।—কি বলিব ?

শরৎ।—আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার যথার্থ উত্তর দেও—তুমি এখানে আসিলে কেন ?

বিন্ধ্য।—তোমাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য।

শরৎ। কেমন করিয়া আসিলে ?

বিন্ধ্য। কোন একজন লোকের সঙ্গ ধরিয়া আসিয়াছি।

শরৎ।—সে লোক কে ?

বিন্ধ্য।—তুমি চিনিবে না।

শরৎ।—তুমি অপরিচিত লোকের সহিত কি প্রকারে আসিলে ?

বিন্ধ্য।—কি প্রকারে আসিলাম, তাহা বলিতে পারি না।

শরৎ।—তোমার আত্মশুদ্ধি সম্বন্ধে তোমার কি প্রকার বিশ্বাস?

বিন্ধ্য।—এই কথা বলিবে? আমি অবিশ্বাসিনী, আমি বলিলেই বা তুমি আমাকে বিশ্বাস করিবে কেন? আমার উপর তোমার যে সন্দেহ হইতেছে, সে সন্দেহ আমি কি প্রকারে দূর করিব?

শরৎ।—তোমার নিজেব উপর তোমার বিশ্বাস আছে?

বিন্ধ্য। কি প্রকারে বলিব? আমি তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই জানি না, তুমিই যখন আমাকে সন্দেহ করিতেছ, তখন আমার প্রতিও আমার সন্দেহ হইতে পারে। কি প্রকারে বলিব?

শরৎচন্দ্র ক্রোধে স্ফীত হইলেন, সামান্য সংসারী লোকদিগের ন্যায় বলিলেন; 'পাপীয়সি! আপনার মুখেই তুই দোষ স্বীকার করিলি—'দূরহ'— এই বলিয়া পুনরায় বিন্ধ্যবাসিনীকে সেই স্থানে ফেলিয়া শরৎচন্দ্র চলিয়া গেলেন; বিন্ধ্যবাসিনী পুনরায় অচেতন হইলেন।

আকাশ পরিষ্কার হইল, বৃষ্টি থামিল, নিশি অবসান হইয়া আসিল, নিকটের অন্ধকার ক্রমে ক্রমে পশ্চিম সরিয়া যাইতে লাগিল, পূর্ব্বদিক পরিষ্কাব হইল, পূর্ব্বদিকের অন্ধকার পশ্চিমে যাইয়া স্থান লইল, বিন্ধ্যবাসিনীর চেতনা হইল না। কত পাখী কত মধুর স্বরে আহ্লাদে ডাকিল, কিন্তু সে সকল ডাকে বিন্দুর চৈতন্য হইল না। বিন্ধ্যবাসিনীর দুঃখের জাল ছিড়িল না। সেইস্থানে অচেতন অবস্থায় তিনি কষ্টের দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন। এদিকে শরৎচন্দ্র একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্বদেশাভিমুখে।

বসন্তকালে কোকিল ডাকিলে যাহাদের মন চঞ্চল হয়, তাহারা প্রণয়ের অধস্তন কূপে পড়িয়া সর্ব্বদাই ছট ফট করে, মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ অনুভূত হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছে, প্রেমশূন্য জীবন, পাশব-জীবনের সহিত তুলনীয়। মানবের উৎকৃষ্ট শিক্ষাই প্রেম, এই প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া

যাহারা কুটিল প্রণয়ের অনুসরণ করে, তাহাদিগের মত্ততায় সংসার আসিয়া ভস্মাবশেষে পরিণত হইতেছে, উৎকৃষ্ট মানবজন্ম অসারত্বের পরিচয় দিতেছে। বৃত্তিশূন্য রিপুর উত্তেজনা বড় ভয়ানক, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু অভ্যাস দোষেই রিপুর আধিপত্য বিস্তার হয়। রিপু-শূন্য হইলেই যে উৎকৃষ্ট মানব হইল, তাহা আমরা বলিনা; যে মানবদেহ পাইয়াছে, তাহার মধ্যেই রিপু থাকিবে। রিপুকে সংযত রাখিতে পারিলেই মনুষ্যত্ব। যদি সংযত না কর, দেখিতে দেখিতে রিপু তোমাদের উপর একাধিপত্য ক্ষমতা বিস্তার করিবে, তোমরা হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়া যাহা দেখিবে, সে সকলই মত্ততায় রিপুর আয়ত্ত বলিয়া বোধ হইবে; সকলই সেই রিপু চরিতার্থের উপকরণ বলিয়া বোধ হইবে। তখনই প্রেম-শূন্য মত্তপ্রণয়ী বলিবে,—বসন্তে কোকিলের ঝঙ্কার শুনিলেই রিপু উত্তেজিত হয়। আর বলিবে—ঐ যে সুগন্ধযুক্ত পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, ঐ যে মৃদু মন্দভাবে অল্পে অল্পে দিক্ ব্যাপিয়া মলয়ানিল বহিতেছে, আর ঐ যে রূপের বাহার, এসকলই প্রণয়ের উপকরণ। কি ঘৃনিত অসার কথা! প্রেম মানবের সাধনার উপযুক্ত বস্তু, প্রণয় পশুত্ব। এই প্রণয় রিপুর সেবা, প্রেম বৃত্তির পরিচালনা। রিপু চরিতার্থ কর আর না কর, প্রেম শিক্ষা করিয়া দেখ, ঐ বসন্ত, আর ঐ কোকিল, ঐ মলয়ানিল, আর ঐ প্রস্ফুটিত পুষ্প, সকলই হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দিবে, বিষের পরিবর্ত্তে সকল হইতেই অমৃত বর্ষিত হইবে।

জগদীশ বাবু প্রেম সাধন করিতে পারিয়া থাকুন বা না থাকুন, তিনি উৎকৃষ্ট প্রণয়ী। বসন্তের কোকিল ও মলয়ানিল, এসকলের আধিপত্যে জগদীশ বাবুর মন বিচলিত হয়; মালতী দেবীর অদর্শনজনিত কষ্ট, অসহনীয়। কি করিবেন, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার যো নাই, তাই এপর্য্যন্ত নীরবে পাটনায় বসিয়া ছিলেন। যে দিন শরৎচন্দ্র পাটনা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন, তার পরদিন হইতেই তিনি অস্থির হইলেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট যে পত্রখানি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আরো অস্থির হইলেন, সে পত্রের মর্ম্ম এই—

"আপনার দ্বারা আমি যে উপকার পাইয়াছি, তাহা বিস্মৃত হই নাই, এ জীবনে কখনও হইব না। আমার জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আপনাকে বলিলে আপনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন, এই ভয়ে আপনাকে না বলিয়াই চলিলাম, অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

আমার জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতেই যদি এ জীবন শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে আপনার নিকট চিরঋণী থাকিয়াই মরিব। কি করি, জীবনকে বিক্রয় করিয়া, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে কখনও শিক্ষা করি নাই,—কখনও শিক্ষা করিব না।

আপনি আমার পারিবারিক সংবাদ শ্রবণ করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, সে কাহিনী আপনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন কি না জানি না. তবু এই সময়ে আপনাকে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই।

'আপনার ভাগিনেয় অবিনাশচন্দ্র আমার সুহৃদের জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের পুত্র। আমার আর চারিটী সহোদর বর্ত্তমান আছেন; পিতা, মাতা, কেহই জীবিত নাই। আমার একটী বিধবা ভগ্নী আছে, তাহার নাম নীরদা,—নীরদা অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহার মন অটল, না হইলে সমাজ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, তাহাকে আবার বিবাহ দিতাম, কিন্তু নীরদা সে প্রকার মেয়ে নহে। আর আমার বিবাহ? বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আপনি একদিন অপ্রতিভ হইয়াছিলেন; বাস্তবিক ধরিতে গেলে, আমার বিবাহ হইয়াছে। বিন্ধ্যবাসিনী আমার শৈশব সহচরী,—যৌবনের ভুজঙ্গিনী। এ সকল কর্কশ কথা লিখিলাম কেন? একমাত্র কারণ, আমি বিবাহ করিয়া একদিনও সুখ পাই নাই, বিবাহ-সুখ আমি স্বীকার করি না।'

আমি কোথায় চলিলাম, তাহা আজও বলিলাম না, বোধ হয় শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন। তবে অদ্য বিদায় হই।" স্নেহাকাঙ্ক্ষী—শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের পলায়নের ১৫।১৬ দিন পরেই জগদীশ বাবু শরৎচন্দ্রের মনের কথা বুঝিতে পারিলেন; বুঝিতে পারিলেন—শরৎচন্দ্র বালকত্ব-শূন্য, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সজীব পুরুষ; বুঝিলেন, রাজনীতি তাঁহার জীবন-ভূষণ; যুদ্ধশিক্ষা এবং বীরত্ব তাঁহার চিত্তবিনোদক। ভাবিলেন, বীর পুরুষদের হৃদয় কঠিন না হইলে কি প্রকারে প্রজ্বলিত বহ্নিতে আত্ম সমর্পণ করিবে? ভাবিলেন, হতভাগিনী বিন্ধ্যবাসিনী মালতীর অপেক্ষাও দুঃখিনী।

এদিক বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মে মাস অতীত হইতে না হইতেই বারাণসীর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হইল। বারাণসীর ন্যায় মহা-শ্মশান আর কোথাও নাই;—এই শ্মশানে মহাপরাক্রমশালী শিক বংশের অধঃপতন, এই শ্মশানে মহারাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চরমসীমা, এই শ্মশানে দিল্লির সম্রাটগণের শেষ জীবন-অভিনয়! এখানে না আছে এমন কিছুই নাই! মোগল,

মহারাষ্ট্র, সিপাহি সকল জাতির ক্ষমতা ও প্রভুতা এইখানে ধূলিলুণ্ঠিত! ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বারাণসীর শ্মশানে অগ্নি জ্বলিবে না, ইহা যাঁহারা ভাবিতে পারেন, তাঁহারা আজ পর্য্যন্তও রাজনীতির কঠোর ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহারা আজ পর্য্যন্তও ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত! যেখানে এত প্রজ্বলিত অগ্নি ভস্মে পরিণত হইতেছে, সেই শ্মশান যে এই সময়ে একেবারে নির্ব্বাণ থাকিবে, তাহা কল্পনার অতীত। বাস্তবিক বারাণসী এই সময়ে নীরবে ছিল না। জুন মাসের তিন দিন অতীত হইতে না হইতেই আজিমঘরে ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই ঘটনার সংবাদ পাটনায় পৌঁছিলে, তথাকার সমস্ত লোক ব্যস্ত হইয়া দিক্‌দিগন্তরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারীগণ ভয়ে জীবন বাঁচাইবার জন্য অগ্রেই পাটনা নগর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। জগদীশ বাবু নিতান্ত ভীরু, তিনি অগ্রে পাটনা ছাড়িলেন। পাটনা ছাড়িবার সময় এত ত্রস্ত ছিলেন যে, কোথায় যাইবেন, তাহাও ঠিক করিতে অবসর পান নাই। কল্পনায় একটী স্থান ক্রীড়া করিতেছিল, মনে সর্ব্বদাই জাগরিত ছিল, সেই বিপদের অবলম্বন, সুখ-স্বপ্নময় স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবার সময় তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা আমরা অনুভব করিতে সক্ষম নহি। এই স্বদেশে জগদীশ বাবুর শৈশবে পিতা মাতার অভিনয়,—কত প্রীতিকর, কত সন্তোষজনক! এই জন্মভূমি,—বাল্য কালে আব্দারের সুখ-সমৃদ্ধি, দূরদেশ হইতে পাঠ সমাপন করিয়া বাড়ী যাইবার সময় কত সুখকর বোধ হইত! জন্মভূমি শৈশবের আদর,—বাল্যকালের সুখ-সমৃদ্ধি,—আর যৌবনে? যৌবনে যোগিনীর সহিত মিলনের স্থান!—জন্মভূমি কত সুন্দর, কত মনোহর,—মন হইতে এক দিনের তরেও সেস্থান অবসর লয় না; কল্পনায়ও কত সুখ! বৃদ্ধের ধর্ম্মসাধনের উপযুক্ত আবাস!—কে জানিবে, জন্মভূমি কত প্রীতিকর? এত সাধের জন্মভূমি দিন দিন যখন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তখন জগদীশ বাবুর মন কত কত সুখ-স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। তবুও এক্ষণ কিছু নাই,—তবুও সময়স্রোতে পূর্ব্বের যে সকল আদরের বস্তু ভাসিয়া গিয়াছে,—আর সে শৈশব নাই, আর সে শৈশব-সহচর নাই, আর সে বাল্যকাল নাই, আর সেই বাল্যকালের আব্দার নাই! আবার যৌবন? যৌবনও যায় যায় হইয়াছে! কিন্তু স্মৃতি ত যায় না। যতদিন স্মৃতি, ততদিন

জন্মভূমির আদর! আর মৃত্যু সময়ে? সমস্ত সংসার ভ্রমণ করিয়া দেখ, আর কোথাও মরিতে অভিলাষ হইবে না; সেই জন্মভূমিতে শয়ান—নাড়ী ক্ষীণ, অঙ্গ শীতল—সংসার-আশা তিল তিল করিয়া যাইতেছে, চতুর্দ্দিকে স্বদেশী আত্মীয় বান্ধব উপবিষ্ট—সেই মৃত্যু সময়েও কত সুখ! জগদীশ বাবুর পিতা নাই, মাতা নাই!—আর মালতী? কে জানে, মালতী আজও জগদীশ বাবুর জন্য জন্মভূমিকে স্বর্গ-সুখের উপযোগী করিয়া রাখিতেছে? জগদীশ বাবু জানেন না, মালতী মৃত কি জীবিত; তবুও স্বদেশের দিকে ধাবিত হইলেন। জগদীশ বাবু এবার ঠিক করিলেন, মালতীকে না দেখিলে প্রাণত্যাগ করিব। ভাবিলেন, তবুও স্বদেশে মরিব। যেস্থান হইতে এই শরীরের উৎপত্তি, সেই প্রিয়তম স্থানে এই শরীরকে বিলীন করিব। এই প্রকার ভাবিয়া জগদীশ বাবু স্বদেশের দিকে চলিলেন, জগদীশ বাবু ঢাকায় পৌঁছিয়াই এক বিপদে পড়িলেন!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দীপ নিবিল।

কাঞ্চনপুর, বলরাম বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ীর ভিতর, সূর্য্যাস্তের সময় একটী লোক, ব্যস্ততা সহকারে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল মধ্যে কোটরত্রয় অতিক্রম করিয়া একখানি পর্য্যঙ্কের নিকট দাঁড়াইলে, কেহ মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'অনুসন্ধানের শেষ ফল কি হইল?' সেই লোকটীর শ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল, বলিল—শেষ ফল, জগদীশ বাবুকে পাওয়া যায় নাই,—সকল লোকই ফিরিয়া আসিয়াছে।

পর্য্যঙ্কে একটী পীড়িত স্ত্রীলোক শয়ান ছিল, উত্তর শুনিয়া তাঁহার শ্বাস দীর্ঘ হইল, কথা বলিতে কষ্ট হইলেও বলিলেন, 'তবে আমার আর বিলম্ব নাই।'

কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; দূরস্থ ধমনী নিস্তেজ হইল, চক্ষু দাঁড়াইল, জীবনের শেষ অভিনয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ সমূহ স্পষ্টতররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল, নিকটস্থ বৈদ্য বলিল,—এইবার বাহির কর।

বলিতে বলিতেই চতুর্দ্দিকের লোকেরা জীবনের শেষক্রীড়া সম্পন্ন করিবার মানসে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনয়ন করিল। ঘরের মধ্যে

সহসা আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, পাড়ার লোক সকল বিপদ গণনা করিয়া ছুটিয়া আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সকলের চক্ষু হইতেই জল পড়িতে লাগিল।

চক্ষের জল কাহারও আপনার বশে নহে, পড়িবার সময় হইলে পড়িবেই পড়িবে। তোমার ধৈর্য্য গুণ আছে,তুমি সেই জল অঞ্চল দ্বারা আপনা আপনি মুছিতে পার, কিন্তু জল পড়িবেই পড়িবে। মানব অল্প সময়ের মধ্যে যত লীলা খেলা করে, তাহার মধ্যে মৃত্যুই নয়ননীর পতনের সময়। এত যত্নের মানবলীলার অভিনয়ের শেষ পটক্ষেপণ,—এত সাধের, এত আড়ম্বরের, এত আশার এই শেষ ফল,—শেষ লীলা! আর দেখিব না,—কেহ কখনও দেখে নাই, এই পটের অপর ধারের অভিনয় আজ পর্য্যন্ত কাহারও নয়নকে জুড়ায় নাই; এখানে কল্পনা পরাস্ত হয়; ভাবিতে বসিলে হৃদয় দুঃখে অবসন্ন হয়, নৈরাশ্য আসিয়া আপনা আপনি নয়ন হইতে জল ঝরাইতে থাকে! সংসারে এই উন্নতির শেষ, এই মানবজন্মের অহঙ্কারের শেষ সীমা।' কাহার নয়ন জলে প্লাবিত না হয়? আজ যাহা দেখিলাম, কাল আর তাহা দেখিব না, এজন্মে আর সে দৃশ্য নয়নপথে পড়িবে না, এজন্মে আর সেই মধু-মাখা বদন-হাসি দেখিব না! আজই শেষ, চিরকালের মত এই শেষ, এজন্মের সাধ এই মিটিল; ইহা ভাবিতে জানিলে, কাহার চক্ষে না,জল আসে? ধর্ম্মজীবনের চিরসঞ্চিত আশাভরসা এই স্থানে পরাজিত। কে বলিতে পারে, আবার পরকালে নিশ্চয় মিলন হইবে? অন্ধকার,—জ্ঞানচক্ষুর অতীত; কাহার মন, এই আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া মৃত্যুকালের চক্ষু-জল নিবারণ করিতে পারে? সব অকারণ,—রোদনে ফল নাই? এ সকল জ্ঞানের কথায় হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি নিবারিত হয় না; এতদিন দেখিলাম, আর দেখিবনা, এশোক অনিবার্য্য। সহ্য করা পরের কথা; আমরাও জানি, চক্ষের জল চিরকাল পড়ে না; কিন্তু সাময়িক বেগ নিবারণ করে, কাহার সাধ্য?

মৃত্যু-স্মরণে জীবিত ব্যক্তির মন, ধর্ম্মের জন্য তৃষিত হয়; ধার্ম্মিকের মন পবিত্র হয়, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু পাষাণ ব্যতীত সকলের মনই আর্দ্র হয়; সকলের মনই ক্ষণকালের জন্য সংসার অস্থৈর্য্যের কল্পনায় অস্থির হয়। এই নবীনা স্ত্রীলোকটীর অসাময়িক মৃত্যু ঘটনায় সকলেই কাঁদিতে আরম্ভ করিল, কেবল একজন লোক দেখা গেল, যাহার চক্ষু হইতে জল পড়িল না;

সে স্ত্রীলোকটীর মাতা। মাতার প্রথম উচ্ছাসের শোক ক্রন্দনের অতীত; যখন শোক ক্রন্দনের সীমায় পৌছে, তখনই শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতে থাকে।

রজনী বাবুকে কারাগারে লইয়া গেলে পর, মালতী-দেবী ভূতলে পড়িয়া অচেতন হইলেন; হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী রজনী বাবুর আদেশানুসারে তাঁহাকে শুশ্রূষা করিয়া কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত রাখিয়া গেলেন। কাঞ্চনপুরে আসিয়াও মালতীর মন সুস্থ হইল না; যে দুর্ব্বিসহ মনঃকষ্টে মালতী দেবী ভূতলশায়িনী হইয়াছিলেন, সে কষ্ট এখনও মনকে দগ্ধ করিতেছে। মালতী দেবী দিন রাত্রি বসিয়া চিন্তা করেন, কাহারও সহিত আলাপ করেন না, কেবল ভাবেন,—রজনী বাবুর দুর্দ্দশা। সেই দুর্দ্দশার কথা মনে হলেই মন অস্থির হয়,—সেই শিশু, সেই জগদীশ বাবুর প্রতিবিম্ব,—আর সেই জগদীশ বাবু। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে শরীর শীর্ণ হইল, অবশেষে ঘোরতর পীড়া আসিয়া অক্রমণ করিল। ঘোরতর পীড়া আক্রমণ করিল, দিনে দিনে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিল তিল করিয়া মালতী দেবীর জীবনের আশা চলিয়া গেল; মৃত্যুকে মালতী দেবী এই দুর্ব্বিসহ কষ্টের হাত হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র অবলম্বন ঠিক্ করিলেন। মৃত্যুও সময় বুঝিয়া সংসারের কষ্ট, সংসারের যন্ত্রণার হাত হইতে মালতীকে রক্ষা করিবার জন্য, আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। আর এক মুহূর্ত্ত,—আর এক মুহূর্ত্ত পরে মালতীর অস্তিত্ব লোপ হইবে।

সধবা স্ত্রীলোকের মৃত্যু সময়ে স্বামী নিকটে থাকিলে বড় সৌভাগ্য। যাঁহার পুত্র থাকে, তাঁহার ত কথাই নাই, পুত্র না থাকিলে স্বামীই মুখে অগ্নি প্রদান করে। মালতী দেবীর পীড়া যখন মারাত্মক হইয়া উঠিল, তখন জগদীশ বাবুর অনুসন্ধানার্থ ৩।৪ জন লোক স্থানে স্থানে প্রেরিত হইল; জগদীশ বাবু ইতিপূর্ব্বে একখানা পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি পাটনাতেই অবস্থিতি করিতেছেন, তজ্জন্য সকলের পূর্ব্বে পাটনায় লোক প্রেরিত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পাটনার লোক তাঁহার অনুসন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। তার পর কলিকাতা এবং ঢাকায়ও লোক পাঠান হইল, তাহারাও নৈরাশ হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। মালতী দেবী মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও জগদীশ বাবুর আশা পরিত্যাগ করেন নাই, যখন তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল, তখন তিনি আশ্বাসিত হইয়া একটু সুস্থ হইয়া-

ছিলেন। মন সুস্থ হইলে পীড়ার পরাক্রম কথঞ্চিত পরিমাণে হ্রাস হয়; মালতীদেবীও একটু সুস্থ হইলেন; যে দিন পাটনার লোক ফিরিয়া আসিল, সেই দিন হইতেই তিনি নৈরাশ হইলেন, পীড়া আবার বৃদ্ধি পাইল। আজ সেই পীড়া মৃত্যুর অভিনয় দেখাইবার জন্য প্রস্তুত; হতভাগিনী মালতী আজ এ সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করিবে!! মালতী দেবীর স্পন্দহীন দেহ বাহিরে আনীত হইল,—চক্ষু দাঁড়াইল, কর্ণ দীর্ঘায়তন প্রাপ্ত হইল, হস্ত পদাদি সহসা একবার প্রসারিত হইয়া পড়িল, আর নড়িল না; মুখদ্বারা বারম্বার ঘন ঘন শ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল; এ সময়েও কথা বলিবার একটু শক্তি ছিল, অতি কষ্টে বলিলেন—'আমার—র—র,' কতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না, আবার স্নায়ু সকলের তাড়না বৃদ্ধি পাইল, দন্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন,—'এখনও আসিল—ল—না?' আবার মুখ বন্দ হইল, চক্ষু মুদিত হইল,বৈদ্য ভাব দেখিয়া বিষাক্ত ঔষধ উদরস্থ করাইবার জন্য চেষ্টা দেখিল, কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না; মালতীর দন্তে দন্ত দৃঢ়তর আবদ্ধ, ঔষধ মুখ ভাসাইয়া পড়িয়া গেল। কতক্ষণ পর কবিরাজ বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তোমরা মুখ খুলিয়া ধর, আমি ঔষধ মুখে ঢালিয়া দেই।' নিকটস্থ আত্মীয়গণ তাহাই করিল, বৈদ্য ঔষধ মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু মালতীর মুখ মেলিল না; মূর্খ বৈদ্য বলিল—'মালতীর মৃত্যু হইয়াছে।'

চতুর্দ্দিকে গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। গৃহের ক্রন্দন ধ্বনির সহিত বাহিরের বিলাপধ্বনি একত্রিত হইয়া গগনে উঠিল। কেহ কেহ পরোপকার করিবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, 'সৎকারের' আয়োজন করিবার জন্য ব্যস্ত হইল।

দিন গেল, রাত্রি আসিল। অন্ধকার রজনী, দুই একটী ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে, মালতীর নিকটে কেবল একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক উপবিষ্ট।

অনেকক্ষণ পর মালতীদেবীর শরীর আবার নড়িয়া উঠিল, চক্ষু সহসা উন্মীলিত হইল, আস্তে আস্তে কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন।—এবার বাক্য ফুটিল, বলিলেন, "অন্তিমে—পতির মুখ—দর্শনে--না মিলিল।'

আরো অনেক কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন, মুখ হইতে আর শব্দ বাহির হইল না; মস্তক কম্পিত হইল, মুখ বিকৃত করিয়া বহুকষ্টে অস্ফুট স্বরে বলিলেন—'মনের—যাতনা মম—মনেতেই রহিল।'

কি আশ্চর্য্য! মৃত ব্যক্তি কথা বলিতেছে? ইহা ভাবিয়া, অনেকে ভূতের

আশঙ্কা করিয়া সেস্থান হইতে পলায়ন করিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামময় এই কথা ছড়াইয়া পড়িল।

নিকটের স্ত্রীলোকটী দীপ উস্কাইয়া বলিল—'মা। কি বলিতেছ?'

এই অন্তিম সময়ে সহসা একটী লোক উপস্থিত হইল। অনেকে খবর বহিয়া আনিয়া বলিল—'জগদীশ বাবু আসিযাছেন। মালতীর কর্ণে সে শব্দ গেল, মালতী আবার চক্ষু মেলিয়া দেখিতে লাগিলেন।

জগদীশ বাবু বাড়ীতে পৌছিয়াই শুনিয়াছিলেন, 'মালতী আজও জীবিত আছে। ইহা শুনিয়াই তিনি কাঞ্চনপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। কাঞ্চনপুর জগদীশ বাবুর বাড়ী হইতে এক প্রহর পথের ব্যবধান।'

জগদীশ বাবু আসিযা মালতীর মৃত্যু-শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। মালতীর জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কথা বলিতে পারিলেন না; একদৃষ্টে মালতীর মলিন মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মালতী দেবীও প্রেম-দৃষ্টিতে জগদীশ বাবুকে দেখিলেন। দেখিয়া দেখিয়া নীরবে নয়ন মুদিত করিলেন। এ দৃশ্য জগদীশ বাবুর প্রাণে বিঁধিল, তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রেম উৎস উথলিয়া উঠিল, চক্ষু হইতে মৃদু মৃদু, ক্রমে ক্রমে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল, মালতীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—'মালতি! মালতি! জীবনের সুখের বাসনা কি এই স্থানেই শেষ হইল?' একে একে সকল কথা জগদীশ বাবুর মনে পড়িল, আর কথা বলিতে পারিলেন না।

মালতীর চক্ষু বুজিল, বারম্বার মুখ ব্যাদান করিতে লাগিলেন। নিকটস্থ স্ত্রীলোকটী মুখে জল ঢালিয়া দিল, জল উদরস্থ হইল না, গণ্ডস্থল ভাসাইয়া পড়িয়া গেল। এই সময়ে কথা বলিবার শক্তি থাকিলে মালতী দেবী কথা বলিতেন,কিন্তু কথা ফুটিল না; শুষ্ক কণ্ঠনালী দ্বারা কেবল দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল।

এই প্রকারে কদণ্ড অতীত হইলে,মালতীদেবী আবার একটু চাহিলেন।

জগদীশ বাবু বলিলেন, 'মালতি! আমি আসিয়াছি!'

মালতী দেবী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন, উত্তর করিলেন না। জগদীশ বাবু পুনরায় বলিলেন—'মালতি! এখন কেমন বোধ হইতেছে? আমি আসিয়াছি।'

এবার মালতী দেবীর মুখ খুলিল, বিরক্তি সহকারে বলিলেন—'আসি-

যাচ্ছ? কিন্তু যখন আসিলে আমি বাঁচিতাম, তখন আসিলে না! এখন তোমাকে দেখে আমার আরো কষ্ট হইতেছে।

জগদীশ বাবুর চক্ষু হইতে জল পড়িল,বলিলেন, 'মালতী! তুমি চলিলে?

মালতী দেবী আবার বলিলেন, এতদিন পরে আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলাম!

জগদীশ বাবুর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল, হৃদয়-গ্রন্থি সহসা যেন ছিন্ন হইল, বলিলেন--'মালতি। আমি কি তবে তোমার শত্রু ছিলাম?

মালতী দেবী এবার বলিলেন, না—তুমি আমার শত্রু ছিলে না; পূর্ব্বে তোমাকে দেখিলে এ হৃদয় শীতল হইত। তুমি চিরকালই আমার হিতৈষী। আমি এখন মরিতে বসিয়াছি, আমাব ইহাই সুখ; তুমিও আমার সুখে সন্তুষ্ট হও, এই প্রার্থনা। যদি সন্তুষ্ট না হও, তবে নিশ্চয় তুমি আমার শত্রু, আমি তোমার উন্নতির পথের কণ্টক ছিলাম। আমার এই আনন্দের সময় যদি তুমি দুঃখিত হও, তবে তোমাকে শত্রু বলিব না কি বলিব?

জগদীশ বাবু অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন—'মালতি! আমাকে কি অপরাধে ছাড়িয়া চলিলে?

মালতী দেবী শেষবার অতি কষ্টে বলিলেন—তোমার আর কি অপরাধ? আমার অপরাধেরই ফলভোগ কবিতেছি। তোমার কি অপরাধ? মরিবার সময় কাহারও অপরাধ বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না,—আমি জানি না, কোন অপরাধে আমার এত কষ্ট হইতেছে! মবিতে বসিযাছি, সে জন্য কষ্ট নাই, সংসার ছাড়িয়া চলিয়াছি, সেইজন্য একটু ও কষ্ট বোধ হইতেছে না, জীবনের অবশিষ্ট বাসনাও তোমাকে দেখিয়া পূর্ণ হইল; কিন্তু তবুও কষ্ট নিবারণ হয় না। নাথ! তোমার চরণে যদি আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে আমাকে ক্ষমা কর, আমার আর কষ্ট সহ্য হয় না।

জগদীশ বাবু ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিলেন—'মালতি, কি প্রকার কষ্ট?'

কি প্রকার কষ্ট, তা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? মরিবার পূর্ব্বের কষ্ট কি প্রকার, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। যদি কেহ মরিয়া আবার বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও, 'কি প্রকার কষ্ট? এই বলিয়াই মালতী দেবী জগদীশ বাবুর কর ধরিয়া বলিলেন—নাথ! আমি চলিলাম--আমার অপরাধ ক্ষমা করিও।

জগদীশ বাবুর শরীর রোমাঞ্চিত হইল, প্রেমাশ্রু নিমেষ মধ্যে শত শত-বার পড়িল, বারম্বার ডাকিলেন—'মালতি ! মালতি !

মালতী দেবী আর কথা কহিলেন না, জীবন-দীপ এই খানেই নির্ব্বাপিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

কণ্টকিত পথে।

বিন্ধ্যবাসিনীর পবিত্র স্বভাব-চিত্রে পাপ-রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, এবিষয়ে যখন শরৎচন্দ্রের আর সন্দেহ রহিল না, তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে অসহায়া বিন্দুকে সেই কাননে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে, তিনি আপন গম্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিনের ঘটনা সকল মন হইতে অপসৃত হয় নাই ; ইন্দ্রিয়ের দাস মানব—মন সুস্থ হইবার নহে, সুতরাং শরৎচন্দ্র গম্যপথে অগ্রসর হইবার সময় মনে মনে ভাবিতেছিলেন—"সংসারে ভালবাসা নাই, আমি বিন্ধ্যবাসিনীকে এত ভালবাসিতাম, কিন্তু বিন্দু আমাকে চরণে ঠেলিল ! কে বলিবে, এই ভালবাসা কি প্রকার ? আমি বিন্দুকে ভাল বাসিতাম, কিন্তু তাহাকে বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম কেন ? ভালবাসার অর্থ কি, বুঝি না ? আমি তাহাকে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, সেও নয় আমাকে চরণে ঠেলিল, তাতে আমার মনে কষ্ট হয় কেন ? বিশুদ্ধ প্রণয় কি ? যে প্রণয়ে মুহূর্ত্তকাল অদর্শন সহ্য হয় না, তাহা কি বিশুদ্ধ প্রণয় ? তাই যদি হয়, তবে প্রণয়ে কি সুখ ? সমস্ত জীবন কেবল প্রণয় লইয়া থাকিব ? আর কোন কর্ত্তব্য নাই, জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই ? ভালবাসিতে হয়, সমস্ত জগৎকে ভালবাসিব, প্রণয় প্রার্থনীয় হয়, সমস্ত জগৎকে প্রণয়ে বাঁধিব। একদিনও সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ভাব হৃদয়ে রাখিব না। কিন্তু আবার মন অস্থির হয় কেন ? যে সঙ্কীর্ণ প্রণয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ পাই নাই, তাহারই অনুরোধে বিন্দুকে দেখিতে এত অভিলাষ হইল কেন ? বিন্দু আমাকে কি সুখ দিয়াছে ? যে সুখ আমি অধ্যয়নে পাইতাম, যে সুখ আমি দেশের কথা কল্পনায় ভাবিয়া যাইতাম, সে সুখের সহিত কি বিন্দুর প্রণয়-সুখের তুলনা হয় ? তবে কেন ভুলিলাম ? যুদ্ধের

পূর্ব্ব রজনীতে, কেন অসার প্রণয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে, বিন্ধ্যবাসিনীর কথা স্মৃতিতে পড়িল ? রমণীর কি মনোমোহিনী শক্তি ! মনকে এতকাল দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াও, কৃতকার্য্য হইলাম না ? এতকাল হইলাম না, তবে আর কবে হইব ? অসার প্রণয়ের সুখ কল্পনা করি কেন ? অথবা আমার মত সংসারের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই প্রণয়ের জন্য সকলেই ত লালায়িত। বোধ হয়, তাহারা এই দর্শনসাপেক্ষ প্রণয়েরমধুরতা বুঝিতে পারিয়াছে। আর আমি ? আমি একদিন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই প্রণয়-সুখ পাই নাই, একদিনও বিন্দুকে দেখিয়া সুখী হই নাই ! তবে মন ভুলে কেন ? স্ত্রীজাতিতে কি সুখ, তাহা একদিনও বুঝিতে পারি নাই ! তবে বুঝিয়াছি, মনের সৎ প্রবৃত্তি বিনাশ করিবার স্ত্রীই একমাত্র সহায়, জীবনের সুখ-সেতু ভাঙ্গিবার স্ত্রীর প্রণয়ই একমাত্র শাণিত অস্ত্র, পবিত্র সরল মনে চিন্তার মেঘ উঠাইবার প্রতিকূল বায়ু, ধর্ম্মজাহাজ ডুবাইবার একমাত্র ভীষণ তরঙ্গ। এই সুখশূন্য তরঙ্গে বঙ্গদেশ ডুবিয়াছে, আর আমি শরৎচন্দ্র, সুখ না পাইয়াও ডুবিতে বসিয়াছি।"

আবার ভাবিতে লাগিলেন,—"স্ত্রীর প্রণয়ে সুখ, বড়ই আশ্চর্য্য কথা ! সংসারে যদি নরকভোগ থাকে, তাহাই এই স্ত্রী সহবাস, তাহাতে কি সুখ ? কে বলিবে, কি সুখ ? আমি এত দিন সংসারে ভ্রমণ করিয়া একদিনও স্ত্রীসহবাসে সুখ পাই নাই। সুখ পাই নাই, কিন্তু বিড়ম্বনা যথেষ্ট ভোগ করিয়াছি ! আমার মনে বিলাসের ইচ্ছা কেন হইত ? ভাল কাপড় পরিব, ভাল বেশে থাকিব, এ ইচ্ছা হইত কেন ? আমাকে দেখিয়া সুখী হইব বলিয়া ? কই সে ইচ্ছা ত ছিল না। যে মুখের সৌন্দর্য্য আপনি দেখিতে পাইনা, সে মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবাব জন্য দর্পণ ধরিয়া কেন সাজাইতাম ? কেন কৃত্রিম শোভায় ভূষিত হইতাম ? কেন সৌন্দর্য্যের ফাঁদ পাতিতাম ? এখন বুঝিতে পারিয়াছি, কেবল স্ত্রীর মন বাঁধিবার জন্য। স্ত্রীর মন ধরিবার জন্য আমি বিলাসের দাস হইয়াছিলাম ! অবশেষে মনে ভাবিতাম, রৌদ্রে বাহির হইলে বর্ণ ম্লান হইয়া যাইবে। তজ্জন্য আর রৌদ্রে বাহির হইতাম না ; ক্রমে ক্রমে আমার রৌদ্রের উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিল ! প্রথমে সরু কাপড় পরিতাম, বিন্দুর মনতুষ্টার্থ ; কিয়দ্দিবস পরে তাহাই আমার শিক্ষা হইল, অবশেষে আমি মোটা বস্ত্রের ভার সহিতে পারিতাম না। এই প্রকারে এক প্রণয়ের সেবায় আমি বিলাসের দাস হইয়া পড়িলাম। যখন আমি পরীক্ষায় ফেল

হইলাম, তখন আমার মনে জাগিল,—ভবিষ্যতে আমার বিলাসের এ সকল বস্তু কে যোগাইবে? এই ভাবিয়া, দেশ ছাড়িয়া, মনের বাসনা পূর্ণ করিতে আসিলাম;—তখন ভাবিয়াছিলাম,এই দেহ,এই শরীর,দেশের জন্য বিসর্জ্জন করিব। ইহাপেক্ষা মানব জীবনে আর কি সুখ আছে? তবে কেন আবার ভুলিলাম? কেন আবার সেই প্রণয়ের কথা মনে পড়িল? দুর্ব্বল মন কেন এখনও সবল হইল না? কেন বিলাসপ্রিয়তাকে আজও উচ্ছেদ করিতে পারিলাম না?"

"এ সংসারে বিন্দু আমার কে? আমার সুখের কণ্টক,—দুঃখের সোপান! আমি কেন এই দুঃখের সোপানে উঠিলাম? কেন আমার জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য ভুলিয়া এই সময়ে বিন্দুর অনুসরণ করিলাম? আমি বাঙ্গালী, তাই বুঝি আমার মন এত অসার? বিন্দুর জন্য আমার মন অস্থির হয় কেন? এ সংসারে আমার সকলি, অথচ কেহই আমার নহে। আমার যাহা, তাহা ত আছেই, তবে আবার মন অস্থির হয় কেন? আমি যাহাকে আপন ভাবি, সে আমাকে আপন না ভাবিলে, মন দুঃখে অবসন্ন হয় কেন? আমার মন দুর্ব্বল, তাই এ সকল বিষয় এত দিন ভাবি নাই,— কিন্তু এখন দেখিতেছি, বুঝিতেছি, বিন্দুর জন্য আমি অস্থির হইব কেন? যদি তাহাকে আপন ভাবিয়া থাকি, তবে চিরকাল ভাবিব। সে আমাকে আপন না ভাবিলেও মনকে অস্থির হইতে দিবনা। সে আমাকে তাহার মন দিল না বলিয়া, আমি দুঃখিত বা নৈরাশ হইব কেন? বিন্দু আমার কে? না—ভালবাসার বস্তু,—প্রেম শিক্ষার মূল মন্ত্র। ভালবাসা স্বর্গের জিনিস। বিন্দুকে যদি আমি ভালবাসিয়া থাকি,—সে ভালবাসা ত আছেই,তবে এখন মন অস্থির হয় কেন? বিন্দুর চরিত্রে কলঙ্ক রেখা উঠিয়াছে? যদি তাই হয়, তাতেই বা আমার ভালবাসা যাইবে কেন? বিন্দুর মন আমার হউক বা না হউক, তাতে আমার কি? তাহাকে যদি ভালবাসিয়া থাকি তবে কেন আজও বাসিব না? মন! বলত, কেন চঞ্চল হও! বিন্দুর মন অন্যের, আমার স্বার্থের কণ্টক, তাতে তোমার ভালবাসিতে বাধা কি? দোষ দেখিলে যে ভালবাসাটিকে না,তাহা আমি চাই না? দোষ-শূন্য গুণাধার মানুষ কোথায়?"

"এতদিন ভাবিতাম, আমার ভালবাসা নিঃস্বার্থের। কত বন্ধুর সহিত এই বিষয় লইয়া তর্ক করিতাম। আমার ভালবাসা স্বার্থযুক্ত, তাহা কেহই প্রমাণ করিতে পারিত না। এখন আমি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছি,

আমার ভালবাসা নিঃস্বার্থের ছিল না। আমি আজও নিঃস্বার্থ ভালবাসার মর্ম্ম বুঝি নাই; না হইলে 'বিন্দু অন্যকে মন দিয়াছে,' তাতে আমার কষ্ট হইতেছে কেন? আমি স্বার্থের আশা ছাড়িয়া যদি কাহাকেও আজ পর্য্যন্ত ভালবাসিতে না শিখিলাম, তবে আর আমার সাধনা কি? বিন্দুর মন এক্ষণ আমার নহে, এ কথায় আমার কষ্ট হয় কেন? আমি কেন বিন্দুকে ফেলিয়া আসিলাম? আমার হৃদয়ে কেন ক্রোধ হইল? চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, আমার ন্যায় নরাধম আর নাই।"

"মন দুর্ব্বল, এ সকল কথা ভাবিলেও মন প্রবোধ মানে না। নিঃস্বার্থ ভালবাসা জগতে নাই; রিপুর আধিপত্যে মানুস যখন মাতিয়া উঠে, তখনই মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় এই ক্ষণস্থায়ী অসার প্রেমজলে তৃষ্ণা নিবারণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে চেষ্টা কখনই পূর্ণ হয় না, সে তৃষ্ণা কখনই মিটে না। কিন্তু তবুও সতর্ক হইয়া চলা যায় না। কে না জানে, মৃগতৃষ্ণিকায় পতিত হওয়া বড়ই দুঃখকর? কিন্তু সকলই মনের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত, এই ভ্রমে পতিত হয়। আমিও যাহা মনে ভাবি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি কই? এখন বোধ হইতেছে, যদি আমার জীবনের প্রথম দিন পাইতাম, তাহা হইলে, এখন হইতে সতর্ক থাকিতাম। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতাম কি না, কে জানে? যাউক, সে সকল আর ভাবিব না। সমস্ত সংসারকে প্রেমে আবদ্ধ করিব, তা দূরে থাকুক, একজনকেও নিঃস্বার্থ রূপে ভালবাসিতে পারিব না? আমার ভালবাসা নিঃস্বার্থের হইল না কেন? বিন্দুর চরিত্রে দোষ আছে থাক্, আমি তাহাকে চিরকাল একই ভাবে ভালবাসিব। নিঃস্বার্থরূপে ভালবাসিতে শিক্ষা করিলে মন কখনই অল্পে প্রলয় গণিত না। বিন্দুকে যদি আমি নিঃস্বার্থ ভাবে ভাল বাসিতাম, তাহা হইলে, অদর্শনে আমার কষ্ট হইত না। ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ-সাধনের উপায় যে ভালবাসার রজ্জুতে আবদ্ধ, সেই ভালবাসাই দণ্ডে দণ্ডে প্রলয় দেখে, অল্পেতেই প্রণয় বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় মজে। হায়, কতদিনে আমি নিঃস্বার্থ প্রেমের দাস হইতে পারিব?"

"মনুষ্য চরিত্র বিচিত্র, কেন যে মত্ত হইয়া চিরকালের সুখ-পথে কণ্টক রোপণ করিতে যত্ন করিতেছি, তাহা কিছুই বুঝিনা। কেন আমি ভুলিলাম, —যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে কেন আমার মনে বিন্দুর রূপ প্রতিবিম্বিত হইল? কেন আমি সকল কথা ভুলিয়া সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইবার জন্য

ফাঁদ পাতিলাম? আমার শরীর মন অস্থির হয় কেন? সংসার-সুখকে কেন এত আদর করি,—অথবা আমি নিঃস্বার্থ ভালবাসার মর্ম্ম কেন আজও বুঝিলাম না?"

"সংসারের ভালবাসা নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ; যাই সমস্ত স্বার্থের পথে কণ্টক পড়ে, অমনিই সেই ভালবাসা যাইয়া অন্যে বর্ত্তে। ভালবাসার সহিত স্বার্থের সংশ্লিষ্ট মিলন। আমি কেন এই নিয়ম ছাড়া হইতে পারিলাম না? কেন স্বার্থের পথে কণ্টক পড়িয়াছে বলিয়া ক্রোধে অস্থির হইতেছি? অথবা মন কেনই বা এত নিস্তেজ যে, প্রণয় ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ইচ্ছা হয় না?"

"বিন্দুকে যদি কখনও ভালবাসিয়া থাকি, তবে চিরকাল বাসিব। দূর হউক,—যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বের কথা মনে হইলে শরীর বিকম্পিত হয়; কেন নারীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইলাম? জানিলাম না ত কেন আবদ্ধ হইলাম? কেন ইচ্ছা করিয়া জীবনকে অন্যের করে সমর্পণ করিলাম? ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ মনুষ্যত্বে!"

"আমি কি জন্য সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? আমার জীবনের কর্ত্তব্যকার্য্য কি করিলাম? শরীর সিহরিয়া উঠে,—আমার জীবনের অভিনয় শেষ হইয়া আসিল, আর কদিন বাঁচিব, বাঁচিয়া আর কাজ কি? যাঁহার জীবন কেবল ইন্দ্রিয় সেবার জন্য,—পশুত্ব প্রচার ভিন্ন যাহার আর কোন কার্য্য নাই, তাঁহার বাঁচিয়া কাজ কি? যাহার দ্বারা সংসারের কোন প্রকার উপকার হইল না, তাহার জন্মগ্রহণ বৃথা। আমি বাঁচিতেছি কি জন্য? মরিলে আর এ সকল দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না; আর ঘৃণিত স্ত্রীজাতির পদসেবা করিবার জন্য, জীবনের কর্ত্তব্য-কার্যের প্রতি অবহেলা করিয়া, ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করিতে হইত না! সংসারে আসিয়া কি করিলাম?—জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইলাম না ত কেন বৃথা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? আমার জীবনে ধিক্, জন্মে ধিক্! যাই এইক্ষণ, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? আর পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিব না! যতদিন মনের বাসনা পূর্ণ না হইবে, ততদিন সংসার, আত্মীয়, পরিজন, সকলকে ভুলিয়া সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশে সময়াতিপাত করিব।"।

—এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে শরৎচন্দ্র জীবনের ভাবী কর্ত্তব্য কার্য্য-

ক্ষেত্রের দিকে একাগ্রমনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সম্বল কেবলমাত্র দুই-খানি তরবারি।

দশম পরিচ্ছেদ।

স্বার্থ এবং অসার প্রণয়।

বিন্ধ্যবাসিনী একদিন সত্যভামার নিকটে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে, সত্যভামা এই প্রকার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিল।

'আমার বাড়ী নদিয়ার, আমি একজন দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা। আমার মাতা অতি সামান্য বংশজের মেয়ে। টাকার লোভে আমার পিতা নীচ-বংশীয়া কন্যা বিবাহ করেন। পিতা পূর্ব্বেই দরিদ্র ছিলেন, তারপর আবার ১০টী বিবাহ করেন, তাঁহাদের ভরণপোষণের বড়ই কষ্ট হইত, অবশেষে দারিদ্র্য উপস্থিত হয়। আমার বিমাতা সকল, যাঁহার যেখানে সুবিধা ছিল, সকলেই পিতাকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া পলায়ন করিলেন। আমার মাতুলেরও কিছুই ছিলনা, সুতরাং আমার মাতার আর উপায় ছিলনা, তিনি আমাকে লইয়া পিতার আবাসেই রহিলেন। এক সময়ে তাঁহারা ৭। ৮ দিন পর্য্যন্ত প্রায় অনাহারে ছিলেন, কিন্তু আমার জন্য কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া আমাকে খাওয়াইতেন। এই সময়ে, দরিদ্রতা নিবন্ধন, অনাহারে ও উপবাসে পিতার পীড়া উপস্থিত হয়, এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যু সময়ে আমার বয়স ১২ বৎসর মাত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর মাতা আমাকে লইয়া কলিকাতায় গমন করেন, সেখানে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে সামান্য চাকরাণীর বেশে দিন যাপন করিতেন। আমিও এই সময়ে প্রাণপণ করিয়া মাতার কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিতাম। কিছুদিন পরে মাতাও অসময়ে আমাকে সংসারে রাখিয়া চিরকালের মত পলায়ন করিলেন; আমি নিরুপায় হইয়া একাকিনী সংসারে ঝাঁপ দিলাম। পৃথিবীতে তখন আমার আর আপনার বলিবার কেহই ছিল না; সৌভাগ্য-ক্রমে এই সময়ে এই মহাপুরুষের সহিত একদিন কালীঘাটে আমার সাক্ষাৎ হয়; ইহাঁর নিকটে আমার সমস্ত জীবনের কাহিনী বলিলে, ইনি আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, আমাকে তাঁহার পরিচিত একস্থানে রাখেন। কিন্তু

আমার অদৃষ্টক্রমে আমি সেখানে অনেকদিন থাকিতে পারিলাম না। এই সময়ে আমার ভরাযৌবন, অনেকেই আমার পানে বিষনয়নে তাকাইত। এই কথা মহাপুরুষের নিকট ভাঙ্গিয়া বলিলে, তিনি আমাকে অন্য একস্থানে রাখিয়া (আমি যেস্থানে ছিলাম) স্থানান্তরে গমন করিলেন। যাইবার সময় আমি কাঁদিতে লাগিলাম; তিনি বলিলেন, 'কাঁদিও না, আমি আবার কয়েক বৎসর পর তোমাকে লইয়া যাইব।' এই সময়ে আমার মৃত্যু হইলেও কোন দুঃখ থাকিত না; আজও সেই কষ্ট সহ্য করিতেছি। আমার মাতার মৃত্যুর সময় আমার বয়স ১৫ বৎসর মাত্র ছিল। মাহাপুরুষের গমনের পর আমি এই ৬ বৎসর পর্য্যন্ত সেই স্থানেই ছিলাম, তারপর তিনি আমাকে লইয়া আসিয়াছেন। আমার অদ্যাবধি বিবাহ হয় নাই।'

এই সকল কথা বিন্ধ্যবাসিনী যেদিন শুনিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই দুই জনের মধ্যে হৃদয়ের ঘনিষ্ঠযোগ স্থাপিত হয়। উভয়ের হৃদয়ে উভয়ের হৃদয় একীভূত হয়।

যে সময়ে শরৎচন্দ্রের অনুসরণ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী কানপুরের সেই নির্জন পুরী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সে সময়ে সত্যভামা গৃহান্তরে কার্য্য করিতেছিল; সন্ধ্যা অতীত হইলে বিন্ধ্যবাসিনীকে না দেখিতে পাইয়া বড়ই চিন্তিত হইল। সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও যখন বিন্দুকে দেখিতে পাইল না, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, এই সময়ে স্থানান্তরে অনুসন্ধান করা, স্ত্রীলোকের পক্ষে অসাধ্য, বিশেষত সত্যভামা কখনই রজনীতে গৃহের বাহির হইত না।

বিন্ধ্যবাসিনী সেই কাননে এককিনী মৃত্তিকায় অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন, নিশি অল্পে অল্পে অবসান হইল। প্রকৃতির শোভা পরিবর্ত্তিত হইল। বিন্ধ্যবাসিনীর চতুর্দ্দিকস্থ শূন্য স্থান সমূহ মেঘে আবৃত। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেব মলিনবেশে মেঘের আড়াল হইতে উকি মারিয়া একটু হাসিতে লাগিলেন; একটু একটু বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল। বিন্দুর বসন সেই জলে আদ্র, শরীর মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত, কিন্তু তত্রাচ চেতন হইল না। এদিকে সত্যভামা অতি প্রত্যুষে বিন্দুর অনুসন্ধানার্থ নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রথমে কোথাও দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময়, কি ভাবিয়া যেন, এই কাননে প্রবেশ করিল। কাননের অন্যান্য স্থান অনুসন্ধানের পর, বিন্ধ্যবাসিনী যেখানে পড়িয়াছিলেন, সেই

স্থানে উপস্থিত হইয়া,সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—বিন্দু! তুমি এখানে এভাবে রয়েছ কেন ?

বিন্ধ্যবাসিনীর চৈতন্য ছিল না; সত্যভামা উত্তর পাইল না।

সহসা সত্যভামার মনে কি ভাবের উদয় হইল, সজোরে অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকা টিপিয়া ধরিতে ধরিতেই বিন্ধ্যবাসিনীর চৈতন্য হইল।

সত্যভামা পুন বলিল—'বিন্দু তুমি এখানে কেন ?

বিন্ধ্যবাসিনী লজ্জায় অঙ্গের স্থানভ্রষ্ট বস্ত্র ঠিক করিয়া লইলেন, উত্তর করিলেন না।

সত্যভামা পুনরায় বলিল, আমি তোমাকে ঘরে না দেখে পাগলের ন্যায় হয়েছি, আর তুমি নিশ্চিন্তমনে এখানে রযেছ ? বিন্দু এর কারণ কি ? তুমি এখানে কেন ?

বিন্ধ্যবাসিনী কেবল বলিলেন—'তাঁহিত'! আর কোন কথা বলিলেন না।

সত্যভামা পুন বলিল, বিন্দু, তুমি কি পাগল হয়েছ ?

বিন্ধ্য।—তোকে আর কি বলিব ? আমার হৃদয়ে কালিমা পড়িয়াছে!

সত্যভামা বলিল, সে কি বিন্দু ?

বিন্ধ্যবাসিনী মনের কবাট খুলিযা বলিলেন—'যাঁহাকে আমরা শুশ্রূষা করিয়াছিলাম, তিনিই শরৎচন্দ্র। যখন তিনি আমার নিকট হইতে বিদায় লইলেন, তখন আমার মন একেবারে অস্থির হইল। তাঁহার অনুসরণ করিয়া এই পর্য্যন্ত আসিলাম। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা হইল না, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

সত্যভামা।—কেন, তাঁহার দেখা পাও নাই ?

বিন্ধ্য।—দেখা পাইয়াছিলাম, তিনি আমাকে কুলটা বলিয়া এইখানে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

সত্যভামা।—যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল! কেন একটু ধৈর্য্য ধরিলে কি দোষ ছিল ?

বিন্ধ্য।—তুই আমার কাটা ঘায়ে আর লবণের ছিটে দিস্ না। আমি এতদিনে বুঝিলাম, এসংসারে কেহই কাহারও নহে। আমি যাঁর জন্য সংসারের সকল সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া এইখানে আসিলাম, তিনিও আমাকে পরিত্যাগ করিলেন! আমি এতদিনে বুঝিলাম, শরৎ আমাকে

ভালবাসিত না,—ভালবাসিলে আমাকে ফেলিয়া যাইত না। তোকে দুঃখের কথা আর কি বলিব! আমার পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু সকল ছেড়ে যাহাকে পাইবার জন্য আসিলাম, সে আমার দিকে একবারও করুণানয়নে ফিরিয়া চাহিল না। ধিক জীবনে! আর বাঁচিতে অভিলাষ নাই,—আমার দেহ ধারণে আর ফল কি? আমি কাহার জন্য আর এই কষ্টের জীবন বহন করিব? আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব।

সত্যভামা।—দেখ বিন্দু! তুমি বালিকার ন্যায় অল্পেই উথলিয়া উঠ, আবার অল্পেই গলিয়া যাও। তোমার কষ্ট হইতেছে, তাহা মানিলাম। তোমার আর এক দণ্ডও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা নাই, তাহা সত্য! কিন্তু ভেবে দেখত এ সকল কি জন্য? কেন তোমার মন অস্থির হইতেছে? তুমি মরিতেই বা চাও কিজন্য? শরৎচন্দ্র তোমাকে গ্রহণ করিলেন না, তাই ভাবিতেছ, দেহ-ধারণে ফল কি? সংসারে অন্যের সুখে সুখী হইবে বলিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, তাই ভাবিতেছ, মরাই ভাল। তুমি মরিবে,—তাহাতে আর কাহার কি হইবে? একা আসিয়াছ, একা যাইবে, কিন্তু আজ ইচ্ছা করিয়া মরিতে চাও কেন? কি জন্য অন্যকে মন সমর্পণ করিয়াছিলে? কেন সংসারের প্রণয়ের অনুসরণ করিয়াছিলে? বিষ পান করেছিলে ত, যখন শরীর জর্জরিত হইল, তখন কেন সাবধান হইলে না? সংসারে কে কাহার? সংসারের সুখ কতক্ষণের? আজ আছে ত কাল নাই। প্রণয়ই বা কতক্ষণ মনে সুখ দেয়? একদিন, দুদিন—না হয় দশ দিন, তার পর যখন পাখী দেহ-পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিবে, তখন? তখন সে প্রণয় কোথায় থাকিবে? আবার দেখ, জগতে সকলেই স্বার্থপর! স্বার্থপর ভিন্ন জগতে লোক নাই, সকলেই এক একটী অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার মানসে এক একটী ফাঁদ পাতিয়া রাখে, সেই ফাঁদে পড়িলেই মনোরথ পূর্ণ হয়, তারপর? তারপর সকলই ফাঁকি!' এই বলিয়া সত্যভামা আপন দুঃখময় জীবন-কাহিনী বিন্দুকে পুন বলিল। অবিনাশের খাকিদা যে দুঃখ পাইয়াছে, তাহা বলিল। আরো বলিল, শরৎচন্দ্র তোমাকে দেখিলেন না, তাহাতে তোমার কি? তুমি চিরকাল তাহাকে ভালবাসিও! নিঃস্বার্থ রূপে ভালবাসিতে শিক্ষা কর, বুঝিতে পারিবে, তাহাকে না দেখিলেও তোমার মন অস্থির হইবে না? নিঃস্বার্থ ভালবাসা স্বর্গের জিনিষ।

বিন্ধ্যবাসিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুই যা যা বলিলি, তা

সকলই বুঝিয়াছি, এখন সাধক আসিলে যাহা হয়, হইবে। এই বলিয়া সত্যভামা এবং বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহাদিগের কুটীরে গমন করিলেন।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বড় লোক।

রজনী ঘোষের বিষয় সম্পত্তি অনেক, সুতরাং রজনী ঘোষ বড় লোকের মধ্যে গণ্য। বড় লোকের বিপদ প্রায় বসিয়া থাকে না—টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া হাইকোর্টের বিচারে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন।

বড় লোকের স্বভাব বুঝা বড় দায়। লোক সামান্য অবস্থা হইতে যখন উন্নত হয়, তখন আর পূর্ব্ব-স্বভাব থাকে না; ইহার কারণ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু এই পর্য্যন্ত জানি, বড় লোকের স্বভাব, সামান্য অবস্থাপন্ন লোকের ন্যায় হইলে, সংসারের অসম্পূর্ণতা ঘুচিয়া যাইত—কিছুরই অভাব থাকিত না।

রজনী ঘোষের পূর্ব্ব অবস্থার কথা আর স্মরণ নাই—বাল্যকালে কত কথাই মনে হইত—ভাবিতেন, আমি বড় হইলে, আমার ক্ষমতা হইলে, আমি কত কর্ত্তব্য পালন করিব—'এই যে গরিব দুঃখী রাস্তায় বসিয়া সমস্ত দিন কাঁদিতেছে—ইঁহাদিগের চক্ষের জল মুছাইয়া দিব—ঐ যে দেশের বালক সকল স্কুলের অভাবে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারিতেছে না, উহাদের জন্য স্কুল স্থাপন করিব—ঐখানে দেশের সাধারণ লোকের উপকারের জন্য একটী পুকুর কাটাইব—এই স্থানে একটী ধর্ম্মমন্দির স্থাপন করিব। এই প্রকার কত কি মঙ্গলের কথা ভাবিতেন। ভাবিতেন,—আমি বড় লোক হইলে টাকার জন্য লালায়িত হইব না—টাকার জন্য লালায়িত হইয়া মনের উৎকৃষ্ট গুণ সকলকে হৃদয় হইতে দূর করিব না। ভাবিতেন—'অহঙ্কার দ্বেষ হিংসাদি মনের অপকৃষ্ট আবরণ, বড় হইলে কখনই ইহাদিগকে হৃদয়ে স্থান দিব না।

কিন্তু বাল্যকালের সে সকল কল্পনার স্বপ্ন আজ ভাসিয়া গিয়াছে, আজ রজনী ঘোষ বড় লোক। টাকা হইলে সংসারে বড় লোক বলে, তাহা রজনীর যথেষ্ট আছে—বিষয় থাকিলে বড় লোক বলে, তাহাও রজনীর কম নহে।

বিদ্যা, বুদ্ধি, বল,সৌন্দর্য্য,এসকলকে যদি বড় লোকের চিহ্ন মনে কর,তাহাও রজনীর আছে ; যশ—যাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, ইহাকে যদি বড় লোক লোকের আনুষঙ্গিক উপকরণ ভাব—তাহাও রজনীর কম নহে—তবে,রজনী যে বড় লোক, তাহাতে আর সংশয় কি ? রজনী ঘোষের অবস্থা উন্নত হইবার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত বাল্যকালের কথা সকল মনে ছিল—কিন্তু এখন, এই মুক্তিলাভে সে সকল কথা হৃদয়ে ঢাকা পড়িল—সংসারে বড় লোকের সকল প্রকার বাহ্য-চিহ্ন আসিয়া রজনীকে অধিকার করিল। আজ রজনীর পূর্ব্বতন্ অভিন্নহৃদয় বন্ধু আসিল, তাহাকে দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় রজনীর মন আর প্রফুল্ল হইল না, সামান্য আলাপে তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। আজ্ একজন দীন দুঃখী আসিয়া কাতরস্বরে একমুষ্টি ভিক্ষার জন্য প্রার্থনা করিল, রজনীর আর তাহা সহ্য হইল না, প্রহরীকে হুকুম করিলেন,—উহাকে দূর করিয়া দেও। দেশের একটী স্থাপিত স্কুলের জন্য আসিয়া পাঁচ জন ভদ্রসন্তান কিছু সাহায্য চাহিলেন, রজনী বাবু বিরক্তির সহিত উত্তর করিলেন—‘এদেশে স্কুল করিলে কিছুই হইবে না, এবিষয়ে আমার টাকা অযথা ব্যয় করিতে পারি না।’ একজন দরিদ্র প্রজা আসিয়া বাকী খাজনা আদায় করিতে, দশদিন বিলম্ব করিতে অনুরোধ করিল, বাবু তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। সংক্ষেপে রজনীর আর পূর্ব্ব স্বভাব নাই, যে বাল্য-কথা মনে থাকিলে, লোক মহত্ব লাভ করিতে পারে, সে কথা আর স্মরণ নাই। রজনী আজ বড় লোক।

মুক্তি লাভ করিয়াই রজনী বাবু নিজ দেশে গেলেন। কিছুদিন পরে বিন্ধ্যবাসিনীর পিত্রালয়ের খোজ পাইলেন। বিন্ধ্যবাসিনীর পিতাকে ডাকাইয়া তাঁহার কথা সমুদয় বলিলেন, তারপর আবার তাহার নিরুদ্দেশের কথা বলিয়া একটু আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন।

দিন কয়েক পর বিন্ধ্যবাসিনীর সরল স্বভাব, পতি ভক্তি, অপরাজিত সতীত্ব, রজনীর মন হইতে চলিয়া গেল ; বিন্ধ্যবাসিনীর পিতার আগমনে, অবশেষে, তাহার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। একদিন হঠাৎ বলিলেন, মহাশয়,—সে কথায় আর কাজ কি ? আপনি দেখে আবার ও সব কথা মুখে আনেন—যে কন্যা একবার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হয়, সে সতীই হউক, আর অসতীই হউক,তাহার কথা আর মুখে আনিতে নাই।

বিন্ধ্যবাসিনীর পিতা একথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া গেলেন।

এই প্রকার সর্ব্ব বিষয়ে রজনী ঘোষের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া পড়িল। একজন লোক আসিয়া রজনীর প্রসংশা করিল, সে রজনীর কৃপার পাত্র হইল, যে নিন্দা করিল, সে রজনীর চক্ষের বিষ হইল।

লোক মাত্রেরই উন্নতির আশা আছে, বর্ত্তমান অবস্থায় কেহই সুখী নহে, মনুষ্যের তৃষ্ণা কিছুতেই নিবারিত হয় না। যত পাওয়া যায়, ততই পাইবার ইচ্ছা হয়, যত ভোগ করা যায়—ততই ভোগ করিবার ইচ্ছা হয়, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ সময়ে সময়ে গম্য পথের পরিবর্ত্তে অগম্য পথে উপস্থিত হয়; তাহাতে সংসার-সুখ, যশ, মান সকলই লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহা হয়ত জীবনের লক্ষ্য নাও হইতে পারে! আমাদের দেশীয় বড় লোক মাত্রেই লক্ষ্য-শূন্য পথের পথিক।

বড় লোক হইলে পূর্ব্বের কথা মনে থাকে না। থাকিলে বোধ হয় তাদৃশ সুখ হয় না। আমি এত লোকের শাসন করিতেছি, কিন্তু আমি নিজকে শাসন করিতে পারি না—একথা সকল সুখের কণ্টক; নিজে যাহা করিতে না পারি, তাহা অন্যের প্রতি কেন প্রচার করি? এ অতি শক্ত কথা—মনের সকল সুখ হন্তারক। ভাল অবস্থায় এ প্রকার কথা মনে স্থান পাইলে, লোকের সুখ হইত না—তাই বড় লোকের এত পরিবর্ত্তন দেখা যায়; রজনী ঘোষও এখন বড় লোক—জীবনের পরিবর্ত্তন আশ্চর্য্যের নহে।

বড়লোকের জীবন পরিবর্ত্তনশীল, আমরা উপরোক্ত কারণে একথা স্বীকার করি, কিন্তু দয়া প্রভৃতি সদ্গুণ তাঁহাদিগের মনে থাকে না কেন, বুঝিতে পারি না।

বিন্ধ্যবাসিনী এক সময়ে রজনীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন—তাহার জন্য একদিন প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন,—সেই বিন্ধ্যবাসিনীর কথা মনে করা দূরে থাকুক, সেই কথা আদরের হওয়া দূরে থাকুক, সে কিনা আজ অত্যন্ত ঘৃণার পাত্রী হইল;—দয়ার স্থানে কঠোরতার সৃষ্টি হইল। রজনী ঘোষ এইক্ষণ বড় লোক—বিন্ধ্যবাসিনীর সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। তাহার জীবন, উচ্চ জীবন—বড় লোকের জীবনের ন্যায় সংসার-সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। বিন্ধ্যবাসিনী দীন-দরিদ্র—উচ্চ অবস্থাপন্ন রজনী ঘোষের স্মরণের অযোগ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

অসার সংসার।

সংসারিক লোকমণ্ডলীর মতে, মালতী দেবীর মৃত্যুতেই জগদীশ বাবুর সকল সুখের শেষ হইল—দুঃখপট অভিনয়ের সুখ-পটের স্থান অধিকার করিল। লোকের চোক আছে, ভালবাসার বস্তু দেখিতে; কাণ আছে ভালবাসার স্বর শুনিতে; নাসিকা আছে, প্রিয় বস্তুর ঘ্রাণ লইতে; মুখ আছে, সুখখাদ্য বস্তুর আস্বাদন লইতে—আর হৃদয় এবং মন, সেই ভালবাসাকে এবং ভালবাসার পাত্রকে ধারণ করিতে। জগদীশ বাবুর চোক, কাণ, মুখ, হৃদয় এবং মন, এসকলই ছিল—সুতরাং ভালবাসাও ছিল, কিন্তু ভাল-বাসিত জন চিরকালের মত, ইন্দ্রিয় সকলকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিল। মালতী দেবী জগদীশ বাবুর ভালবাসার বস্তু—সেই মালতীর অদর্শনে চোক জল ঝরাইল, নাসিকা সঙ্কীর্ণ হইল;—কর্ণ উন্নত হইল—আর হৃদয়,—ভাল-বাসার পিঞ্জরকে খালি দেখিয়া অস্থির হইল। জগদীশ বাবু মালতীর শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। একদিন, দুদিন, তিনদিন গেল, তত্রাচ মন সুস্থির হইল না।

ঈশ্বরের রাজ্যে কেহই পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত, সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহেন; তাই প্রেমের সৃষ্টি; ভালবাসা, সময় ভেদে, সেই প্রেমের রূপান্তর মাত্র। এই ভালবাসা, এক এক সময়ে, এক একটী বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহা সংসারের স্বার্থ-ময় ভালবাসা নামে খ্যাত। এই ভালবাসার বস্তুর অবর্ত্তমানে লোকের মন দুঃখে অবসন্ন হয়। জগদীশ বাবুর ভালবাসাও স্বার্থপূর্ণ ছিল—মালতী দেবীর অদর্শনে তাঁহার মন দুঃখ-সাগরে ঝাঁপ দিল। সংসারের সুখ, একেবারে—যেন চিরকালের মত বিদায় লইল। জগদীশ বাবুর মালতী দেবী যে সকল গুণে ভূষিত ছিলেন, তাঁহার বিশ্বাস, যে সকল গুণ প্রায় মনুষ্যের জীবনে ঘটে না; তাঁহার নিকটে, মালতী অলৌকিক-গুণসম্পন্না স্বর্গ-প্রসূত কোন দেবকন্যার ন্যায়;—এই জন্যই দেহ, মন, সকলই তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই মালতী যখন জগদীশ বাবুর আশায় কাঁটা পুতিল, তখন জগদীশ বাবু একেবারে পাগলের ন্যায় হইলেন।

মালতী দেবীর মৃত্যুর তিন দিন পরে, জগদীশ বাবু, মালতীর পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া বাটীতে আসিলেন। বাটীতে আসিয়াও তাঁহার মন সুস্থির হইল না; তাঁহার বাটীর চতুর্দ্দিকের আনন্দ-ধ্বনি তাঁহার নিকটে কর্কশ বোধ হইত; প্রকৃতির শোভা, দুঃখের চিত্র,—শোকের জলন্তছবি বলিয়া বোধ হইত। সংসারে থাকা না থাকা, তাঁহার নিকট উভয়ই সমান বোধ হইতে লাগিল। জগদীশ বাবু ভাবিলেন, 'স্ত্রী-শূন্য হইলেই গৃহ-শূন্য হয়—যাহার গৃহ-শূন্য, তাহার সংসার শূন্য;—যাহার গৃহে সুখ নাই—তাহার সমস্ত সংসারে সুখের বস্তু দুর্ঘট। সংসারে থাকিয়া আর কি করিব,—ভাই, বন্ধু—আত্মীয় স্বজন, যাহাই বল না কেন—কিছুতেই মন সন্তুষ্ট হয় না। তবে আমি কি করিব—জগদীশ বাবু মনে মনে ভাবিলেন, তবে বৃথা এই সুখ-শূন্য সংসারে, জড়পিণ্ডবৎ, দুঃখের সেবা করিবার জন্য থাকিয়া ফল কি? এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে, জগদীশ বাবু উন্মত্তের ন্যায় হইলেন, চক্ষের জলে সর্ব্বদাই বক্ষ ভাসিয়া যাইত। রাত্রে গাঢ় নিদ্রা আসিত না, দিবসে কিছুতেই শান্তি পাইতেন না। ভাবিতেন, আর মধ্যে মধ্যে মালতী মালতী বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন।

জগদীশ বাবুর জীবনের এই প্রকার অবস্থার সময়, হঠাৎ এক দিন, একটী স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকটীর পূর্ব্ব বেশভূষার কিছুই পরিবর্ত্তন ছিল না, সুতরাং জগদীশ বাবু তাহাকে চিনিতে পারিলেন। বলিলেন,—'দিনি—তুই আসিলি,—মালতীকে কোথায় রাখিয়া আসিলি?

জগদীশ বাবুর বিশ্বাস ছিল, দিনীর মৃত্যু হইয়াছে; এইক্ষণ দিনীকে ফিরিতে দেখিয়া, তাঁহার মনে সহসা কি ভাবের উদয় হইল, মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল, আশা আসিয়া শূন্য-মনকে পুন অধিকার করিল, আশ্চর্য্যের সহিত মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল,—তুই আসিলি—মালতীকে কোথায় রাখিয়া আসিলি?

দিনীর চক্ষের জল পড়িল, কথা সরিল না।

জগদীশ বাবুর এসময়ে জ্ঞান ছিল না—বলিলেন, কাঁদিস্ কেন? মালতী কোথায়? তুই আসিলি, মালতীকে কোথায় রাখিয়া আসিলি?

দিনী এবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'আমি—কি জানিব?—আমার সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ ছিল না—আজ্ গ্রামের চতুর্দ্দিকে

তাঁহার মৃত্যুর কথা শুনিলাম—তাই আপনার নিকটে আসিলাম। বলুন, সত্যিই কি আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে?

জগদীশ বাবু আপন ভাবে বিভোর ছিলেন, কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন,—'তুই এতদিন মরিয়াছিলি—আবার বাঁচিলি কেমন করে?

দিনী।—সেকি? আমার মৃত্যু হলে কি আবার পুনরায় বাঁচিবার শক্তি থাকিত? মরিলেই বাঁচিতাম। আমার মরাই বাঁচা, মরিলে আর ফিরিতাম না।

জগদীশ।—বলিস্ কি? মালতী কেমন আছে?

দিনীর নয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল, কথা বলিতে পারিল না। দিনীর উত্তর না পাইয়া সহসা জগদীশ বাবুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল, এবং ভাবিতে লাগিলেন—'সংসার-জাল এমনই কঠিন যে, একবার মাথা ডুবাইলে আর রক্ষা নাই। এ ফাঁদে কেন ইচ্ছা করিয়া জড়িত হইলাম? জড়িত হইলাম ত কেন আপনাকে বশে রাখিতে পারিলাম না? বশে রাখিতে পারিলাম না ত প্রাণ এ দেহ ছাড়িল না কেন? কেন জীবিত রহিলাম? সংসার মায়াময়—এ মায়ার ফাঁদ অকাট্য—আজ্ পর্য্যন্ত কেহই এফাঁদে একবার পড়িয়া, মুক্ত হইতে পারে নাই! পারে নাই, তাতে আমার কি? আমি পারিলাম না কেন? সংসারের সুখ, সংসারের প্রলোভন!—কেন এই ক্ষণস্থায়ী সুখ-প্রলোভনে ভুলিয়া সংসার ফাঁদে পড়িলাম? আমার প্রাণ যায়, আর বাঁচিতে ইচ্ছা করে না—এ প্রাণে আর সাধ নাই—এ শরীরে আর কাজ নাই। মনুষ্যের মন দুর্ব্বল, চঞ্চল। এসংসার বহ্নিময়—এ বহ্নিতে দিন রাত্রি কত শত পতঙ্গ পড়িয়া পুড়িয়া মরিতেছে; কিন্তু তত্রাচ অন্যের জ্ঞান হইতেছে না, অন্যের বাসনার আগুন নিবিতেছে না। শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করা পতঙ্গের চিররোগ, দৃষ্টান্তে এ রোগের প্রতিকার হয় না, যতক্ষণ এই প্রলোভন-বহ্নিতে শরীর না ডোবে, ততক্ষণ আর মন প্রবোধ মানে না! সংসার-বহ্নিতে একবার শরীর বিসর্জ্জিত হইলে, আর সেই বহ্নি হইতে উদ্ধার পাইবার আশা থাকে না।'

এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে দিন চলিল। কিন্তু মালতীর কথা কোন মতেই মন হইতে গেল না। সময়ে সময়ে এত দুর্ব্বিসহ মনোকষ্ট উপস্থিত হইত যে, আত্মহত্যা করিয়াও সকল কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা হইত।

জগদীশ বাবু প্রায়ই নির্জ্জনে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেন। লোক

সমাগমে এক দণ্ডও থাকিতে ভাল বাসিতেন না। লোকের সহিত কথা বলিয়া জগদীশ বাবু এক মুহূর্ত্তও সুখ পাইতেন না। আহারাদি একে একে সকলি প্রায় পরিত্যাগ করিলেন। এই ভাবে কষ্টের জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সংসারের এমনি কঠোর বন্ধন যে, জগদীশ বাবু সকল বুঝিয়াও ইহার হাত এড়াইতে পারিলেন না। মালতীর শোক-সিন্ধুতে জগদীশ বাবুর দুঃখময় জীবন বিসর্জ্জিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কানপুরের পর্ণ কুটীর।

সাধকের ঠিক কথানুসারে, পনের দিনের দিন আসিয়া তিনি বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখা দিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিলেন। সাহেবদিগের অত্যাচার, ভাগ্যক্রমে সেই দিনে যুবকের দ্বারা সাহেবদিগের অসাময়িক মৃত্যু, সৈনিক পুরুষের আঘাত, তাঁহার শুশ্রূষা, আরোগ্য, কঠোর ব্যবহার, এই সমস্ত কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সাধক ভাল মন্দ না বুঝিয়া, সত্যভামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বিন্দুর ক্রন্দনের কারণ কি?'

সত্যভামা বলিল, সেই সৈনিক পুরুষই 'শরৎচন্দ্র।' সাধক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, 'তিনি এখন কোথায় আছেন?

সত্যভামা।—তিনি কোথায় আছেন, তা জানি না; সেই দিনের পর আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ নাই।

সাধক বিন্ধ্যবাসিনীকে বলিলেন, মা! সে জন্য চিন্তা কি? আমার সহিত শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইলে, তোমাকে তিনি অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।

বিন্ধ্যবাসিনী পূর্ব্বেই সত্যভামার উপদেশে একটু সুস্থ হইয়াছিলেন, সাধকের উপদেশে এবং আশ্বাসে, আরো আশ্বাসিত হইলেন। কয়েক দিন সাধকের সহিত থাকিতে থাকিতে বিন্দুর মন অনেক পরিবর্ত্তিত হইল।

কিয়দ্দিবস পরে বিন্ধ্যবাসিনী সাধককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'পিত! আপনি যখন আমাদিগকে এই খানে রাখিয়া গেলেন, তখন আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাই নাই; তখন বলিয়াছিলেন, ফিরিয়া

আসিলে, আমার কথার উত্তর দিবেন ; আপনার সেই প্রতিজ্ঞা অদ্য পালন করুন্। আপনি এই পনের দিন কোথায়, কি প্রকার অবস্থায় ছিলেন ?

সাধক বলিলেন, আমি তখন তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করি নাই, বলিয়াছিলাম—'বলিবার হইলে আসিয়া বলিব।' তোমার নিকট সকলই বলিতে পারি, কিন্তু অগ্রে কয়েকটী কথা না শুনিলে বলিতে পারিব না। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার যথার্থ উত্তর দিবে, বল, তারপর আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।

বিন্ধ্যবাসিনী।—আমার ক্ষমতা থাকিলে, নিশ্চয় বলিব।

সাধক।—তুমি জীবনে কি সুখ পাইয়াছ ? যাহাকে দেখিবার জন্য তুমি উন্মত্ত হইয়াছিলে, তাহাকে দেখিয়া তোমার মনের সাধ মিটিয়াছে কি ? তুমি আবারও কি শরৎচন্দ্রের অনুসরণ করিবে ?

বিন্ধ্যবাসিনী।—শরৎচন্দ্রের সহিত আর একবার দেখা করাইতে চেষ্টা করিবেন, এই কথা যদি বলেন, তবেই পরিষ্কার উত্তর দিতে পারি।

সাধক।—প্রাণপণে সে চেষ্টা করিব।

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, তবে উত্তর শুনুন—

১ম। জীবনে একদিনের তরেও সুখ পাই নাই।

২য়। সাধ মিটিয়াছে, কিন্তু আর একবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা।

৩য়। আমার জন্য যে জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না, সে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলাম ; আর তাঁহার পথে কণ্টক পুতিব না।

সাধক বলিলেন, তবে আমার উত্তর শুন। আমি এই পনের দিন তোমাদের নিকটেই ছিলাম। তোমার মন পরীক্ষা করিবার জন্য অন্তরালে থাকিতাম। তোমরা এই কয়েকদিন যাহা যাহা করিয়াছ, তা আমি সকলি জানি। তোমাকে ঔষধ দ্বারা একদিন স্বপ্ন দেখাইয়াছিলাম, মনে পড়ে কি ?

বিন্ধ্যবাসিনী।—আপনি সকলি জানিতেন, তবে যে দিবস সাহেবেরা আমাকে লইয়া গেল, সে সময়ে আপনি আসিয়া রক্ষা করিলেন না কেন ?

সাধক। সেইটীই আমার পরীক্ষা। তোমার মনের বল পরীক্ষা করিবার জন্য আমি সেই থানেই ছিলাম। যদি দেখিতাম, বলপূর্ব্বক পামরেরা তোমার সতীত্ব বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি তাহাদিগের হাত হইতে তোমাকে রক্ষা করিতাম। কিন্তু আমার হাত আর কলুষিত হইল না ; শরৎচন্দ্রই তোমাকে রক্ষা করিলেন।

তারপর আমি শরৎচন্দ্রের গায়ে একটী ঔষধ লাগাইয়া তোমার নিকটে তাহাকে আনিয়া রাখিলাম; আমার পরিচ্ছদ দেখিয়া তুমি আমাকে চিনিলে না, আমি তোমাকে বলিলাম—"শুশ্রূষা কর।" তারপর সেই বাগানের মধ্যে তুমি যখন শরৎচন্দ্রের প্রতি আত্মসমর্পণ করিলে, এবং তিনি যখন তোমাকে ফেলিয়া গেলেন, তখন তোমার চৈতন্য ছিল না, তখন তোমাকে আমি শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইয়াছিলাম। তারপর যখন দেখিলাম, আবার শরৎচন্দ্র আসিতেছেন, তখনই সে স্থান হইতে সরিয়া গেলাম, তোমাদের সুখের কণ্টক হইলাম না। তারপর তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিলেন, তুমি অস্থির হইলে, সত্যভামা পরদিন তোমাকে লইয়া আসিল। সত্যভামার উপদেশে তোমার মন একটু সুস্থির হইল দেখিয়া যে, কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, তাহা আর তোমাকে বলিব কি? আমার পরীক্ষার ফল পাইলাম, বুঝিলাম, তোমার ন্যায় সতী আমি আর দেখি নাই। পনের দিনের মধ্যে এত কাণ্ড হইয়া গেল, এখন তোমার মন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তবে চল মা! দেশের দিকে যাই।

বিন্ধ্যবাসিনী মস্তক অবনত করিলেন, বুঝিলেন, সাধক একেবারে তাঁহার সমস্ত আশা ভরসা কাড়িয়া লইতেছেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, পিত! শরতের সহিত আর একবার দেখা করাইয়া দিবেন, বলিয়াছিলেন ত!

সাধক বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে।

প্রতিশ্রুতি অনুসারে একপক্ষ পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্রের অনুসন্ধান করিয়াও সাধক তাঁহার কোন সংবাদ পাইলেন না। সাধকের অধিক চেষ্টা করিতে হয় নাই,এই সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেই অত্যাচারী এবং বিদ্রোহীদিগের অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল। যাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের যে সকল দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। সাধক, দুইজন লোকের নিকট শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে দুইটী কথা শুনিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিল—শরৎচন্দ্র নানা সাহেবের সহিত নেপালে যাত্রা করিয়াছেন; আর একজন বলিয়াছিল—শরৎচন্দ্রের ফাঁসি হইয়াছে। যাহাই হউক, এদুটী সংবাদই ভয়ানক। সহসা এদুইটী কথা বলিলে, বিন্ধ্যবাসিনী অস্থির হইবেন, এই জন্য সাধক এ সকল কথা বিন্দুকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। এক পক্ষ পূর্ণ হইলে বিন্ধ্যবাসিনীকে বলিলেন—মা! শরৎচন্দ্রকে পাওয়া গেল না, আর পাইবার আশাও নাই। এখানে

থাকিলে, আমাদিগকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইবে। অতএব চল, দেশে যাই।

বিন্ধ্যবাসিনী ভয়েই হউক, কিম্বা যে কারণেই হউক, বলিলেন, আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকিলে, চলুন, দেশেই যাই।

সাধকের উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই বিন্ধ্যবাসিনী পুন বলিলেন, যদি আমাকে দেশের লোকে গ্রহণ না করেন, তবে কি হইবে?

সাধক বলিলেন, তাহা হইলে তোমাকে আমার সহিত রাখিব।

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, আরও একটী কথা আছে। রজনী বাবুর নিকট আমি অনেক বিষয়ে ঋণী আছি; তাঁহার ঋণ হইতে মুক্ত হইবার আর উপায় নাই; তাঁহার এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই; তাহাদের পরিবারের পূর্ব্ব-অর্জ্জিত কোন গোল থাকায়; তাঁহার সহিত কেহই কন্যার বিবাহ দেয় না। নীরদা—শরৎচন্দ্রের বিধবা ভগী। শরৎচন্দ্রের বাড়ী ছাড়িবার একমাত্র কারণ নীরদার কষ্ট। আপনি যদি সাহায্য করেন, তবে নীরদার সহিত রজনী বাবুর বিবাহ দিতে চেষ্টা করিব।

সাধক।—গুরুতর কথা। নীরদার কষ্টই শরৎচন্দ্রের বাড়ী ছাড়িবার কারণ, আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না; যে ব্যক্তি সমস্ত ভারতবর্ষকে বিলোড়িত করিতে প্রস্তুত, তাহার সমাজের কি ভয়? যাহা হউক, তোমার কথা বুঝিতে যদি ভুল হইয়া না থাকে, এবং নীরদা ও রজনীর যদি বিবাহে অমত না থাকে, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিব।

বিন্ধ্যবাসিনী।—নীরদা বালিকা, তাহার ইচ্ছা আর অনিচ্ছা কি? রজনী বাবু আমার কথায় অমত করিবেন না। বিশেষত, নীরদার রূপ দেখিলে তিনি অবশ্যই আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন।

সাধক।—নীরদার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। নীরদা বিবাহে সম্মতি দিবে, কি না দিবে, তাহা তুমিও বলিতে পার না, পারিলেও তাহা আমি বিশ্বাস করি না, কারণ মানুষের মন বুঝিবার শক্তি তোমার অল্পই আছে। যাহা হউক, আমি এই পর্য্যন্ত বলি, নীরদার মত হইলে বিবাহ হইবে।

বিন্ধ্যবাসিনী আর কিছুই বলিলেন না।

তারপর দিন সাধক, বিন্ধ্যবাসিনী এবং সত্যভামাকে লইয়া মধুপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিফল-চেষ্টা।

অবিনাশচন্দ্রের বৃদ্ধা জননী আজও জীবিত আছেন। পুত্রের প্রধান কার্য্য—মাতৃসেবা; অবিনাশচন্দ্র মাতৃভক্ত, মাতার অনুরোধ পালন করিবার জন্য, স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্য-কার্য্যে আজ পর্য্যন্তও হাত দিতে পারেন নাই। মাতার অনুরোধে, তিনি চাকুরি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্বরস্বতী চিরদিনই অবিনাশের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, বিদ্যা বলে গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি একটী ভাল চাকুরি পাইয়াছেন। বৎসরের মধ্যে ৭। ৮ বার করিয়া বাড়ীতে আসিতেন; মাতার সেবার জন্য নলিনীকে মধুপুরেই রাখিয়া যাইতেন। নীরদা মধুপুরেই থাকেন; তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে আর কেহই নাই; অনেক দিন হইল, শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যু হইয়াছে।

অল্পকাল মধ্যেই অবিনাশচন্দ্র মধুপুরের মধ্যে একজন মাননীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। অবিনাশচন্দ্রের মতের বিরুদ্ধে কথা বলে, এমন লোক, মধুপুরে নিতান্ত অল্প।

বিন্ধ্যবাসিনী, সাধকের সহিত প্রথমে বিষ্ণুপুরে গেলেন। সেখানে রজনী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। রজনী বাবু বড় লোক হইলেও, বিন্দুর সৎব্যবহারে পরাজিত হইলেন। বিন্দুর আশ্চর্য্য কৃতজ্ঞতা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন; তিনি পূর্ব্ব-স্নেহ স্মরণ করিয়া, বিন্ধ্যবাসিনীর বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদের সহিত মধুপুর পর্য্যন্ত আসিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী, সাধক ও রজনী বাবুকে লইয়া বাড়ীর ঘাটে আসিলেন। নীরদা এবং অবিনাশচন্দ্র আহ্লাদিত মনে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। অবিনাশচন্দ্র এই সময়ে বাড়ীতে না থাকিলে সামাজিক গোল বাধিত কি না, জানি না, কিন্তু অবিনাশচন্দ্র বাড়ীতে ছিলেন, তাঁহার ভয়ে কেহই কিছু বলিল না।

যখন অবিনাশচন্দ্র, সাধক এবং রজনী বাবুর পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্ব্বে সন্দেহ-পূর্ণ হৃদয়ে দাদার কথা পালন করিবার জন্য, বিন্ধ্যবাসিনীকে, আগ্রহ সহকারে, বাড়ীতে আশ্রয়

গিয়াছিলেন। সবিশেষ যখন শুনিলেন, তখন তাঁহার বিমলানন্দ হইতে লাগিল। নলিনীকে বিন্দুর সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। সাধক এবং রজনী বাবুকে বিশেষ যত্নসহকারে আতিথ্য স্বীকার করাইলেন।

এই প্রকারে প্রায় দশ বারো দিন গেল; সাধক বিন্ধ্যবাসিনীকে নীরদার মন বুঝিতে বলিলেন। কিন্তু বিন্দুর কি সাধ্য নীরদার মনে প্রবেশ করে? নীরদার আর সেই বালিকার ন্যায় চঞ্চল স্বভাব নাই। হৃদয় মন গম্ভীর—অতলস্পর্শ।

বিন্ধ্যবাসিনী, নীরদার উন্নত মনের পরিচয় পাইয়া, বিস্মিত হইলেন। এক দিন অবিনাশচন্দ্রের নিকট নীরদার এবং রজনী বাবুর বিবাহের কথা পাড়িলেন, অবিনাশচন্দ্র বলিলেন "নীরদার ইচ্ছা হইলে আমার অমত নাই।"

কিন্তু নীরদার ইচ্ছা হইবে কি প্রকারে? রজনী বাবু নীরদার রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন; বিন্ধ্যবাসিনীকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, এক দিনে হউক, দুদিনে হউক, স্ত্রীলোকের মন পুরুষে অনুরক্ত হইবেই হইবে।

অবিনাশচন্দ্র যথা সময়ে কর্ম্ম স্থানে গেলেন। বিন্ধ্যবাসিনী, এবং রজনী বাবু, একাগ্রমনে নীরদার মন ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আর নলিনী? নলিনী—দেখিতে লাগিল—"ঠাকুরঝি ফাঁদে পড়েন কি না?"

নীরদার সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় লজ্জা নাই। লজ্জার স্থান, ধর্ম্মভাব অধিকার করিয়াছে;—নীরদা সকলের সহিতই সরলভাবে কথাবার্ত্তা বলে। তুমি ইহাকে মন্দ বলিবে, বল, নীরদার গায়ে সে কথা লাগিবে না; নীরদা যাহা ভাল বুঝিবে, তাহা করিবেই। নীরদা জানে, যে সতী স্বীয় জীবনের আদর্শে পুরুষের কুটিল মনকে পরাস্ত করিতে না পারে, সে সতীর অস্তিত্বে সংসারের কি উপকার? নীরদা লজ্জাশূন্য, রজনী বাবুর মনস্কামনা পূর্ণ হইবার ইহাই একটী প্রধান আশা। পুরুষ জানে, পরশমণির মহাগুণ, তাতে নীরদা আবার লজ্জাহীনা, রজনী বাবু ভাবিলেন, এ সৌন্দর্য্যরাশি তাঁহার জীবনেই এক দিন শোভা পাইবে। এই আশালতায় জড়িত হইয়া, নীরদার মন ভাঙ্গিবার জন্য, তিনি চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরুষের মন কি প্রকার নীচগামী, তাহার উদাহরণের জন্য, আমরা এক দিনের ঘটনা এই স্থানে প্রকাশ করিলাম।

একদিন সন্ধ্যার সময়, নীরদা গম্ভীর ভাবে ঈশ্বর-তত্ত্ব চিন্তা করিতে-ছিলেন, রজনী বাবু সময় বুঝিয়া মন ভাঙ্গিবার জন্য যাইয়া বলিতে লাগিলেন, নীর,—আর কতকাল এই ভাবে থাকিবে? নীর, কথা কও! নীর, আমার যে আর কেহই নাই।

বারম্বার বিরক্ত করায়, নীরদা বাধ্য হইয়া বলিল—'আপনি এসময়ে আমাকে বিরক্ত করিতে আসিলেন কেন?

—রজনী বাবু বলিলেন,—কেন নীর! তোমার চিন্তা কি?

নীরদা।—সে কথার উত্তর আপনাকে আমি দিব না। আমি ত আর আপনার দাসী নহি যে, আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব?

রজনী।—তবে কি, নীর, তুমি আমাকে ভালবাস না? আমি যে আর কিছুই জানি না; তোমার মন পাইবার জন্যই ত আমি এই সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়াছি। তুমি যদি আমাকে এমন নিদারুণ কথা বল, তবে আর যে আমার উপায় নাই।

নীরদা।—আপনাকে ভালবাসি কি না, তাহা জানিয়া আপনার দরকার কি? আমার মনের কথা অন্যকে জানিতে দিব কেন?

রজনী।—আমি যে তোমার মন চাই?

নীরদা।—আমার মন অন্যকে কি প্রকারে দিব?

রজনী।—আমি কি তোমার আপনার নহি?

নীরদা।—আপনি কি চাহেন, স্পষ্ট করিয়া বলুন। আমাকে রোজ রোজ বিরক্ত করিবেন না, আপনার উপকার করিতে আমার সাধ্য থাকে, করিব; নচেৎ এমন করিয়া প্রত্যহ আর বিরক্ত করিবেন না।

রজনী।—আমি বলি, তুমি চুল বাঁধ, কপালে সিন্দুর ফোঁটা দেও; ভাল কাপড় পর, অধর রঞ্জিত কর।

নীরদা।—তাতে আপনার স্বার্থ কি? আমার চুল বাঁধি বা না বাঁধি, সে আমার ইচ্ছা; আপনি আমাকে অনুরোধ করেন কেন?

রজনী।—তোমাকে সুন্দর দেখিলে, সুখী হই।

নীরদা।—সুখী নাই বা হইলেন? আমার সৌন্দর্য্যে যদি আপনার সুখ হয়, তবে আমি নিশ্চয় বলি, আপনার জীবনে সুখ নাই।

রজনী।—কেন নীর? ও কথা বলিতেছ কেন? তুমি কি চিরকালই এই ভাবে থাকিবে? আর কি চুল বাঁধিবে না?

নীরদা।—কি জন্য চুল বাঁধিব ? চুল বাঁধিলে কি হয়, আগে বলুন, তার পর বলিব, বাঁধিব কি না ?

রজনী।—চুল বাঁধিলে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইলে, অন্যের মন বাঁধা যায়।

নীরদা।—আমি সৌন্দর্য্য লইয়া কি করিব ? আমার যে ব্রত, ইহাতে সৌন্দর্য্য চাই না। অন্যের মন বাঁধার কথা যে বলিলেন ;—তাতে আমার আবশ্যক কি ? আমি সংসারকে মন দিব, সংসারকে আপন ভাবিব। অন্যের মন আমাকে দিল কি না দিল, সে বিষয়ে আমি ভাবিব কেন ?

রজনী বাবু বলিলেন, 'নীর ! আমি এখানে আসিয়াছি কেন, বলত ?

নীরদা।—আপনি কেন আসিয়াছেন, তা আপনিই জানেন। আমি কি প্রকারে জানিব ?

রজনী।—জানিতে চাও ?

নীরদা।—জানিয়া কি করিব ? জানিলে আমার যদি কোন উপকার হয় বুঝেন, তবে বলুন।

রজনী।—তোমার উপকার করিবার জন্যই আসিয়াছি, তোমার উপকার ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না ; আমি তোমার জন্যই আসিয়াছি।

নীরদা।—ঈশ্বর আপনার বাসনা পূর্ণ করুন্।

রজনী।—ঈশ্বর কেন নীর ? তোমার ইচ্ছা হইলে, তুমিই যে আমার বাসনা পূর্ণ করিতে পার ?

নীরদা।—আমার কি সাধ্য ? দীনবন্ধু ভিন্ন আমি যে আমিত্ব-শূন্য।

রজনী।—তোমার মন আমি পাই, আমার মন তোমাকে দেই, এই আমার বাসনা, এই জন্যই তোমাদের বাড়ীতে আসিয়াছি। আমার মন তোমাকে দিয়াছি, এখন তোমার মন আমাকে দেও। এ ত তোমারই হাত।

নীরদা।—আমার মন আপনাকে কি প্রকারে দিব ?

রজনী।—আমাকে বিবাহ কর।

নীরদা।—বিবাহের অর্থ কি ? আপনার সহিত আমিত্ব স্থাপন করার নাম যদি বিবাহ হয়, তবে আপনাকে বিবাহ করিতে পারি। আপনি বিবাহ কাহাকে বলেন ?

রজনী।—বিবাহ যাহা, তাহাকেই বলি, অর্থাৎ তুমি আমার হইবে, আমি

তোমার হইব; তুমি আমার উপর যদৃচ্ছাক্রমে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে, আমিও পারিব, এবং আমাদের উভয়ের বাসনা উভয়ে পূরাইব।

নীরদা।—তবে বিবাহ করিতে পারি না; আমি আপনার হইব না, আপনাকে গ্রহণও করিতে পারিব না। আমার মনের উপর মাত্র এক জনের আধিপত্য আছে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি! আমার মনে আপনি আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবেন না।

রজনী বাবু এ কথা শুনিয়া নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঘর ভাঙ্গিল।

এই সকল ঘটনার কয়েক দিন পরে এক দিন বিন্ধ্যবাসিনী, নীরদা এবং নলিনী বসিয়া গল্প করিতেছিল।

বিন্ধ্যবাসিনী।—নীর! আমি তোমাকে যা যা জিজ্ঞাসা করিব, সে সকলের উত্তর দিবেত?

নীরদা।—যদি না দেই?

বিন্ধ্যবাসিনী।—যদি না দেও, তবে আবার দেশ ছাড়িয়া যাইব!

নীরদা।—তুমি কি আমারই জন্য দেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলে?

বিন্ধ্যবাসিনী।—বলত, কেন দেশ ছাড়িয়াছিলাম?

নীরদা।—কেন ছাড়িয়াছিলে, তা তুমিই জান। তুমি আমাকে ত পত্রে লিখেছিলে, দাদার জন্য দেশত্যাগ করিয়াছিলে।

বিন্দু।—আচ্ছা মনে কর, তাই হলো। আমি তোমার দাদার জন্য এ সংসার ছাড়িতে পারি; তুমি কার জন্য পার, নীর?

নীরদার মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল, বলিল,—আমি কার জন্য পারি? সংসারে এমন লোক নাই। তবে এক মাত্র সেই সচ্চিদানন্দ জীবনসর্ব্বস্বের জন্য এ সংসার ছাড়িয়া যাইতে পারি।

বিন্ধ্যবাসিনী দেখিলেন, এই ভাবে কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিলে কিছুই হইবে না, বলিলেন, নীর! তুমি কাকে অধিক ভালবাস?

নীরদা।—আমার হৃদয়কে।

বিন্দু।—তবে তুমি স্বার্থপর ব্রত অবলম্বন করিয়াছ ; এ সংসারে পরকে যে মন না দিল, তার আবার ভালবাসা কি ?

নীরদা।—তুমি পরোপকারের কথা বলিতেছ ? আমি পর কি, তাহা জানি না, পরের উপকার আবার কি ? আমি জানি, বিশ্বাস করি, আমার যাহা, তাহাতেই আমার মমতা, তাহাতেই আমার ভালবাসা। আমার ঈশ্বর, আমার হৃদয়, আমার জগৎ, আমার সকল। আমার যাহা, তাহাকেই ভালবাসি ; আর যাহা পর, তাহাকে হৃদয়েও স্থান দেই না।

বিন্ধ্যবাসিনী।—আপনার জন্য সমস্ত সংসারই ব্যস্ত, যদি পরের উপকার না করিলে, তবে আর মানুষ কি ? তবে তুমি স্বার্থপর—পশু।

নীরদা।—বল নাচার ; কিন্তু ভেবে দেখত, কে স্বার্থপরের ন্যায় কথা বলিতেছে ? তুমি অন্যকে পর ভাবিয়া উপকার করিতে বল, আমি আপনার ভাবিয়া করিতে চাই। আমি জানি, দয়া প্রভৃতি পরের জন্য নহে, আপনার জন্য। এ সংসারে সকল মমতাই আপনার জন্য। যাহারা পর পর করিয়া অস্থির, তাহারা স্বার্থপর ; মনের সহিত কাহারও উপকার করে না, তবে যশো-লিপ্সা, আত্মগৌরব ও সম্মান প্রভৃতির আশায় পরোপকার ব্রত গ্রহণ করে ; নচেৎ মন হইতে যাহা, তাহা আপনার জন্য। তুমি যাহাকে পর বলিয়া উপকার করিতে বল, আমি তাহাকে আপনার ভাবিয়া করি ; স্বার্থপর কে ?

বিন্ধ্যবাসিনী দেখিলেন, এপ্রকারেও মন পাইবার যো নাই, বলিলেন—আমাকে তুমি পর ভাব, না আপনার ভাব ?

নীরদা।—আপনার ভাবি।

বিন্ধ্যবাসিনী।—যাহাকে আপনার ভাব, তাহাকে দেখিবার জন্য তোমার মন উৎসুক হয় না ?

নীরদা।—না—তা হয় না। যাহাদের হয়, তাহারা পর ভাবে। আমার যাহা, তাহাকে দেখি আর না দেখি, তাহা আমারই থাকিবে। যদি বিচ্ছেদ আমার অসহ্য হইত, তাহা হইলে, এ প্রাণ এত দিন বাহির হইয়া যাইত।

বিন্ধ্যবাসিনী।—তুমি সকলকেই আপন ভাব ?

নীরদা।—না, তাত বলি নাই। আমি যাহাকে দয়া করি, যাহার উপকার করি, সে আমার আপনার ; আমি পরোপকার করিতে জানি না।

বিন্ধ্যবাসিনী।—পূর্ব্বে বলিয়াছ, আমাকে তুমি আপন ভাব, আচ্ছা, আমার উপকারের জন্য তুমি কি করিতে পার ?

নলিনী ঈষৎ হাঁসিয়া বলিলেন 'ঠাকুরঝিকে এইবার পথে আসিতে হইবে।'

নীরদার উত্তর করিতে বিলম্ব হইল না, বলিল 'তোমার জন্য কি উপকার করিতে পারি? আমার যাহা সাধ্য, তাহাই করিতে পারি।

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, 'নীর! বসন্তে কোকিল ডাকে কেন?'

নীরদা।—নিজেরা স্বর শুনিয়া মোহিত হয় বলিয়া।

বিন্ধ্যবাসিনী।—আর তুমি রহিয়াছ কেন?

নীরদা। আমারই জন্য রহিয়াছি! যাহা আমার, তাহারই জন্য!

বিন্ধ্যবাসিনী।—আচ্ছা বলত, রজনী বাবু তোমার পর না আপন?

এবার নীরদা একটু ভাবিল, ভাবিয়া বলিল, রজনী বাবু তোমার আপন, তুমি আমার, তবে রজনী বাবুও আমার!

নলিনী সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, ঠাকুরঝি, পুরুষ আপন হইলে কি হয়, তা আপনি জানেন না? এইবার আপনি ঠকিয়াছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী।—রজনী তোমার আপন! স্ত্রীলোকের নিকট পুরুষ যখন আপন হয়, তখন তাহাকে কি বলে, জান? তাহাকে বিবাহ বলে।

নীরদা।—তাহাকে কি বলে, তাহা জানিবার আবশ্যক নাই। যাহার মধ্যে আমিত্ব, তাহাকেই যদি বিবাহ বলে, তবে আমি অনেককেই বিবাহ করিয়াছি। আমার ইচ্ছা, সমস্ত পৃথিবীকে বিবাহ করি।

নলিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ঠাকুরঝি! তবে নাকি আপনি বিয়ে করবেন না, তবে নাকি আপনি বিয়ে করবেন না?

বিন্ধ্যবাসিনী।—তবে রজনী বাবু তোমার স্বামী?

নীরদা এবার বিরক্ত হইয়া বলিল, 'রজনী আমার কিন্তু আমার স্বামী নহে। আমার স্বামী একজন, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তিনিই স্বামী। রজনী আমার স্বামী নহে। রজনী আমার আপনার লোক, এই মাত্র।

বিন্ধ্যবাসিনী মহাগোলে পড়িয়া বলিলেন,—নীর! আজ রজনী বাড়ী যাবে?

নীরদা।—এখানে থাকিয়া তিনি কষ্ট পাইতেছেন, যাবেন, ভালই।

বিন্ধ্যবাসিনী।—তোমার কষ্ট হয় না।

নীরদা।—না, আমার কষ্ট হয় না।

বিন্ধ্যবাসিনী।—নীর! আর একটী কথা জানিতে চাই?

নীরদা।—বল, কি কথা?

বিন্ধ্যবাসিনী।—রজনী বাবুকে যদি তোমার বিবাহ করিতে অমত না থাকে, তবে তাহাকে বিবাহ কর।

নীরদা।—রজনী আমার; তাহার মধ্যে আমিত্ব আছে, ইহাই যদি বিবাহ হয়, তবে তাহাকে বিবাহ করিয়াছি, আবার বিবাহ কি?

বিন্ধ্যবাসিনী।—শাস্ত্র সম্মত বিবাহ কর, নহিলে তুমি যখন রজনী বাবুর সহিত যাইবে, তখন লোকে তোমাকে কুলটা বলিবে।

নীরদা।—শাস্ত্র কি? শাস্ত্র মন। মন ভিন্ন যে শাস্ত্র, তাহা আমি মানি না: আমি তাহার সহিত যাইব কেন? তাহাকে বিবাহ করিলাম, এইমাত্র, বিবাহের সহিত যাওয়ার কি সম্বন্ধ? আর গেলেই বা আমাকে লোকে কুলটা বলিবে কেন? বিবাহ করিলে যদি কুলটা হয়, তবেত আমি কুলটাই।

বিন্ধ্যবাসিনী এবার স্পষ্টত বলিলেন, মনুষ্যের রিপুর অস্তিত্ব তুমি স্বীকার কর না?

নীরদা।—একদিনও না! তুমি সেই কথা বলিতেছিলে? তবে রজনী আমার বিষ—এ সংসারে রজনী আমার আপন নহে। রজনীকে আপন বলিলে, যদি তোমাদের মনে 'রিপুর কথা' উঠে, তবে রজনীকে কখনও বিবাহ করিব না, রজনী আমার পর; তাহার জন্য আমার মন কাঁদে না।

ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। বিন্ধ্যবাসিনী এতক্ষণ ধরিয়া যে ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা সহসা ভাঙ্গিল। বলিলেন, একটী কাজ করিবে, নীর? —রজনীর উপকার, আমার উপকার?

নীরদা।—রজনীর কথা আর বলিও না, আমি তাহার উপকার করিব না, সে আমার পর, পরের উপকার করিতে আমি আজও শিক্ষা করি নাই। তোমার কি উপকার, বল?

বিন্ধ্যবাসিনী।—আমার উপকারের কথা, তবে শুন। রজনী বাবুর দ্বারা আমার জীবন পাইয়াছি, তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবার আমার আর উপায় নাই; তবে তুমি যদি আমার প্রতি সদয় হও, তবে আমি সে ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি। আর কিছুই নহে, তুমি রজনী বাবুকে বিবাহ কর।

নীরদার মুখ রক্তবর্ণ হইল, বলিল—জীবনে তোমার ঋণ কিম্বা আমার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য, পরের উপকার করিতে পারি না। পারিলেও তোমার এ কথায় সায় দেই না। রজনী সর্প—সর্পদংশনে আমার প্রাণ বাহির হইবে; তুমি কেমন করিয়া আমাকে মারিতে উদ্যত হয়েছ?

বিন্ধ্যবাসিনী আর কথা বলিলেন না। বেকালে সাধক আসিলে, তাঁহার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, সাধক বলিলেন,—'আমার ধর্ম্মসাধন না, স্বার্থসাধন; আমি এতকাল কেবল স্বার্থ-সাধন করিয়াছি। যদি ধর্ম্মসাধন কেহ করিয়া থাকে, যদি প্রেমের মর্ম্ম কেহ বুঝিয়া থাকে, তবে সে নীরদা। আমার সাধনা পরাস্ত হইল; নীরদা আমার ধর্ম্মজীবনের এক অভাব দূর করিল। কোথায় নীরদা, তাহাকে ডাকিয়া আন।

নীরদা আসিয়া গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইল। সাধক দেখিলেন, প্রকৃত সাধনার ফল জাজ্বল্যমান রহিয়াছে; দেখিলেন, নীরদার মূর্ত্তি প্রেমে গঠিত। বিশুদ্ধ-প্রেম-নিকেতন দেখিয়া সাধক মস্তক নোয়াইয়া নীরদাকে প্রণিপাত করিলেন। তারপর বলিলেন—'মা! তোমার নিকট আজ যাহা শিক্ষা করিলাম, চতুর্ব্বিংশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিয়াও তাহা শিক্ষা করিতে পারি নাই। সংসারের স্বার্থ, নিঃস্বার্থ তুমিই বুঝিয়াছ; আমিত্ব কি, তাহা তুমিই বুঝিয়াছ; পর কি, তাহা তুমিই বুঝিয়াছ; ধর্ম্ম কি, তাহা তুমিই বুঝিয়াছ; আমরা কেবল যশ-প্রার্থী স্বার্থ সাধনায় রত, তাহাই বুঝিয়াছি। আমাদের ধর্ম্ম কথা কেবল ভাণ মাত্র, আমাদের পরোপকারের কথা কেবল স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র।

বিন্ধ্যবাসিনী সকলি শুনিলেন, শুনিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সাধক তাহার পর রজনী বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন—'রজনি! কেন বৃথা মনে আশা ধরিয়া আছ?' নীরদাকে বিবাহ করিবার উপযুক্ত পাত্র তুমি নও; এসংসারে নীরদাকে বিবাহ করিতে পারে, এমন লোক আছে কিনা, আমি জানি না। কেন আর এই পবিত্র প্রেম-নিকেতনের প্রতি, অনিমেষনয়নে, সংসারের কুটিল প্রণয়ের আশায় তাকাইয়া রহিয়াছ? যে দিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বিবাহ করিতে শিখিবে, সেই দিন নীরদা তোমার ভার্য্যা হইবে। এখন তুমি বাড়ীতে যাও।

রজনী বাবু সকল কথা না বুঝিয়া একটু ক্ষুণ্ণচিত্ত হইলেন, অথচ সাধকের আজ্ঞা অবহেলার যোগ্য নহে, তিনি সেইদিনই বাড়ীতে গেলেন।

সাধক, স্বীয় সাধনার প্রধান অভাব বুঝিয়া, সেই সাধনার অঙ্গ পূর্ণ করিতে আবার বিজন অরণ্যে যাত্রা করিলেন। বিন্ধ্যবাসিনীও তাঁহার পশ্চাৎগামিনী হইলেন। বালিকা নলিনী—নীরদার নিকট নিঃস্বার্থ প্রেম শিক্ষা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আর একটী দৃশ্য।

বিন্ধ্যবাসিনী এবং সাধকের মধুপুর পরিত্যাগের প্রায় একমাস পরে শরৎচন্দ্রের বড় ভাইয়েরা বিষণ্ণ-মনে বাড়ীতে আসিলেন। ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদানল যাঁহাদের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত, তাঁহাদিগের মনে পৃথিবীতে কোন্ বস্তু সুখ বিতরণ করিতে পারে?

শরৎচন্দ্রের দেশত্যাগের সহিত মধুপুরের কোন্ পদার্থ শ্রীবিহীন হইয়াছে? মধুপুরের কোন্ কার্য্য অসম্পন্ন থাকে? মধুপুরের নিকটবর্ত্তী নদী আজও মৃদু মৃদু ভাবে বয়, পাখী আজও মধুর রবে গায়, পশু আজও মাঠে চরিয়া বেড়ায়, রজনীযোগে আজও আকাশে চন্দ্রমা হাসে, আজও গাভী বৎসের জন্য পাগলিনী, আজও মৎস্য জলে ক্রীড়া করে। নাই কোন্ বস্তু? লোক আছে,—তাহাদের মনে সুখ দুঃখ আছে; বৃক্ষ আছে,—বৃক্ষ ফল ফুল ধরিতে ভুলিয়া যায় নাই। আজও ময়দান কর্ষিত হয়, নিশীথে আজও বীণার ঝঙ্কার কর্ণকে তোষে। সেই আমোদ, সেই কলহ, সেই কোকিল, সেই বসন্ত, সেই বারমাস আজও মধুপুরে সমভাবে ক্রীড়া করে। মধুপুরে সকলই আছে, কিন্তু নাই একটী বস্তু। অন্যে তাহা কি বুঝিবে? শরৎচন্দ্রের দেশ-ত্যাগের সহিত তাহার ভ্রাতাদের হৃদয়ের এক অঙ্গ যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহা আজও যোড়া লাগে নাই! স্মৃতির শেষ চিহ্ন যতদিন থাকিবে, ততদিন সেই ভ্রাতৃস্নেহের মূলে কুঠারাঘাতের যন্ত্রণা শেল বিদ্ধ করিবে। মধুপুরের সকলই আছে, নাই কেবল শরৎচন্দ্রের ভ্রাতাদের মনে সুখ, নাই কেবল শরৎচন্দ্রের ভ্রাতাদের মুখে বিচিত্র লীলাময়ী হাস্য। মধুপুরের সকলই পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীযুক্ত রহিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের পিতার শেষ চিহ্ন একেবারে শ্রীহীন হইয়া রহিয়াছে!!

সুশীলা নীরদার তৃষিত নয়ন কতই কি দেখিল! মধুপুরে, শরৎচন্দ্রের বাড়ী ঘর সময়স্রোতে, ক্রমে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল যখন, তখনও সেই সরলার নয়ন জলে অভিষিক্ত হইয়াছিল, আর পূর্ব্বের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়াও ইহারই নয়ন একদিন আনন্দাশ্রু ফেলিয়াছিল। সংসারে যত্ন